

ଶ୍ରୀ ରାଜନେତ୍ର
ଗଲ୍ମ ସୁଧାର



ମହିଳା ଆଚାର

ଭାଷାଦିତ

ଶ୍ରୀ କଣ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଏ କାଶକ

পঞ্চম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৯

শান্তি আচার্য
শক্তসারী প্রকাশক
১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বন্দু গ্রোড
কলকাতা ১৪

বৌরেখর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ড আর্ট প্রিন্টাস
১১৫-এ রামমোহন সরণি
কলকাতা ৯

প্রচন্দ চাক থান

দাম ৮০০

সম্পাদকের কথা

আঘোষক এবং আচ্ছাদিকাশের অন্তর্গত প্রশ্নে আজ যখন বাঙলা দেশ উভাজ সেই পরম লঞ্চে পূর্ব বাঙলার গল্পসংগ্রহের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ এপার বাঙলার পাঠকদের উপহার দেওয়া গেল। সংগ্রহটি অধিক প্রতিনিধিত্বযুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই প্রথম সংস্করণের তেরোটি লেখকের মধ্যে একজনকে তুলে নিতে হয়েছে, আবেকজনের নতুন গল্প নির্বাচন করেছি। তুলনামূলক বিচারে প্রথম সংস্করণের সহদয় পাঠক আশা করি আমার এই সংশোধনে একমত হবেন। উপরক্ষ ও ধর্ম সংস্করণের গল্পের সঙ্গে আরো নয়জন লেখকের অন্তে এই সংস্করণে স্থান করে দিক্ষে হয়েছে। সংগ্রহের শুরুতর বাধার কারণেই ইচ্ছে থাকলেও এই যশস্বী লেখকদের পূর্বে গ্রহণ্তৃত করা যায়নি। সম্পাদক সেই ক্ষেত্রে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেন।

নতুন সংস্করণে উপার বাঙলার কাহিনী-শাখার চরিত্রকে ঝুঁপদী এবং ঐতিহাসিক করবার গরজে সম্পাদককে সচেতন দলিল লেখকের ভূমিকা নিতে হয়েছে। লেখক নির্বাচনে কথনো কথনো এমন সমস্তায় পড়তে হয়েছে যা ঐতিহ্যবাচীল হিসেবে নিষিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রয়োজনেই তাদের বর্জন করতে পারা যায়নি। একথাও আমার মনে হয়েছে যে এমনও হতে পারে ভবিষ্যতের উভয়াধিকারীদের অন্তে এই সংকলিত গ্রন্থটি একদিন একমাত্র প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাবে !

বর্ষায়ান লেখক ইত্তাহীম থা অথবা আবুল মনস্ত আহমদ সাহেবের নির্বাচনে গল্পের দাবিটি মুখ্য হয়ে উঠেছে, তাঁদের নিষ্পত্তি রাজনীতি এখানে প্রায় পায়নি। উপার বাঙলার গল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় এপার বাঙলায় তুলে ধরবার ঐতিহাসিক আবশ্যকতায় থা সাহেবের দাঁগার পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব মানবিকতায় ভাস্বর ‘ছইটি মাহুষ’ গল্পটি কিংবা আহমদ সাহেবের গবণের দ্রুত্যাতার বিকল্পে ‘নিয়কহারাম’ গল্পের তীব্র ব্যক্তিকে সম্পাদক অঙ্গীকার করতে পারেন না।

প্রবীণ লেখক আবুল ফজল এই সংস্করণে শ্যায় স্থান করে নিয়েছেন। জিশের অত্যাধুনিক সাহিত্যাঙ্গোলনের ভাবয়সে পুষ্ট এবং পরবর্তীকালে চাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বৃক্ষির মুক্তি আঙ্গোলনের অন্তর্ম তরঙ্গ

ଆବୁଳ କଞ୍ଜଲେର ସୁଟିପ୍ରାଚ୍ଯୁତ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣରସେର ପ୍ରତୀକ । ମୌଳାନା ବା ହାଜି ଶାହେବେର ଧର୍ମର ଖୋଲୁମେର ଆଡ଼ାଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଐବିକ ଚିତ୍ର ରଚନାର ଲେଖକ ଅସମାହସିକ । ଲେଖକେର ପ୍ରୟାଶାନ ଟଲଟମେର ଗଲ୍ଲେର ଭାରରସକେ ଅଭିନ କରିଯେ ଦେଯ ।

ଆଗେର ସଂକ୍ଷରଣେ ଶ୍ରୀକତ ଓସମାନ, ଆବୁଳ କାଳାମ ଶାମହନ୍ଦୀନ, ଆବୁ ଜାକର ଶାମହନ୍ଦୀନ, ଆବୁ କୃଶ୍ଣ, ପ୍ରମୁଖ ଧ୍ୟାତନାମା ଲେଖକଦେର ଅନୁପହିତି ସମ୍ପାଦକେର ନିଜେର କାହେଇ ବେଦନାର ବ୍ୟାପାର ଛିଲ । ଏହି ସଂକ୍ଷରଣେ ତୀର୍ଥର ଉଚ୍ଛଳ ଉପହିତି ପରିତ୍ରଣିତ ଜନକ ।

ଓଦେଶେ ପ୍ରାୟ-ଅପରିଚିତ ଆବହୁର ବଣୀଦ ଓସମେକପୁରୀ ଏବଂ ଓସାଜେଦ ମଜଝ । ଏଂଦେର ଗଲାଟି ବାଙ୍ଗଲୀ ପାଠକକେ ସଥେଷ୍ଟ ଚିତ୍କିତ କରିବେ ।

ତକ୍କଣ ଲେଖକେର ମଧ୍ୟେ ଆବହୁର ମାଗାନ ସୈଯନ୍ଦ ଓଦେଶେ ତୀର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ପଲାଗହ ‘ସତ୍ୟର ମତୋ ବଦମାଶ’-ଏର ଜଣେ ଏପାର ବାଙ୍ଗଲାଯାଏ କୌତୁଳ୍ୟର କାରଣ ହେବେନ । ଏର ରଚନାଶୈଳୀର ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହବାର ଆଗ୍ରହେଇ ‘ଆଞ୍ଚହତ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟୀ’ ଗଲାଟି ଗ୍ରହିତୁ କରା ହଲ ।

ଏକପ ଏକଟି ଐତିହାସିକ ସଂକଳନେ ଲେଖକ-ପରିଚିତିର ଅଭାବେର କାରଣ ସଂଗ୍ରହେର ବାସ୍ତବ ଅନୁବିଧେ, ଆଶା କରି ସକଳେଇ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେନ । ଅନୁକୂଳ ପରିହିତିତେ ଏହି ଅଭାବ ଦୂର କରାର ଚେଷ୍ଟା କରା ହବେ ।

ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ଷରଣେର ମତୋଇ ଏହି ପରିବର୍ଧିତ ସଂକ୍ଷରଣ ବିଜନ୍ଧ-ସମାଜେ ଆଦୃତ ହଲେ ସମ୍ପାଦକ କୃତଜ୍ଞ ହବେନ ।

ମହିର ଆଚାର୍ୟ

সূচীপত্র

ইত্তাহীম থা	দুইটি মাস্য	৩
আবুল মনসুর আহমদ	নিমকহারাম	১৪
আবুল ফজল	ঝর্প ও রোপেয়া	২৪
শওকত উসমান	দুই চোখ	৩৫
আবু কুশ্মদ	বকশিস্	৪৭
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	পথ জানা নাই	৫৭
আবু জাফর শামসুদ্দীন	নেতা	৬৬
সরদার জয়েন উদ্দীন	মামলা	৭৩
আলউদ্দিন আল আজাদ	বঢ়ি	৮১
আতোয়ার রহমান	পুঁইশাক	৯৬
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	একটি তুলসীগাছের কাহিনী	১১০
শাহেদ আলী	জিবরাইলের ডানা	১১৮
শওকত আলী	তৃতীয় রাত্রি	১৩৯
আহমদ মীর	অবেদ্ধ	১৪৯
হায়াৎ মামুদ	অবিনাশের ঘৃত্য	১৫৭
হাসান আজিজুল হক	স্মরের সন্ধানে	১৬৮
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	গোলাপের নির্বাসন	১৭৮
আবত্তুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	বসবতী	১৮৩
ওয়াজেদ মজমু	অঙ্ককার	১৮৯
হমায়ুন কাদির	আশ্চর্য প্রতিমা	২০০
হমায়ুন চৌধুরী	নথর শ্রোত	২১২
আবত্তুল মাহান সৈয়দ	আন্ধাত্যা-ব্যবসায়ী	২২০

ଦୁଇଟି ମାନ୍ୟ

ଇତ୍ତାହିମ ଥିଲା

୧୯୪୬ । କଲିକାତା । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନେ ତୁମ୍ଳ ଦାଙ୍ଗ । ମେ ଦାଙ୍ଗର ଗ୍ରମଭୂତି ଆହାନେ ଯାହୁମେର ଭିତରେ ଶୁଣ୍ଡ ଶୟତାନ ଅକଷ୍ମାଂ ଜାଗିଯା ଉଠିଯାଇଛେ । କୋନ ଦିନ କୋନ ପରିଚୟ ନାହିଁ, କୋନ କାଳେ କୋନ କଲହେର କୋନଓ କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ ; ଉଭୟରେ ମାନ୍ୟ, ଶୁଣ୍ଡ ବାହିରେ ଏକଟି ଚିହ୍ନ—ଏକଟି ଟୁପି କିଂବା ଏକଟି ଟିକି, କେବଳ ଇହାରାଇ ଅଗ୍ର ଆଜ ଏକେ ଅନ୍ତେର ବୁକେ ନିର୍ମଭାବେ ଛୁରି ବସାଇତେଛେ । ଅଥବା ହୃଦୟେ ପରିଚୟ ଆଛେ, ହୃଦୟେ ଗତ ଦଶ ବେଳେ ଯାବନ ଇହାରା ଏକ ପଥେ ଚଲେ, ଏକ ବାଜାରେ ଥରିଦ କରେ, ଏକ ହୋଟେଲେ ବସିଲେ ଚା ଥାଯ, ଗଲ୍ଲ କରେ, ହାସିତାମାଶାୟ ମାତିଯା ଓଠେ । ସେଇ ଦୀର୍ଘ-ପରିଚିତ ଅନ୍ତର୍ଭାବ, ତାହାରାଇ ଆଜ ସହସା ଶୟତାନେର ଇଶାରାୟ ଏକେ ଅନ୍ତେର ଗଲା କାଟେ, ବାଡ଼ିତେ ଆଶ୍ଵନ ଦେୟ, ନିରପରାଧ ଦୁଧେର ବାଜାକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଯେର ବୁକ ହିଲେ ଛିନିଯା ଆନିଯା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକେ ଫ୍ରାଙ୍କାଣ୍ଡ ରାଜପଥେ ହତ୍ୟା କରେ ।

ବ୍ରଜ, ଭାର୍ତ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁ—ରାଜଧାନୀର ପଥେ ହାହାକାର କରିଯା ବେଡ଼ାୟ ।

ଏକଟି ମଧ୍ୟବୟସୀ ମୁସଲମାନ । ମୁଖେ ଦାଡ଼ି, ମାଥାଯେ ଟୁପି, ପରମେ ଲୁଜୀ । କମ୍ପେକଜନ ହିନ୍ଦୁ ଦିନେର ବେଳାୟ ତାହାକେ ରାନ୍ତାୟ ଧରିଯା ବାଡ଼ିତେ ଆନିଯା ଲୁକାଇଯା ରାଥେ ; ସନ୍ଧ୍ୟାର ପର ଅନ୍ଧକାରେ ଆସ୍ତାଗୋପନ କରିଯା ତାହାକେ ଏକ ମନ୍ଦିରେ ଲଈଯା ଯାଯ । ପୁରୋହିତକେ ଡାକିଯା ବଲେ : ଠାକୁର, ବଲିର ଅଗ୍ର ଏନେହି, ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ ।

ଠାକୁର ନୀରବେ ବଲିର ଜୀବକେ ଦେଖେ, ତାହାର ପର ହିରକଠେ ଆଗଞ୍ଜକିଙ୍ଗକେ ବଲେନେ : ତୋମରା ବେଶ କରେଛ ; ଏକଟା ଶକ୍ତ ବିନାଶଓ ହବେ, ଯା କାଳୀର ପୁଜ୍ଞାଓ ହବେ । ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ତୋମରା ଏଥିନ ଓକେ ରେଖେ ଯାଉ, ନଇଲେ କେ ତୋମାଦେଇରକେ କୋଥା ହତେ ଦେଖେ ଫେଲବେ । ପାଞ୍ଜି-ପୁଢି ଦେଖେ ଶୁଭ-ଲଙ୍ଘେ ଆମି ଓର ସାଥୀଯୋଗ୍ୟ ବଲିର ବ୍ୟବହାର କରେ ନିବ ।

ଆଗଞ୍ଜକେରା ତୁଣ୍ଡ ହଇଯା ଚଲିଯା ଯାଯ । ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ଏକ କୋଣେ ବସିଯା କାମେ ଆର ମନେ ‘ଆଜ୍ଞା’ ‘ଆଜ୍ଞା’ କରେ ।

সময় যায়। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসে। মন্দির প্রাঙ্গণ
হইতে একে একে পূজারীরা নিজ নিজ ঘরে যায়।

পুরোহিত বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য করেন, দেখেন কোথাও কেহ
নাই। তখন তিনি মুখ তুলিয়া আকাশের পানে চান—বিস্ময়ে ভাবেন, একি!
আজ আকাশের তারাদের চোখে এত জল! তাহার আশ্চর্য হাহাকার করিয়া
ওঠে—আর্তস্থে জিজ্ঞাসা করে: কেন? কেন? কেন?

পুরোহিত বন্দীর কাছে আসেন। বলেন: এস, প্রস্তুত হও।

বন্দী শিহরিয়া ওঠে; ভাবে—তার জীবনের চরম মৃহূর্ত বুঝি উপস্থিতি!
অভিভূতের যত পুরোহিতের সাথে সাথে চলে।

ধানিক দূর আসিয়া মন্দিরের দেওয়ালের একটা ভাঙা অংশ দেখাইয়া
পুরোহিত বলেন: ওঠ, ঐখান দিয়ে পালিয়ে যাও।

বন্দী পুরোহিতের দিকে আবার বিস্ময়ে চায়,—তাহার চোখ ছলছল।
বলে: অনেক উঁচু যে।

পুরোহিত বলেন: আমার কাঁধে পা দিয়ে ওঠ। বন্দী ইত্যত করে।

পুরোহিত আদেশের স্বরে বলেন: জলদী কর, ভাই, এক মৃহূর্তও আর
দেরি করতে পারবে না।

বন্দী পুরোহিতের কাঁধে চড়ে, তাহার ভারে পুরোহিতের ক্ষীণ দেহ কাপিয়া
ওঠে, কিন্তু তাহার বুকে উৎসারিত হইয়া ওঠে অমাত্মিক বল, তিনি টিক
দিঢ়াইয়া থাকেন।

কিন্তু হায়। ইহাতেও যে দেওয়ালের ফাটল নাগালের বাইরেই ধাকিয়া
যায়। পুরোহিত ভাবেন: তবে কি আঙ্গণের এ-তপস্তা ব্যর্থ হইবে?

সহসা পুরোহিতের নজরে পড়ে কালীমূর্তি। তিনি তাহাই টানিয়া
আনিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া দাঢ় করান, বন্দীকে বলেন: মৃত্তি আমার
চেয়ে উঁচু, এরই মাথায় পা দিয়ে পালিয়ে যাও।

: কিন্তু এ যে তোমাদের দেবতার মৃত্তি!—বন্দী বিস্ময়ে বলিয়া উঠে:
আমি মরব, তবু এর মাথায় পা দিতে পারব না। বন্দী কানিয়া কেলে।

ঠাকুর চাপা কর্তে বলেন: হা, এ সত্যি আমার মায়ের মৃত্তি। কিন্তু
ভাই, ছোটবেলায় মা কি কখনো তোমাকে কোলেকাঁধে মাথায় তোলে
নাই? আজ বদি মা কালী তা না পারেন, তবে তিনি কিসের মা?

বন্দী পুরোহিতকে বুকে অড়াইয়া ধরেন। উভয়ের অঞ্চলে উভয়ের বুক
ভাসিয়া যায়। এক দেশের সন্তান—এক শ্রষ্টার সৃষ্টি।

ধপ.—ধপ.—ধপ.—বাহিরে শব্দ হয়। বন্দী ফাটল পথে উপাশে নামিয়া
আয়।

পুরোহিত আসিয়া মন্দিরের দুয়ার খোলেন ; বাহির হইতে স্থিত হাওয়া
আসিয়া আসে ; তাহার দেহমন ছুড়াইয়া যায়। তিনি মুখ তুলিয়া আকাশের
পানে চান ; দেখেন, তারাদের চোখে তৃপ্তির হাসি।

পুরোহিত মন্দিরের দুয়ারে অর্গল দিয়া ভিতরে আসেন। চোখে পড়ে
সেদিনের সূপীকৃত ফুল। তাহার মনে হয়, যেন সমস্ত ফুল মিলিয়া হইয়াছে
একটা বিরাট শব্দের তোড়া ; সেই তোড়া উৎসর্গীকৃত বিশ্ববিধাতার
উদ্দেশে। আর তোড়ার ফুলের প্রতি দলের বুকে আগিয়া উঠিয়াছে সে
নিশ্চিদের মৃক্ষবন্দীর স্থিত মুখচ্ছবি।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী। এ দুর্ভাগ্য দেশে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার
আঙ্গন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। এবার সে-বহিশিখার অগণ্য
শূলিঙ্গ শহরের সীমা ছাড়াইয়া ধিকি ধিকি পঞ্জীর দিকে ছাড়াইয়া
পড়িয়াছে। সে শূলিঙ্গ হইতে পঞ্জীর ঘাটে-ঘাটেও দাবানলের শহঁ
হইয়াছে।

বরিশাল। একটি মুসলমান অফিসারের বাসা ; বাসায় কোন পুরুষ
মাঝুষ নাই, আছেন একটিমাত্র মহিলা, তাহারও বয়স মাত্র উনিশ বছর।
তাহার সাথে দুইটি শিশুকল্পনা।

সেদিন দুপুর বেলায় দণ্ডন হিন্দু দাঙ্গার ভয়ে এই বাসায় আগ্রহ গ্রহণ
করিয়াছে। মহিলাটি তাহাদিগকে অভয় দিয়া এক নির্জন ঘরে লুকাইয়া
রাখিয়াছেন।

দিন শুরাইয়া আসিল। পশ্চিম গগন অন্তর্গামী স্রদ্ধের রক্ষিত প্রভায়
রক্ষিত হইয়া উঠিল। মহিলাটি সেদিকে চাহিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।
ভাবিলেন—এ কি ! মাঝুষের এ নির্মম হানাহানির কর্ম দৃঢ় কি অবশেষে
আকাশের চোখেও রক্তাঞ্চ সঞ্চার করিয়াছে ?

আসিল ক্রমে গোধূলির আলো, পাখিরা ধীরে নীড়ে কিরিয়া রাতের
অক্ষকারে মিলাইয়া গেল। আকাশের শামিয়ানার তলে হাঙ্গার হাঙ্গার তারার
বাতি জলিয়া উঠিল।

অকশ্মাং অফিসারের বাসার সম্মথে একদল লোক আসিয়া হাজির হইল।
তাহাদের কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে রামদা, কাহারও হাতে সড়কি।
তাহারা বাসার মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। বলিলঃ হিন্দু
কয়টিকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন এক্ষুনি—নইলে ভাল হবে না, এ নিশ্চিত
আনবেন।

মহিলাটি পর্দানশীন। রাস্তাঘাটে কালে কশ্মিনে স্বামীর সঙ্গে বাহির
হইয়া থাকেন, কিন্তু এমন উত্তেজিত জনতার সামনে কখনও বাহির হন নাই।

আজ মহিলাটির সে পর্দার বাঁধন টুটিয়া গেল। তিনি বাড়িতে একা
ছিলেন। মাথায় কাপড় দিয়া একাই বাহিরে আসিলেন। ঘরের বাহিরের
বারান্দায় দাঢ়াইয়া বলিলেনঃ ভাইসকল!

উৎক্ষিপ্ত জনতা হক্কার ছাড়িয়া উঠিল। বলিলঃ সে মাহুষগুলি কোথায়,
আমরা তাই শুনতে চাই।

ঃ সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

ঃ না—আমরা কোন কথা শুনতে আসি নি; আমরা মাহুষ চাই।

ঃ কি করবেন মাহুষগুলি দিয়ে?

ঃ আমাদের যা খুশি তাই করব—আপনার কাছে তার কৈক্ষিয়ত দিতে
আসিনি। বলুন, তাদের দিবেন কি না?

ঃ না, দিব না।

ঃ কারণ? কারণ শুনতে পারি?

ঃ কারণ অতি সহজ—তারা আমার আশ্রিত, আমি তাদের দিব না।

ঃ ইস! ভারি ধার্মিক হয়ে গেছেন তো!

ঃ ধার্মিক আমি নই, কিন্তু আমার ধর্মের খবর আমি কিছু রাখি। আমার
ইসলাম বলে—দুর্বলকে রক্ষা কর, জান দিয়ে হলেও আশ্রিতকে বাঁচাও।

ঃ শুনুন, শু-সব ধর্মের কাহিনী আমরা শুনতে চাই না। আমরা এখন
চললাম। রাত বারটার পর আসব। তখন শুনের চাই—অকারণে নিজের
যতুও ডেকে আনবেন না!

জনতা চলিয়া গেল। হিন্দু কয়জন এতক্ষণ ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে
ছিল। মহিলাটি অল্পরে যাওয়া মাঝে তাহাদের কষেকজন ঘিরিয়া ধরিল।
কাদিতে কাদিতে কহিলঃ মা, আমাদের জন্ত আপনি বিপদ ডেকে আনবেন
না। খালি বাড়ি—ওরা আবার এলে কে আপনাকে রক্ষা করবে? আমাদের
ছেড়ে দিন, আমাদের প্রাণ দ্বাক, আপনি বেঁচে থাকুন।

মহিলাটি বাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল, আচ্ছা, ওদের
বরে রেখে আমার জীবন না-হয় দিলাম, কিন্তু তাতে ওদের ফায়দা কি? তিনি
আবার ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর তাহার বোরখাটা গায়ে দিয়া তিনি পাছ-বাড়ির পথে গোপনে
বাহির হইয়া গেলেন এবং একজন পদস্থ অফিসারের নিকট ধাইয়া তাহার
সাহায্যে হিন্দু কয়েকজনকে অন্ত কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জনতা ফিরিয়া আসিল ; চিংকার করিয়া বলিল : লোক-
গুলিকে এইবার বের করে দিন, নইলে ঘরে আগুন দিয়ে আপনাকে সহ সবাইকে
পুড়িয়ে মারব।

মহিলাটি আবার বাহিরে আসিলেন। বলিলেন : হিন্দুগুলি এখানে নাই,
তাদেরে আমিই সরিয়ে দিয়েছি।

: খুন করব—আপনাকে খুন করব—একসঙ্গে অস্তত দশজনে গর্জন করিয়া
উঠিল।

মহিলাটি কোথা হইতে কি শক্তি পাইলেন ; তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না
হইয়া নরম শান্ত কঠে বলিলেন—

‘ইয়া ভাইসকল আমাকে খুন কর, আমি হাজির, তবু আশ্রিত দুর্বল
প্রতিবেশীকে খুন করেছ এ বদনাম যেন তোমাদের না হয়।’

মহিলার সে প্রশান্তকঠে যে কি ছিল, তাহার দুনিবার প্রভাবে জনতা
মৃহূর্তের মধ্যে নীরব হইল, তাহার পর তাহারা ধৌরে ধৌরে চলিয়া গেল ॥

ନିମକହାରାମ

ଆବୁଲ ମନସ୍ତୁର ଆହ୍ୟଦ

ନିମକେର ସେଇ ଷୋଲ ଟାକା ! ଷୋଲ ପଯ୍ସାର ଜିନିସ ଷୋଲ ଟାକା ! ଛନ୍ଦେର ଅଭାବେ ଦେଶମୟ ହାହାକାର ! ରାଜଧାନୀତେ ହୈ-ହୟା । ଅଗତ୍ୟ ଏମ-ଏଲ-ଏରା ଏବଂ ପି-ୱେସ (ପୁନଶ୍ଚ ନୟ, ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରିଆ) ମନ୍ତ୍ରୀଦେଇସ ଧରିଲେନ । ଦେଶ ଯେ ଆର ରକ୍ଷା କରା ଯାଇ ନା—ତାର ମାନେ, ଜନଗଣକେ ଆର ପକ୍ଷେ ରାଖା ଗେଲ ନା । ଫଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଦେଇସ ଗଦିଓ ଟମଲ । ଏକଟା କିଛୁ ନା କରିଲେ ନୟ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ-ସଭାର ବୈଠକ ବସିଲ କ୍ୟାବିନେଟ କମେ । ସବାରଇ ମୁଖ ମଲିନ ଓ ଲସା । ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରବରାହ-ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଧମକ ଦିଲେନ : କି କରତେଛେ ଆପଣେ ? ଲବଣେର ସେଇ ବଡ଼ ଜୋର ୮୧୦ ଟାକା ହଇବାର ପାରେ, ଏକେବାରେ ଷୋଲ ଟାକାଯ ତୁଳିଲେନ କି କୌଶଳେ ?

ସରବରାହ-ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମତା-ଆମତା କରିଥା ବଲିଲେନ : ସବ ଚେଷ୍ଟାଇ ତ ଆମି କରଛି, ସାର । କିନ୍ତୁ କିଛୁଇ ତ କୈରା ଉଠିବାର ପାରିଲାମ ନା । କରାଟୀ ଥାଇକା ଲବଣ୍ୟ କମ ଆନନ୍ଦାମ ନା । କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗ ଆଇସା ନାମତେଇ ଲବଣ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ : କନ୍ଟ୍ରୋଲ କରେନ ନା କେନ ?

ସରବରାହ ମନ୍ତ୍ରୀ : କନ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଖୁବ କରାନ୍ତେଛି, ସାର । କିନ୍ତୁ କନ୍ଟ୍ରୋଲ ଦାମେ ଚାଇଲେଇ ଲବଣ ଏକରତ୍ନ ନାହିଁ ; ଆର ଷୋଲ ଟାକା ଦିଲେ କୟ ସେଇ ଚାନ ?

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ : ତବେ ଦେଖା ଯାଇତେହେ ଲବଣଞ୍ଜଳି ହାତ୍ୟା ହେଯା ଗେଛେ ନା । ଆହେ ବ୍ୟାପାରୀଦେଇ ଶୁଦ୍ଧାମେହି, ତବେ ଧରବାର ପାରେନ ନା କେନ ?

ସାହ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ : ଲବଣେର ବ୍ୟାପାରୀରା ମ୍ୟାଜିକ ଜାନେ, ସାର ।

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ : କିନ୍ତୁ ତାତେ ଆମରାର ମନ୍ତ୍ରିଦେଇ ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସିକ ହେଯା ଉଠେଛେ । ଏକଟା କିଛୁ ନା କରଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀର ରାଖା ଦାୟ ହୈବ ।

ଚୀକ ସେକ୍ରେଟାରୀ : ସାର, ଆଗାମୀ କାଳ ଇଉନିଭାରପିଟିର ଛାତ୍ରରୀ ଭୂଷା ମିଛିଲ ବାଇବ କରିବ । ଗୁଣ ଥାଇକା ଲାଥେ ଲାଥେ ଲୋକ ଦୁଇନା ହେଯା ଗେଛେ । କାଳ ତାରା ଆପନାର ଆସାଦେଇ ଶାମନେ ବିକ୍ଷେପ ଦେଖାବ ଠିକ କରାଇଛେ । ଶୁଭ

বিক্ষেপ হয়, না, আরও বেশি অনৰ্থ কিছু ঘটে, সে চিন্তায় আমাৰ ঘূম নাই।

প্ৰধান মন্ত্ৰী : তোমৰা আছ খালি ঘূমেৰ তালে। আমি তোমৰাৰ গদি
ঠিক রাখি, আৱ তোমৰা কৱ ঘূমেৰ চিন্তা। বাঃ! বাঃ! কিন্তু এখন কৰি
কি? দিমু নাকি ১৪৪ জাৰি কৈৱা?

শিক্ষা মন্ত্ৰী মুখ বীৰকাহিয়া বলিলেন : আজকাল ছেলেৱা যেমন কমিউনিস্ট
হৈয়া উঠছে, তাতে ১৪৪ ধাৰা তাৱা মান্ব কিনা সন্দেহ।

স্বৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰী : তবে দিয়া দেই গুলি চালাবাৰ হৰুম? সার কি বলেন?

প্ৰধান : না, না, আগেই গুলি না। হাতেৰ পাচত্তু শোটা থাকলাই।
আগে অস্ত ফন্দি ঠাহৰ কৰেন। আপনেৱা যেমন কৈৱা পারেন, আজকাৰ
দিনেৰ মধ্যেই একটা উপায় কৰেন। আমাৰ বাতেৰ টাটানি বড় বাইড়া
গেছে, নইলে আমি একটা-না-একটা ফন্দি বাব কৰিবাৰ পাৰতাম। বাতেৰ
বেদনা যে কি ভয়ানক, তা ত আপনেৱা জানেন না। এখন আপনেৱা বিদায়
হন। সক্ষ্যাৰ আগেই সকলে আমাৰ বাসায় জমায়েত হৈবেন একটা ফন্দি
বাব কৈৱা, বুৰলেন ত?

সক্ষ্যা। প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ প্ৰাসাদে সভা। মন্ত্ৰীৰা এবং বিভিন্ন দফতৰেৰ
হেডেৱা ছাড়া বিভিন্ন দলেৱ নেতা-উপনেতাৱাও আসিয়াছেন। সকলেৰ
মূখেই কাল ছায়া।

প্ৰধান মন্ত্ৰী বলিলেন : আমাৰ বাতেৰ জোড়টা কৰমেই বাইড়া চলছে।
আমি সাৱাদিন ছটফট কৈৱা কাটাইছি। কোন কিছু ভাববাৰ পাৱলাম না।
আমি আশা কৰি, আপনেৱা একটা-না-একটা ফন্দি ঠাহৰ কৰছেন। কাৰণ
আপনেৱাৰ বাতেৰ বেদনা নাই।

সৱৰবৱাহ মন্ত্ৰী : সার, বাতেৰ বেদনা না থাকলেও মাথাৰ বেদনায় আৱ
ঘাড় সিখা কৰিবাৰ পাৰতাছি না।

প্ৰধান মন্ত্ৰী : আৱে বাইধা দেন মাথাৰ বেদনা, বাতেৰ বেদনাৰ কাছে
একসাথে দশটা মাথাৰ বেদনাও কিছু না। সুগেন নাই ত কোনদিন বাতেৰ
বেদনায়। মাথা বেদনা, সে ত ছেলেপিলেৱ অসুখ। এখন বলেন, কে কি
ফন্দি ঠাহৰ কৰছেন।

কেউ কিছু বলিলেন না। শুধু এ-ওঁৰ মুখেৰ দিকে চাহিতে লাগিলেন।

প্ৰধান মন্ত্ৰী জুড়বৰে বলিলেন : বুৰলাম আপনেৱা কেউ কিছু কৰছে
না। কোনো ঘোগ্যতা আপনেৱাৰ নাই। এমন সব অপৰাধ লোক লইয়া
আমি মন্ত্ৰী কৰিবাৰ চাই না। আমি রিজাইন দিমু ঠিক কৰছি।

এক কোণ হইতে স্বর্ণী চেহারার একজন লোক দাঢ়াইয়া বলিলেনঃ যাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে আমার চাকুষ পরিচয় নাই। আমার নাম থাকসার কেরামত উঞ্জাহ। লোকে আমাকে মুক্তি বৈলাই ডাকে। আমি একটা আরজ করবার চাই।

প্রধান মন্ত্রী বিরক্তি-মাথা স্থরে বলিলেনঃ ইহা, আপনের তারিক আমি বহু শুনছি, কিন্তু এখন আমি বড় ব্যস্ত, আপনের কোনো কাজ এখন আমারে দিয়া হৈব না আপনে পরে আসবেন।

মুক্তি হাসিলেন। বলিলেনঃ ছজুর আমি নিজের কোনো মতলবে আসছি না। আগামী কালের বিক্ষোভ ঠেকাবার ফন্দি বাংলাবাবুর লাগিই আপনার সেক্রেটারি-আস্তীয় কিরোজ সা'ব আমাকে ডাইকা আনছেন।

প্রধান মন্ত্রী অবিদ্যাসের হাসি হাসিয়া বলিলেনঃ বে-আদবি মাফ করবেন। আপনে মো঳া মাঝুষ, এ সব রাজনীতির কি জানেন?

মুক্তি সাহেব মুখে প্রচুর আস্তা-বিদ্যাসের ভাব আনিয়া বলিলেনঃ ছজুর, আগে জানতাম না, একথা ঠিক। কিন্তু লৌগে চুইকা কিছুকাল মন্ত্রী-মেম্বাৰগ সহতে থাইকা বেলেকে ভর্তি হৈয়া গেছি। এখন রাজনীতি কিছু-কিছু বুৰি।

প্রধানঃ বেশ, বেশ। তা হৈলে কন, আপনের ফন্দিটা কি?

মুক্তিঃ আগামী কালের মিছিলের উপর কোনো ৪৪ ধারা করবেন না। আপনের বাসায় মাইক বসাইয়া সারা শহরে, দোকানে-দোকানে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লাউড স্পীকাৰ বসাবেন।

প্রধানঃ তা যেন কৱলাম। তাৱপৰ আমি কি ঘোষণা কৰমু? ঘোষণাৰ ত কিছুই নাই।

মুক্তিঃ আপনের বেশি কিছু কওয়া লাগব না। শুধু এইটুকু বলবেন যে, আপনের তরফ থাইকা মুক্তি মণ্ডলানা অমূক লবণ-সমস্তা সহজে বক্তৃতা কৰবেন।

প্রধানঃ আৱ, আপনে কি কইবেন? আমার তা আগে জানা দৱকাৰ।

মুক্তিঃ আমি যুক্তি-তর্কেৰ দ্বাৰা, হানিস-কোৱাণেৰ সনদ দিয়া পৰুমাণ কৈৱা দিয়ু যে, লবণ খাওয়া ভাল মাঝৰে, বিশেষত মুসলমানেৰ, উচিত নয় বৈলাই আমৰাৰ জনপ্ৰিয় মন্ত্ৰিসভা ইছা কৈৱা লবণেৰ দাম বাড়াইয়া দিছেন।

প্রধান মন্ত্রী উচ্চস্থে কৌতুকেৰ হাসি হাসিয়া বলিলেনঃ এ সব বাজে কথা লোকে বিদ্যাল কৰবে কেন?

মুক্তি : সে ভাব ছাইড়া দেন, ছজুর, আমার উপরে। আপনেরা ত কাছে
বইসা সবই রেখবেন শুনবেন। দেইখা ও যাচাই কৈয়া নিয়েন আপনেরা।
আমার বক্তৃতা শুইনা যদি জনতা খুশি না হয়, যদি তারা মন্ত্রিসভা জিন্দাবাদ
দিয়া না যায়, তবে আমার নাম ফিরাইয়া রাখবেন। আর যদি জিন্দাবাদ দেয়,
তবে আমারে আপনে কি দিবেন?

প্রধান : যদি সত্যই বিক্ষেপ সামলাইতে পারেন মুক্তিসাব, তবে আপনে
যা কইবেন, তাই দিয়া দিমু। আসলে অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্তাই আপনের
প্রাপ্য। তবে আমার মেয়ে না থাকায় রাজকন্যা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রধান
মন্ত্রীদের গদ্দি ও আধা-আধি ভাগ করা যায় না। এরপর আপনি যা চান, তাই
দিমু, যায় কাজীগিরি পথষ্ট।

মুক্তি : ছজুর, কাজীগিরির এলাকা আজকাল যা ছেট করা হৈছে, তাতে
কাজীগিরি নিয়া লাভ নাই। তার চেয়ে বরঞ্চ আমারে একটা কেরাসিনের
পারমিট দিবেন।

প্রধান : কেন, একটা লবণের পারমিটই নেন না কেন?

মুক্তি : না, ছজুর, আগামী কাল আরি যে বক্তৃতা করুম, তারপরে
লোকে আর লবণই থাব না। কাজেই লবণের পারমিট নিয়া আমি ঠকতে
রাজি না।

প্রধান মন্ত্রীর বালাখানার সামনে বিশাল আংগিনা, আংগিনার পর প্রশ্ন-
পিচ-দেওয়া রাস্তা; তার বাদে বিস্তৃত ময়দান। যে দিকে যতদূর নজর ধায়,
কেবল লোকে লোকারণ্য; চারিদিককার কুশাদা রাস্তা গুলির যে দিকেই চাই,
পিংপড়ার লাছির মত জনতার ‘লবণ চাই’ ‘নইলে মন্ত্রীদের মাথা চাই,’ ‘লবণ
দাও’ ‘নয়ত গদি ছাড়’, ‘লবণ চোরের-গর্দান চাই’ ইত্যাদি ইত্যাদি শোগানে
আসমান-জমিন মুখরিত।

প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির গাড়ি-বারান্দার ছাদে মাইক বসান হইয়াছে। প্রধান
মন্ত্রী, অস্ত্রাঞ্চল মন্ত্রীরা ও নেতারা গোলবন্দী হইয়া মাইকের চারপিসিকে বসিয়া
আছেন। তাদের মধ্যে শান্তা বড় পাগড়ি বাঁধা মুক্তি সাহেবকেও দেখা
যাইত্তেছে।

প্রধান মন্ত্রী মাইকের সামনে আসিয়া দাঢ়াইলেন। বিপুল জনতা ‘শেম’
‘শেম’ ‘রিজাইন’ ‘রিজাইন’ বলিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী কি বলিলেন কিছুই
শোনা গেল না। চারপিসিকে ঘন-ঘন আওয়াজ হইতে লাগিল: ‘আমরা লবণ
চাই, বক্তৃতা-চাই না।’

প্রধান মন্ত্রী জনতাৰ দিকে হাত জোড় কৰিলেন। জনতা একটু শান্ত হইল। দুইবাৰ কাশিয়া প্রধান মন্ত্রী এই স্থৰোগে বলিলেন : আপনেৱাৰ কথা আমি শুনলাম, আপনেৱাৰ আমাৰ কথাটা শুনেন। লবণ-সমষ্টা নিয়া আমৰা খুবই চিন্তা কৰছি। বিশ্ব-বিধ্যাত আলেম মুক্তি কেৱামতুজা সাহেবেৰ কেৱামতিৰ দণ্ডতে আমৰা একটা সমাধানও কৰছি। আমি নিজ মুখে সেটা কইবাৰ চাই না ; মুক্তি সাহেবেৰ মুখেই সেটা আপনেৱা শুনবাৰ পাবেন। তাৰ কথা শুনবাৰ পৰেও যদি আপনেৱা সংষ্টি না হন, তবে আপনেৱা যা খুশি কৰিবাৰ পাৰেন।

জনতা এবাৰ সত্যই শান্ত হইল। মুক্তি সাহেব কাল-বিলৰ না কৰিয়া একলাকে মাইকেৰ সামনে আসিলেন এবং বাম হাতে মাইকেৰ খুঁটি চাপিয়া ধৰিয়া মাইকেৰ সামনে মুখ নিয়া ষাঁড়েৰ আওয়াজে বলিলেন : বেৱাদৱাবে মিলাত, আসলালামু আলায়কুম।

জনতা আৱ কি কৱে ? ‘ওয়া আলায়কুম’ বলা ফৰজ, তাই যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিল : ওয়া আলায়কুম সালাম।

মুক্তি সাহেব সময় নষ্ট না কৰিয়া বলিতে লাগিলেন : আপনেৱা এই মাত্ৰ আলাৰ নামে হলক কৈৱা কইছেন আপনেৱা সালাম অৰ্থাৎ শান্তি চান। কাজেই শান্তিৰ সঙ্গে আমাৰ আৱজ্ঞা আপনেৱা শুনবেন। এটা আমি নিশ্চয়ই দাবি কৰিবাৰ পাৰি।

জনতা বিৱৰণ হইয়া বলিল : কি কইবাৰ চান, জলদি কইয়া ফেলেন।

মুক্তি : নিমক নিয়া আপনেৱা, হৈচৈ কৱতে আছেন দেইখা আমি তাৰক হৈলাম। আপনেৱা কি হাদিস মানেন না ? আপনেৱা কি মুসলমান না ?

জনতা : আমৰা মুসলমানও, হাদিসও মানি আমৰা। কিন্তু এখানে কে কথা ক্যান ?

মুক্তি এবাৰ নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বলিলেন : হাদিস শৱিকে আছে নিমক হারাম। কথাটা কি আপনেৱা কোন দিন শুনছেন না ? হাদিস শৱিকে মুসলমানেৰ লাগি নিমক কেন হারাম কৰা হৈল, সেটা কি কোনো দিন আপনেৱা চিন্তা কৈৱা দেখছেন ?

জনতা হঠাৎ নিষ্কৃত হইল। ক্রমে এখান ওখান হইতে শুণত্বে শৰ শোনা গেল, নিমক হারাম ? যওলানা সাহেব এটা কি কইতে আছেন ? ও-কথাৰ অৰ্থ কি এই ?

মুক্তি সাহেব তাৰ গলা আৱও মোটা, আৱও গুৰীৰ কৰিয়া বলিলেন :

শরিক কি তবে ভূল ? নাউয়ুবিজ্ঞাহে মিন যালেক। আসতাগ-ফেঙ্গাহ বলুন। হাদিস কখনো ভূল হবার পারে না। আপনেরা গণের কৈরা দেখেন, কেন মিন-মুসলমানের লাগি, বলকে সমস্ত ইনসানের লাগি, নিমিক হারাম করা হৈল।

অধান মন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রী ও নেতাদের চোখ কপালে উঠিল। কিন্তু তাঁরা খুশি হইলেন।

জনতা প্রশ্ন করিল : কিসের লাগি হারাম করা হৈল আপনেই কন ?

মুফতি আবার নড়িয়া-চড়িয়া বুক উঁচা করিয়া দাঢ়াইলেন। বলিলেন : হাদিস শব্দিকে আছে,—নিমিক না থাওয়ার ফজিলত তিনটি। পয়লা ফজিলত এই যে, যে লবণ না খাব তার বাড়িতে কোন দিন চুরি হৈব না।

মন্ত্রীরা পরম্পরারের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

জনতা বিশ্বায়ে বলিল : চুরি হৈব না ! ইটা সত্য নাকি ?

মুফতি : নিশ্চয় সত্য। তারপর তেসরা ফজিলত এই যে, যে লবণ খাব না, তারে কোনো দিন কুস্তায় কামড়াব না।

মন্ত্রীদের একজন আরেকজনের পেটে আঙুল দিয়া শুঁতা মারিতে লাগিলেন।

জনতার মধ্যে বিশ্বায় ও উত্তেজনা দেখা দিল। তাঁরা এ ওর কাঁধে ধাক্কা মারিয়া বলিতে লাগিল : যেওলানা ইসব কি কৈতে আছেন ? এসব কথা সত্য হবার পারে ?

মুফতি : আমার কথা সত্য না হৈলে আপনেরার হাতে আমি যে-কোনো সাজা গ্রহণ করবার লাগি তৈয়ার আছি। তারপর তেসরা ফজিলতের কথা শুনেন।

এত বড় জনতা পলকে শাস্তি হইয়া গেল।

মুফতি গলা আরো উঁচা করিয়া তুলিয়া বলিলেন : লবণ না থাওয়ার তেসরা ফজিলত এই যে, যে লবণ না খাব, তার চুল-দাঢ়ি শাদা হৈব না, তার দাত পড়ব না।

বিশ্বায় ও আনন্দের শুভনে জনতা মুখের হইয়া উঠিল। জনতার বিষণ্ণ মুখ হাসিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। তাঁরা বলিল : কিন্তু এসব কথা যে টিক তাঁর পরমাণ কি ? আমরা পরমাণ চাই।

মুফতি : যে কোনো প্রমাণ দিতে আমি প্রস্তুত। যা তা প্রমাণ না, একেবাবে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। দীত ও চুল-দাঢ়ির কথা ভাঙ্কাবী ব্যাপার, চুরি-ডাক্কাতির কথা পুলিশের ব্যাপার, আর কুস্তার কথা ভেটারিনারি সার্জনের-

ব্যাপার। তাঁরা ধৰি আমার কথার সত্যতা দ্বীকার করেন, তবে আপনেরা বিশ্বাস করবেন?

জনতা : হা কয়মু। কিন্তু বিশ্বাসী লোক হওন চাই। ঘূষখোর লোকে চলব না।

প্রধান মন্ত্রী মাইকের সামনে আসিলেন। মুক্তি সাহেব সরিয়া জাওয়গা করিয়া দিলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন : ভাই সাহেবান, লবণের অভাবে আপাতত দুঁচারদিন আমরা কষ্ট পাইলেও কেন আমার গভর্নমেন্ট লবণের সের খোল পঞ্চার জাওয়গায় যোল টাকা করেছেন, তার কারণ এতক্ষণে আপনেরা নিশ্চয়ই বুঝবার পারছেন। আমাদের রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র। এখানে আমরা আলেমরার উপর্যুক্ত নিজামে-ইসলাম কাময়ে করছি। এখনকার লোক যাতে আস্তে-আস্তে নিয়ক খাওয়া ছাইড়া দেয়, সেই মতলবেই আমরা লবণ এমন মাংগা কৈরা দিছি। মুক্তি সাহেব বিশ্ববিদ্যালয় আলেম, তাঁর মুখে আপনেরা হাসিসের হকুম এবং সে হকুম মানবার ফজিলতের বয়ান শুনলেন। তিনি আমরার কাছেও এই কথাই কইছেন। আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস কইয়া লবণের দাম বাড়াইয়া দিছি। আমি প্রধান মন্ত্রীর সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব লৈয়া আজ এই বিপুল জনতার সামনে ঘোষণা করতে আছি যে, আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের প্রিসিপাল সাহেবকে চেয়ারম্যান এবং গোমেন্দা পুলিশের কর্তা ডি-আই-জি সি-আই-ডিকে ও ভেটারিনারি হাসপাতালের স্বপ্নারিটিণ্টকে মেম্বর কৈরা একটি কমিশন নিয়োগ করলাম। মুক্তি সাহেবের কথা ঠিক কিনা, এই কমিশন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তা তজ্জিদিক করবেন। আমি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে আরো ঘোষণা করতে আছি যে, যদি এই কমিশনের কাছে মুক্তি সাহেব তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবার না পারেন, তবে মুক্তি সাহেবকে চৱম দণ্ড দান করা হৈব। আজকার জনতার মত বিরাট জনতা ভাইকা তাদের সামনে মুক্তি সাহেবের ঝাসি দিমু। কি মুক্তি সাহেব, এতে আপনে রাজি?

মুক্তি সাহেব সহজ পদে মাইকের সামনে আসিয়া বলিলেন : জি ই, আমার কথা মিথ্যা হলে ঐ শাস্তি আমি মাথা পাইতা নিমু।

জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল। কিন্তু বলিল : আমরা জানবার চাই, কমিশনের রায় কবে বাইর হৈব?

প্রধান মন্ত্রী মুক্তির দিকে চাইয়া মাইকের সামনে মুখ নিয়া বলিলেন : মুক্তি সাহেব, কয়দিনে আপনে ইটা প্রমাণ করবার পারবেন?

মুক্তি প্রবল আঞ্চলিকাসের সঙ্গে বলিলেন : আমি সবসময়ই প্রস্তুত আছি। কালই আপনেরা প্রমাণ নিবার পারবেন।

প্রধান মন্ত্রী জনতাকে সর্বোধন করিয়া বলিলেন : শুনলেন ভাইসাহেবান, মুক্তি সাহেব কালই প্রমাণ করবার পারবেন। তা-হলে পরশুদিন সকালে খবরের কাগজে সরকারী প্রেসনোটে কমিশনের রিপোর্ট দেখবার পারবেন। যদি মুক্তি সাহেব কমিশনকে সম্মত করবার না পারেন, তবে ঐ প্রেসনোটে মুক্তির ফাসির দিন ঘোষণা করা হৈব। আপনেরা নির্ধারিত সময়ে এইখানে জমায়েত হৈবেন। মুক্তিকে প্রকাশে আপনেরার চোখের সামনে ফাসি দেওয়া হৈব। কেমন, এতে আপনেরা খুশি হৈলেন ত?

বিপুল জনতা উঞ্জাস ও উত্তেজনায় জয়রূপি করিয়া উঠিল : প্রধান মন্ত্রী জিন্দাবাদ। মন্ত্রিসভা জিন্দাবাদ। আমরা লবণ চাই না, লবণ আর থাম না। আঞ্জা আকবর।

জনতা বাঁধভাঙা নদীর শ্রেতের মত চলিয়া যাইতে লাগিল। মন্ত্রীরা খুশিতে গাল প্রসারিত ও দীপ্ত বিকশিত করিলেন। নেতারা মুক্তিকে বুকে কুড়াইয়া টানা-হিঁচড়া করিতে লাগিলেন।

লথা নিখাস ছাড়িয়া প্রধান মন্ত্রী শিরগোপনির বোতাম খুলিয়া বুকে হুঁ দিতে লাগিলেন ও বলিলেন : আপাতত বাঁচা ত গেল। কিন্ত এর শেষ কোনখানে? মুক্তিকে শেষ লাগাই ফাসি দেখেন লাগব। কিন্ত তাতেও আমরার রক্ষা নাই। কি হৈব মুক্তি সাব?

মুক্তি হাসিয়া বলিলেন : কোন চিষ্টা করবেন না হজুর। কিন্ত আমার কেরাসিনের লাইসেন্সের কথাটা ও যেন ভুইলা যাবেন না।

কমিশনের বৈঠক। মেডিক্যাল কলেজের প্রিস্কিপাল চেয়ারম্যান হিসাবে মধ্যস্থলে বসা। তাঁর ডানদিকে ডি-আই-জি সি-আই-ডি, বামদিকে ভেটারিনারি স্ল্যাপার। কমিশন সিগারেট পুড়াইয়া সময় কাটাইতেছেন; কারণ মুক্তি সাহেবের দেখা নাই। তাঁরা হাসাহাসি করিতেছেন।

প্রিস্কিপাল সাহেব বলিলেন : আমি ত আগেই বলছিলাম, মুক্তি আসবে না। আসবে কোন্ সাহসে? আমরারে সে কি পাগল পাইছে নাকি? আমি বুঝি না, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এই পাগলটাকে দিয়া যা তা বলাইয়া এই বক্রিটা নিলেন ক্যান?

ডি-আই-জি : আমি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে বলছিলাম, ব্যাটাকে পুলিশ-গার্ডে রাখা হোক। ফাসি ধার ধরা-বাক্ষা, সে পর্নাব না ক্যান ?

ডেটারি স্থপার : কিন্তু মোজাটারে ফাসি দিয়াই কি মন্ত্রীরা রক্ষা পাইতেন। বড় জটিল অবস্থা স্থষ্টি হৈছে কিন্তু। আমি কোনো উপায় দেখতেছি না।

মেডিক্যাল : উপায় ওলিকেই আছিল নাকি ? যা অনতা জমা হৈছিল, আৱ তাৰা খেপছিলও এমন সাংঘাতিক যে ঐ বকম একটা কিছু না কৈৱা চাৰাই বী কি আছিল ?

ডি-আই-জি : ইহা, উপায় আবাৰ আছিল না ; একটু হকুল পাইলে সব ব্যাটাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতাম। প্রধান মন্ত্রী থামোধা গেলেন এক বান্দৱ নাচাবার। এখন সে ব্যাটাকে পাই কোনখনে ?

‘এই যে বান্দৱটা হাজিৰ’ বলিতে-বলিতে মুক্তি সাহেব কামৰায় প্ৰবেশ কৱিলেন এবং হি হি কৱিয়া হাসিতে থাকিলেন। অবশ্যে হাসি থামাইয়া বলিলেন : মোজা মাছুষ ঘড়িৰ ধাৰ ধাৰি না ! হ'চাৰ মিনিট দেবি হৈয়া গেছে ; কিছু মনে কৱবেন না। মাক কৱবেন ।

মেডিক্যাল : আচ্ছা আচ্ছা, যা হবাৰ হৈয়া গেছে। এখন কাজ শুভ কৱা যাক। মেছৰ সাহেবান, প্ৰশ্ন কৰিন ।

ডি-আই-জি : বলেন মুক্তি সাৰ, নিমক না থাইলে চুৱি হৈব না ক্যান ?

মুক্তি : লবণ না থাইলে যজ্ঞা-কাশি অবধাৰিত, এ কথা ঠিক কিনা। ডাক্তাৰ সাহেবই কন ।

ডাক্তাৰ সাহেব অৰ্থাৎ মেডিক্যাল প্ৰিসিপাল সহতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন।

মুক্তি : যজ্ঞা-কাশি হৈলে সাৱা রাত কাশতে হৈবে ? সেই কাশিৰ শব্দে ঘৰে চোৱ চুকবাৰ পাৱব না। ঠিক কি না ?

ডি-আই-জি : (বিশ্বে গাল প্ৰশংস্ত কৱিয়া) ঠিক ত। এতক্ষণে আপনোৱ কথাৰ ভেদ বুঝবাৰ পাৱলাম ।

ডেটারিনারি : কিন্তু লবণ না থাইলে কুত্তায় কামড়াব না ক্যান ?

মুক্তি : যজ্ঞা-কাশিতে লোক দুৰ্বল ও শুঙ্গা হৈয়া পড়ব। লাঠি ভৱ না দিয়া তাৰা চলবাৰ পাৱব না। লাঠি হাতে থাকলে কুত্তায় কামড়াবাৰ পাৱব না, এটা বুঝবাৰ পাৱলেন না ?

* **কমিশনেৱ মেছৰদেৱ মুখ বিজয়-আনন্দে উজ্জল হৈয়া উঠিল। সকলে বলিলেন : কথা শুলা ত সত্য বৈশাই বোধ হৈত্বেছে।**

মেডিক্যাল : কিন্তু চুলদাঢ়ি শাদা হৈব না, দীত পড়ব না, এটা কিছুতেই ঠিক হৈবার পারে না ।

মুক্তি : এটাও হৈবার পারে । যস্কা-কাশিতে লোকেরা অন্ন বয়সেই মাঝা ধাব, ডিশ-পঁয়জিশের বেশি কেউ বাঁচব না । ঐ বয়সে চুল-দাঢ়ি পাকবার আৱ আৰ্যাত পড়বাৰ সময় কই ?

প্ৰচণ্ড বিষয়ে কমিশনেৱ মেষৱগণ শৃঙ্খিত হইলেন । তাদেৱ বিষয় কাটিলে মুক্তি সাহেবকে ধন্তবাদ দিলেন । প্ৰবল উৎসাহে তাৰা কৱৰ্মদন কৱিলেন ।

পৰদিন সৱৰকাৰী প্ৰেসনোটে বলা হইল : কমিশন সৰ্বসম্মত রিপোর্ট দিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত হইয়াছে, যে লবণ না ধাৰিবে :

- (১) তাৰ বাড়িতে চুৰি হইবে না । (২) তাৰে কূতৃপাল কামড়াইবে না ।
(৩) তাৰ চুল-দাঢ়ি শাদা হইবে না ও দীত পড়িবে না ।

অতএব মণ্ডলানা মুক্তি কেৱামতুল্লা সাহেবেৰ মতই ঠিক । কাজে-কাজেই হারাম নিমকেৰ দাম প্ৰতি মেৰ ঘোল টাকা কৱিয়া মন্ত্ৰিসভা ঠিক কাৰ্জই কৱিয়াছেন ।

ରୂପ ଓ ରୋପେଯା

ଆବୁଲ କ୍ରଜଳ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଢାକାଯିଥେ ସବ କଥା ଢାକା ଥାକେ ନା ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକଷିକଭାବେ ଏକଦିନ ଖାନବାହାତୁର ଜନାବ ଏମ, ଏ, ମତିନେଇ ଜୀବନେର ଏକଟି ଅଧ୍ୟାୟେର ଢାକନା ଥୁଲେ ଗେଲ । ଆସ୍ତୀକ୍ରମଜନ ପାଡ଼ା-ପ୍ରତିବେଶୀ ଯେ ଶୁଣି, ମେହି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱରେ ହତ୍ୱାକ ହ'ଲ ; ପରେ ନାକ ସିଁଟକିମେ ଛି ଛି କରେ ଉଠିଲ । ଭାଗ୍ୟ ଖାନବାହାତୁର ଛିଲେନ ବିପଞ୍ଚୀକ, ନା-ହୟ ଅନ୍ଦରମହଲେ କୁକୁକ୍ଷେତ୍ର ଓ କାରବାଳା ଏକମଙ୍କେ ଶୁରୁ ହେଁ ଯେତ ।

‘ଖାନବାହାତୁରେ ବଯସ ପଞ୍ଚଶିର ଉପର । ଦେହ-ଗଠନ ବେଶ ବଲିଷ୍ଠ ଓ ଝଞ୍ଜୁ-ଫରମା ମୁଖେ କୀଚା-ପାକା ବାଡ଼ିର ଐଶ୍ୱର ଓ ଶୋଭା ଦେଖିବାର ମତୋ ।’ ପାଚ ଶ୍ଵାସକୁ ନମାଜେର ଚାର ଓୟାକ୍ତିତି ତିନି ତାର ବାଡ଼ିର ମଂଳଶ ମସଜିଦେ ଗିଯେଇ ପଡ଼େନ । ଶୁଦ୍ଧ ଏଶ୍ୱାର ସମୟ ତିନି ଗର-ହାଜିର ଥାକେନ ପ୍ରାୟଇ । ମଗରିବେର ପର ମସଜିଦ ଥିକେ ବୈରିଯେ ତିନି ଇସଲାମପୁର ଜାହାଜ-ଘାଟା-ଆମପଟିର ରାନ୍ତାୟ ପାଯଚାରି କରେନ ନିୟମିତ, ହାତେ ହାଜାର ଦାନାର ତ୍ୱରିହ-ଛଡ଼ାଟା ଥାକେ ସବ ସମୟ । ଖାନବାହାତୁରେର ଦୁଃପକେଟେ ଥାକେ ଦୁଟି କ୍ରମାଳ, ଏକଟି ଆତରେ ମାଥାନୋ ଆର ଏକଟି ଏସେଲେ । ଯତକ୍ଷଣ ମସଜିଦେ ଥାକେନ ତତକ୍ଷଣ ଆତର-ମାଥାନୋ କ୍ରମାଳଟିଇ ତିନି ବ୍ୟବହାର କରେନ । ରାନ୍ତାୟ ପାଯଚାରି କରତେ କରତେ ହଠାତ୍ ଚାରଦିକ ଚେଯେ ନିଯେ ବିଶେଷ ଏକ ଗଲିତେ ତିନି ଚୁକେ ପଡ଼େନ । ତଥନ ବୀଂ ପକେଟ ଥିକେ ଏସେ ମାଥାନୀ କ୍ରମାଳଥାନି ବେର କରେ ନାକେର ମାମନେ ଧରେନ । ନର୍ଦମାର ବଦବୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୟତ ଏହିଭାବେ ନିଜେର ପରିଚୟ କିଞ୍ଚିଂ ଢାକିତେ ଚାନ ଖାନବାହାତୁର ମତିନ ଶାହେବ ।

ରାତ ଏଗାରୋଟାଯ ତିନି ଏହି ଗଲି ଥିକେ ବେର ହନ । ଏହି ତାର କାପଡ଼ଚୋପଡ଼ ଚକ-ପଟିର ହୋସେନ ଖଲିଫାଇ ମେଲାଇ କରେ । କୋନୋ କୋନୋ ଦିନ ଯାଓଯା-ଆସାର ପଥେ ଖାନବାହାତୁର ଖଲିଫାର ଦୋକାନେ ଚୁକେ ଚେଯାରେ ବସେ ପଡ଼େନ । ନିଜେର କ୍ରପାଳୀ ସିଗାରେଟ କେବେ ଥୁଲେ ବୁଡ଼ୋ ହୋସେନକେଓ ଏକଟି ବାଡ଼ିମେ ଦେନ ଏବଂ ସିଗାରେଟ ଟାନତେ ଟାନତେ ଖାନିକକ୍ଷଣ ଧରେ ଖୋଶଗଲୁ କ'ରେ କାଟାନ । ଥାନ-

বাহাহুরকে দেখলেই হোসেন মুচকে ছাসে। সেই হাসির অর্থ খানবাহাহুরও হয়ত বুঝেন। যেমন তার মোকানে খানবাহাহুর বসেন না সেদিনও তাকে রাস্তার পায়চারি করতে দেখে হোসেন মুখ টিপে টিপে ছাসে।

কোনো কোনো দিন রাত এগারোটায়ও হোসেনের মোকান খোলা থাকে। তখন চারলিকে নিরালা, নিরূপ ও নিষ্ঠক হয়ে যায়। ফিরতি পথে খানবাহাহুর মোকানের সামনে দাড়িয়ে এক একদিন হোসেনের দিকে সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলেন: খাও, ভালো ঘূম হবে।

হোসেন বলে উঠে: বসবেন না ছজুর?

: না অনেক রাত হ'ল, যাই।

হোসেন এবার তার অভ্যন্ত প্রশ্ন করে বলে: খানবাহাহুর সা'ব, ববে হজে যাচ্ছেন?

: ইনশা আল্লাহ, আগামী বার। এইটিও খানবাহাহুরের অভ্যন্ত

হোসেনও নাকে মুখে ধূম ছাড়তে ছাড়তে উৎসাহ ভরে বলে উঠে: ইনশা আল্লাহ তো বটেই ছজুর। বলে যত্ত যত্ত হাস্তে থাকে। অর্থপূর্ণ হাসি। খানবাহাহুর সেই হাসির অর্থ বুঝেন। তাই হয়ত বলেন: যখনই যাই তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

হোসেন বলে: আমি গরীব মাহুষ, হজ তো আমার উপর ফরজ হয়লি আর তেমন গোনাহও.....। অর্থসমাপ্ত বাক্যের মাঝে হোসেনের বিলিষিত ঠোটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠে। খানবাহাহুরও হোসেনের মুখের উপর একটা অর্থপূর্ণদৃষ্টি হেনে পথ চলতে শুরু করেন। এবার ডান পকেট থেকে আতর মাথানো ক্রমালাটি বের করে নাকে দেন। আতরের যত্ত খোশবু শব্দে উঠেছে তিনি বাড়ির দিকে পা বাঢ়ান।

খানবাহাহুরের গায়ে কিছু জমিদারী আছে, আর শহরে আছে কিছু ভাড়াটে ঘর। কাজেই জীবিকার জন্য তাকে যাথা যায়তে হয়নি কোনোদিন। একটা যাত্র যেয়ে, তারও বিয়ে হয়েছে মাস ছয়েক আগে ম্যাট্রিকের চৌকাট্টে বাবু তিনেক ধাক্কা-খাওয়া এক জমিদার তনয়ের সঙ্গে। এই মেঘে সহকেও আস্তীয় মহলে নানা শুভ ও কানাঘুঁয়া আছে। খানবাহাহুরের বিবি হিলারী বেগম মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে নিঃসন্তান অবস্থায়। বিবির একেকালের বছর তিনেক আগে হঠাৎ খানবাহাহুর সাহেব কলকাতা থেকে বছর আট দশেকের একটি মেঝে নিয়ে এসে হাজির। বাড়ি চুকেই তিনি

‘দোষণা করেন—এই তাঁর মেঘে সিতারা। এই বিবির ঘরে কোনো ছেলেপুলে
হচ্ছে না বলে অনেকদিন আগে তিনি কলকাতায় এক শান্তী করেছিলেন।
পারিবারিক অশাস্ত্রের আশঙ্কায় এই ধরে তিনি জানাননি কাউকে, আহির
করেননি কোথাও। সম্পত্তি সিতারার মা কলেরায় মারা গিয়েছে, তাই
মেঘেকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসতে হয়েছে। প্রকাঞ্চে মুখ বক্ষ হ'ল বটে,
কিন্তু মনে রয়ে গেল অনেকের সন্দেহ। আঘাতদের অনেকে বিশেষত ধারা
নিঃসন্তান খানবাহাতুরের সম্পত্তির ওয়ারিশ হওয়ার আশায় ছিলেন এতদিন,
তাঁরা ভাবলেন, আগাগোড়া কাহিনীটা খান-বাহাতুরেরই নিজের রচনা।
হক-ওয়ারিশদের মাহকুম করার জন্যই তিনি না-হ'ক কোথা থেকে একটা মেঘে
আমদানী করেছেন। এ শুধু তাদের ঠকাবার একটা ফলি। পরে ব্যাপারটি
আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছিল, সিতারা নিজেই যখন কারো কারো গোপন
ফুসলানো প্রথের উভরে বলেছিল তার মা মরেনি, বৈচে আছে। এই নিয়ে
দিলারা বেগম স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন মুখ ভার করেছিলেন— রাগারাগিও
করেছেন। পরে অবশ্য নিঃসন্তান দিলারা বেগমের পক্ষে এইসব সন্দেহ মন
থেকে মুছে ফেলে সিতারাকে মেঘে বলে গ্রহণ করতে বাধেনি। সে যখন এ
ঘরে ঘর করতে আসছে না, তখন মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি—এই
হ্যত তিনি ভাবলেন। বিশেষত মন ছিল তাঁর সন্তানের জন্য বৃত্তক্ষু।
কাজেই অল্পদিনেই দিলারা বেগম হংয়ে পড়লেন সিতারার আশ্বাজান।

কালজ্যে সিতারা শুধু খান-বাহাতুরের নয়, দিলারা বেগমেরও হংয়ে উঠল
নয়ন-পুতলি। সবাই জানল, সিতারাই খান-বাহাতুরের একমাত্র
উত্তরাধিকারিণী।

শ্রাবকগুলী বজায় রেখে যতটুকু লেখাপড়া শিখানো সম্ভব, সিতারার বেলায়
তার ব্যক্তিগত হয়নি। খান-বাহাতুর তাকে স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলেন।
বড় হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্কুলে যাওয়া বক্ষ করে নিয়ে বাড়িতে শিক্ষিত্বাত্মক
রেখে বিয়ের আগ পর্যন্ত তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বেশ ভালো করেই।

সিতারা দেখতে মন্দ নয়, রঙ খুব করসা না হলেও তার দেহ-গঠন ও মুখের
গড়ন অপূর্ব। আয়ত চক্ষু দু'টি কোমল মাধুর্য-মণ্ডিত। সবচেয়ে মধুর তার
গলার স্বর। মধু-কঢ়ী একমাত্র ওকেই বলা যাব। মনে হয় ঐ কষ্ট যেন
একমাত্র গানের জন্যই তৈরী হয়েছে। কিন্তু খান-বাহাতুর তাকে গান শিক্ষা
দেন নি। তবে মাঝে মাঝে দিলারা বেগমকে বলতেন সিতারা তার মা'র
সন্তান পেয়েছে।

মরা কুকুর কেন, মরা বাষেও কান্দঢায় না। শুনে তাই দিলারা বেগম কিছুমাত্র ঈর্ষাবিত হননি। বরং জিজ্ঞাসা করতেন : ভাল গান গাইতে পারতেন বুবি ? খান-বাহাদুর কেমন আনমনা হয়ে যান। বলেন, গান না, কলকাতার মেঝে গজল গাইতে পারতেন খুব ভাল।

তাতেই বুবি আপনার মন গলেছিল ?—বলেই দিলারা বেগম একটু বাঁকা হাসি হাসতেন। আশ্চর্য, খান-বাহাদুর কিন্তু হাসির উভয়ে নিরস্তরেই উঠে পড়তেন। পাছে বা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে !

যাক সিতারার থখন বিয়ের বয়স হ'ল তখন খান-বাহাদুরের একমাত্র উত্তরাধিকারীণির জন্য প্রার্থীর কোনো অভাব হল না। কিন্তু খান-বাহাদুর চাকরিজীবীদের দু'চক্রে দেখতে পারেন না—সামাজিক মাইনের টাকায় শরাফতি বৃক্ষ করে ভালো খাওয়াপরা পর্যন্ত ওরা করতে পারে না। বিশেষত অধিকাংশ চাকরিজীবী শরা-শরীয়তের ধার ধারে না। না রাখে দাঢ়ি, না পড়ে বৌতিমতো নমাজ। এইসব কারণেই তিনি সৈয়দাবাদের ম্যাট্রিকের চোকাঠে হোচ্চ-খাওয়া অমিদার নন্দনটিকে জ্ঞামাতা হিসেবে পছন্দ করলেন। সৈয়দ আরশাদ হোসনের শরীরের পরিধি দেখলেই বোৱা যায়, খাওয়া-পরার অভাব কাকে বলে তারা তা চোকপুরুষ ধরে জানে না। আবার এরি যথে তার মূখ্যগুলে দাঢ়ি-গোফের যে ঐশ্বর্য দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, অন্দুর ভবিষ্যতে খননের সম্পত্তির শুধু নয়—তার দাঢ়ি গোফেরও সে ঘোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। কেউ কেউ সে টিপ্পনি কাটিতেও ছাড়ল না।

বিয়ের দিন, শুভদৃষ্টির সময় নওশা-ক্লপে আরশাদকে দেখে সিতারার মনে যেটুকু উৎসাহ-ঔৎসুক্য জেগেছিল, খুঁত বাড়ি এগে স্বামীর হালচাল দেখে ছাঁদিনে তা কিন্তু উবে গেল। নিষ্কর্ষার টেঁকি নিয়ে হয়ত ঘর করা যায়, দুষ্কর্মের বাঁড়কে সামলাবে সে কি করে !

বাড়ির চাকরানী মতিজানের প্রতি ই আরশাদের যত ফাঁই-ফুরমাস। আরশাদকে পান-পানি তামাকটা দিতে মতিরও যেন আগ্রহটা কিছু বেশি। সিতারার চোখে এইসব শুধু অশোভন দৃষ্টিকূ নয়, অন্ত্যায়ও। এইসবের ভাব এখন থেকে সে নিজের হাতেই নিলে। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত। আরশাদ এখন বাইর বাড়ি থেকেই পান চেয়ে পাঠায় এবং তামাক সেজে মতিকেই ছ'কা নিয়ে আসতে হুম করে। নেশাঙ্গ প্রতিও যে আরশাদের টান ও অভ্যাস আছে, তা টের পেতেও দেরি হ'ল না।

সিতারার মুখে আপত্তি উন্নতেই সে ডেলে-বেঙ্গনে অলে উঠে ধরকে
উঠলো একদিন : কাবো বাপের টাকায় থাই ?

বিয়ের পর প্রথমবার যখন বাপের বাড়ি এল ইশারার বাপের কানে
আরশাদের হাল-চাল সংস্কে আভাস দিয়ে দেখেছে সিতারা। বাপ শত্রু
বললেন : বড়লোকের ছেলেদের ঐ রকম এক আধটু স্বভাবদোষ থাকে
বইকি, মা। ধীরে স্বস্তে সেরে যাবে আপনি।

সিতারার মন কিন্তু কিছুমাত্র সাজ্জনা পেলনা ও-কথায়। মনে মনে রাগও
হ'ল কিছুটা, ভাবল পুরুষমাত্রই বোধ করি এরকম।

মাস ছয় পরে সিতারা আবার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি এল।
ইচ্ছা : মাস দুই এখানে বাপের সামনে, স্বামীকে চোখে চোখে রেখে
শোধৰাবার চেষ্টা করবে।

মেয়েজামাই আসার পর থেকে খানবাহাদুর কিন্তু ন'টা দশটাৰ
মধ্যেই রাত্রে বাড়ি ফিরতে লাগলেন। জামাই প্রথম দু'চারদিন সকাল
সকালই ফিরত, কিন্তু ক্রমশ ফেরার সময় তার বিলম্বিত হতে হতে বারটা,
একটা, কোনো কোনো দিন দু'টা তিনটাও হতে লাগল। কোনো কোনো
দিন ফিরত নেশায় বুঁদ হয়ে। সিতারা জীবন-সমুদ্রে যেন কোনো কূল-
কিনারাই মেঠে পেল না। মা নেই যে তাঁর কাছে মনের দঃখের কথা
বলে, চোখের জল ফেলে একটু সাজ্জনা পাবে। বাপ পুরুষমাহুষ, গভীর
প্রকৃতিৰ লোক, দূৰে দূৰেই থাকেন। বল্জে হয়ত আগেৰ মতোই বলবেন :
বড়লোকদেৱ ছেলেৰ স্বভাব এৱকমই হয়ে থাকে, মা।

বহু কষ্ট-মুখরিত সেই বিশেষ গলিটি। যে গলিতে খানবাহাদুর প্রায়
যোঁজাই যগন্নতেৰ পর তোকেন—এসেল মাখানো কুমালখানি নাকে দিয়ে
ধৰ ধৰে বিছানায় মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে খানবাহাদুর বসেছেন।
মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন আলবোলাৰ স্বৰীৰ্থ নলে। বিছানায় এক পাশে
বসে গৃহকর্তা মন্ত্রজ্ঞ স্বললিত কঠে হাৰমনিয়ামেৰ স্বৰে স্বৰে গেয়ে
চলেছেন উদ্ধু গজল। মন্ত্রজ্ঞ প্রায় প্ৰোঢ়া, বয়স বোধ করি চলিশেৰ
কাছাকাছি, কিন্তু কষ্ট তাৰ মধুবৰ্ণী—স্বৰেৱ তৱলৈ তৱলৈ তাৰ কঠেৰ মাধুৰ
যেন দূৰ-দিগন্তে ভেসে চলেছে। খানবাহাদুর তয়ঘন, মাঝে আলবোলায় টান
দিতেও তুলে যাচ্ছেন।

গান থামতেই খানবাহাদুর উঠে পড়লেন।

মন্ত্রজ্ঞ বলে উঠল : আজ এত সকাল সকাল যে ?

- : মেঘেজামাই এসেছে, এখন সকাল সকালই কিয়তে হবে।
- : আমাই এসেছে? আমাকে একবার আমাই দেখাবেন না? খুশি ও উৎসাহে চোখমুখ তার জল জল করে উঠল।
- : কি করে দেখাই! আমাইকে তো আর এখানে নিয়ে আসা যায় না, আর তোমাকেও বা সেখানে নিয়ে যাই কি করে?
- : তাই তো! দমে গেল মন্ত্রজ্ঞান। নিভে গেল চোখ-মুখের আলো।
- : আচ্ছা যদি.....মন্ত্রজ্ঞানের মনে কি একটা কথা যেন আনাগোনা করছে।
- : কি? থানবাহাহুর জানতে চাইলেন উদাস কর্তৃ।
- : আমাইকে ত আমার কিছু উপহার দেওয়া উচিত...আমার খুব ইচ্ছা। বিষের সময় আমাকে তো নিয়ে রেখে আমলেন কলকাতায়। এ-পাড়া থেকে অন্তর্ব বাস উঠিয়ে নিয়ে গেলেই তো কোন ল্যাটা বাধত না।...
- : সাবধানের মার নেই, তখন কিছু জানাজানি হলে হয়ত বিষেটাই পও হয়ে যেত।
- : যাক, এখন আমি কিছু উপহার দেবই।
- : কি দেবে?
- : এই পড়ি-চেন, সোনার-বোতাম, ফাউন্টেনপেন, আর কিছু আমাকাপড় ইত্যাদি। আর কি দেব?
- : তা বেশ, জোগাড় করে রাখ সব, একদিন নিয়ে গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।.....বলেন থানবাহাহুর।
- : তা কি বলে দেবেন? কে দিয়েছে বলবেন?
- : বলব একজন দূর-সম্পর্কীয়া আঢ়ীয়া দিয়েছেন। বিষের সময় দিতে পারেননি বলে এখন পাঠিয়েছেন।
- মন্ত্রজ্ঞান বলে: তার চেষ্টে বলবেন তোমার শান্তিপূর্ণ মরবার সময় কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন আমাইকে জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য, তা দিয়েই এঙ্গলো কেনা হয়েছে। এতদিন মনে ছিল না।
- : বেশ, তাই বলা যাবে। জীবিত লোকের মৃত্যুসংবাদ রটালে তার নাকি আয়ু বেড়ে যায় অনেক। থানবাহাহুরের গঞ্জীর মুখেও হাসি ঝুটে উঠল।
- : আয় আর চাই না। মরলেই বাঁচি। নিজের মেঘে-আমাইর কাছেও যে পরিচয় দিতে পারে না, তার বেঁচে থেকে লাভ?.....বিমর্শমুখে মন্ত্রজ্ঞান জানালে।

খানবাহাতুর হালকা হতে চাইলেন : দিলারা চলে গেছে বহু আগে ; তুমিও যদি চলে যাও, তা হ'লে এ বেচারা বাঁচে কি করে ?—বলেই দাঢ়ির ফাঁকে হাসি ফুটিয়ে তুমেন আর একবার।

কিছুটা ব্যক্ত স্বরে ময়ুজান বলে : আর একটা মনোগ্যারা জুটতে দেরি লাগবে না।

তেমনি হালকা স্বরেই খানবাহাতুর বলেন : শুনেছি মনোগ্যারাই তো ময়ুজান হয়েছে।

কথাটা সত্য বলেই হয়ত ময়ুজান কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ততক্ষণে খানবাহাতুর নেমে পড়েছেন রাস্তায়।

মাসবানেক পরের কথা ।

খানবাহাতুর বিশায় হয়েছেন অনেকক্ষণ। রাত প্রায় এগারটা। গরমের দিন, ময়ুজান হাওয়ার আশায় দরজাটা খুলে রেখেছিল। হঠাতে এক অপরিচিত যুবক এসে ঘরে চুকলে। দেখলেই মনে হয়, নেশা করেছে। পাটলছে, মুখের কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

টলতে টলতেই আউড়াচ্ছে : বাঙ্গজী, গানা গাও। বাঙ্গজী, গানা গাও।

এইসব দৃষ্টি ময়ুজানের অদেখা নয়, নয় অজ্ঞান।—এবং কিছুমাত্র অঘটন নয় এইসব পাড়ার। কিন্তু সে চমকে উঠল ছোকরার হাতের ছড়িটা দেখে। পাঞ্জাবীর সোনার বোতামগুলোও তো সে বে প্যাটার্নে তৈয়ার করিয়েছিল অবিকল সেরকম। হাতের রিস্টওয়াচটাও তাই মনে হচ্ছে। আটটাও তো। জামাইর জিনিসপত্র চুরি হয়েছে বলে কোনোদিন শোনেনি খানবাহাতুরের মুখে ! তবে সত্যিই কি চুরি হয়েছে ! সন্দেহ-দোলায় হৃলতে লাগল তার মন।

জামাইর চেহারা ও অবয়ব সমস্কে সে বছদিন খানবাহাতুরের কাছে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করেছে। যে ব্রকম শুনেছিল, তার সঙ্গে যিলিয়ে দেখতেই তার মনে যেন কোনো সন্দেহ রইল না। লজ্জায় সকোচে তার মরে যেতে ইচ্ছা হ'ল.....তার সব অবয়ব, তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন বলতে লাগল.....ধরণী বিধা হও, ধরণী বিধা হও।

ঐশিকে মাতালটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আর বলে চলেছে : বাঙ্গজী গানা গাও, বাঙ্গজী গাও।

ময়ুজান যতই শরে ধায়, মাতাল-ও ততই তার দিকে এগিয়ে আসে।

অগত্যা মনুজান খিকে ডেকে বলে : একে হাত মুখ ধোবার পানি দাও। মাতালকে বলে : বাবা তুমি চেয়ারে বস, হাত মুখ ধোও, কিছু খাও, আমি গান শোনাচ্ছি এক্ষনি। বলেই সে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বি এসে মাতালটাকে গোসলখানায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে মাথা ও হাত মুখ ধুইয়ে খানিকটা প্রক্রিতিহ করে নিয়ে এল। মনুজান একহাতে পাস ও অন্যহাতে এক খালা মিষ্টি নিয়ে কিবে এসে তার সামনে রেখে বলে : বাবা, খাও। এবং পাশে দীঘিয়ে একখানা হাতপাখা দিয়ে পাথা করতে লাগল তার মাথায়।

যুবক তবুও ইতস্তত করছে দেখে মনুজান কের অশুনয়-বিনয় করে বলে : বাবা, খাও, খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও, বাবা। ভালো আছত বাবা?

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শাহস হয় না, যদি খপ করে হাতটা ধরে বলে। সে দ্বাতে জিব কাটলে।

যুবক কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল : বাবা, বাবা করছ কেন? এখানে আমি মিষ্টি খেতে আসিনি, গান শনতেই এসেছি, গান। বোতল টোতল থাকেত বের করো; মিষ্টি কে খায়? শরবত খাব তো যেয়েরা।

: সব দেব, বাবা, আগে একটু মিষ্টি-মুখ করতে হয়। খাও বাবা, একটু শরবত খাও, ভালো হবে।

যুবকের নেশার ঘোর বোধ করি এর মধ্যে স্বতে শুল্ক হয়েছে। সেও এবার কিছুটা অবাক হ'ল বইকি। হয়ত ভাবলে, দেখাই যাক না। কাজেই পেট-ভয়ের মিষ্টি খেলে, বরফের শরবতও বাদ দিলে না। বি গান ও লিগারেট দিয়ে গেল একটি ছোট প্লেটে করে। কি খেয়াল হ'ল, কে জানে, মনুজান ড্রায়ার ধূলে সেই প্লেটের উপর বাথলে ঢুটি গিনি।

এবার আরশাদের আরো অবাক হবার পালা। মাথা মুগু সে কিছুই বুঝতে পারলে না। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করে তার বিশ্বাসের সীমা-পরিসীমা রাইল না। এই প্রৌঢ়ার চিবুক ও নাকের সঙ্গে সিতারার আশৰ্ব ফিল রয়েছে, চলার ভঙ্গিটাও প্রায় একই রূক্ম। গলার গড়নে শুধু নয়, স্বরেও অস্তুত মিল—এই বয়সে সিতারা নিশ্চয়ই এ রূক্ম হবে। সিতারার বয়সে এ বোধ করি অবিকল সিতারার যতোই ছিল। বিশ্ববিশ্বারিত চোখে সে তাকিয়ে রাইল মনুজানের দিকে। হঠাৎ মনুজান গিনি ঢুটি তার হাতে তুলে দিয়ে বলে : নাও বাবা, তোমাকে দেখে আমার জীবন সার্থক হ'লঃ আজ।

বিশ্বিত আৱশ্যাদ বলে উঠল : তুমি, তুমি.....আপনি কে ?

: আজ নয় বাবা, পৰে বলব ।

: না, আজই বলতে হবে । উঠে দাঢ়াল উত্তেজিত আৱশ্যাদ ।

: না বাবা । আজ্ঞ শুনতে চেয়ো না, আৱ একদিন বলব । আমি তোমাৰ
পৰ নই, শুধু এইটুকু জেনে রাখ আজ ।

: না, এক্সনি বলতে হবে সিতারা আপনাৰ কে ?

: সিতারা ! সিতারা ! সিতারা আমাৰ কে ? কেউ না ।—মনুজানেৰ
বিশ্বিত কষ্ট বলে ফেল ।

: নিশ্চয়ই কেউ । উত্তেজনায় আৱশ্যাদেৱ সৰ্বশৰীৰ ধৰ ধৰ কৰে কাপতে
লাগল । হঠাং টেবিলেৰ উপৰ থেকে কফি-কাটা ছুরিখানা তুলে নিয়ে সে
চিংকার দিয়ে উঠল : না বলতো..... সে ছুরিখানা বাগিয়ে ধৰল ।

: সিতারা আমাৰ মেয়ে বাবা । তাৱ অজ্ঞাতসাৱেই যেন মনুজানেৰ ভীত-
কম্পিত কষ্ট থেকে কথা কয়টি বেৱ হয়ে পড়ল ।

: সিতারা তোমাৰ মেয়ে । বেঞ্চাৰ মেয়ে !—ছুরিখানা ছুঁড়ে ফেলে সে ক্ষত
বেৱিয়ে গেল । বাইৱ থেকেও মনুজানেৰ কষ্ট শোনা গেল : আমি কি কৱলাম,
খোলা আমি কি কৱলাম ?

মনুজান মৃছিত হয়ে পড়ল কি ?

* * *

সিতারা ঘূমিয়ে পড়েছিল । রাত একটা দু'টা হবে বোধ কৰি, হঠাং কি
একটা শব্দে তাৱ ঘূম গেল ছুটে । কোথায় যেন কুকু কঠে তক ও বাদাহুবাদ
হচ্ছে । সে উঠে বসল । আৱশ্যাদ বিছানায় নেই, হয়ত আসেনি । উত্তেজিত
ও চাপা-কঠেৰ শব্দ যেন তাৱ আক্ষাৰ ঘৰ থেকেই আসছে । সে ছুটে গেল
ৰাপেৰ ঘৰেৱ দিকে । দৱজাৰ বাইৱে দাঢ়িয়ে শঙ্গু-জামাইৰ তক সে কিছুক্ষণ
থবে শুনল ।

আৱশ্যাদ উত্তেজিত কঠে তাৱ বাবাকে ধমকাচ্ছে : তুমি একটা বেঞ্চাৰ
থেৱেকে আমাৰ সজে বিয়ে দিয়েছ, আমি কাল ধানায় ধৰৱ দেব । কৌজদাৰী
কৰব, ধৰৱেৰ কাগজে তুলে দেব সব ঘটনা, তোমাৰ কীভি-কাহিনী ।

খানবাহাহুৰ অহুনয়-বিনয় কৰছেন : এটসব বাবা, ঘৰেৱ কথা বাইৱে
আহিৱ কৰে কি লাভ ? তোমাকে আমি যত টাকা চাও দিছি, আৱ আমাৰ
শৰ্ষস্ত সম্পত্তি সিতারাই তো পাবে, বলত এখনি তাকে সব লিখে দিই ।

আৱশ্যাদ উত্তেজিত কুকুকঠে জানালে : এক্সনি নগদ পাচ হাজাৰ টাকা

আমাকে শনে দাও। আর সিতারার নামে নয়, আমার নামেই সমস্ত সম্পত্তি
লিখে রিতে হবে।

অসমান ভয়ে ভীত খানবাহাদুর তাতেই যেন রাজি। তক্ষনি উঠে লোহার
সিদ্ধুক খুলে পাঁচ হাজার টাকার নোট শনে টেবিলের উপর রাখলেন। বলেন :
কাল উকিল ডাকিয়ে দলিল করিয়ে দেব।

বাইরে দাঢ়িয়ে সিতারা সবই শনল। এইবার ঘরে তুকে বাবাকে লক্ষ্য
করে সে বলে উঠল : আৰা, আমি তোমার মেয়ে তো ?

: নিশ্চয়ই। হতভম্ব খানবাহাদুরের কষ্ট থেকে নির্গত হ'ল।

: আমার মা মরে গেছেন জানতাম। আমার আৱ একটি মা যদি বেঁচে
থাকেন, তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি যখন আমার বাপ, আৱ আমি
যখন তোমার মেয়ে, তখন তোমার সমস্ত টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির আমিই
মালিক। আমার কথা ছাড়া এৱ এক কপৰ্দিকও কাকেও দিতে পারবে না।—
বলেই টেবিলের উপর থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট সব নিজের হাতে তুলে
নিলে।

এইবার আৱশ্যাদকে লক্ষ্য করে বলে : যন্মজ্ঞান বাস্তুজীৱ কাছে যখন
গিয়েছিলে, শাশ্বতি ভেবে, বা জী ভেবে তো যাওনি ; বেঞ্চা ভেবেই তো
গিয়েছিলে ? তবে বেঞ্চার মেয়ের প্রতি এত স্বৃণা কেন ? অথচ বেঞ্চার
মেয়ের টাকার প্রতি লোভ তো এতটুকুও কম নয় ? বেঞ্চার মেয়ের টাকা চাও
নাকি ? চাইলে পাবে, ঠোঁটে তাৱ বিজ্ঞপেৰ বাঁকা রেখা। তোমার মুখেৰ
গ্রাম আমি কেড়ে নিতে চাই না। আৰা এই ছ'মাসে আমার বিয়েৰ সাধ
মিটে গেছে। আমি আৱ এ-কম অপদীৰ্থ তথাকথিত বড়লোকেৰ ছেলেকে
নিয়ে ঘৰ কৱতে পারব না। গৱীব হক, কোনো শিক্ষিত ভজ্জেলেকে যদি
পাওয়া যায় তখন না-হয় আৱ একবাৰ নীড় বাঁধাৰ চেষ্টা কৱা যাবে।

আৱশ্যাদকে লক্ষ্য করে ফেৰ বলে : এই টাকা চাও নাকি ? চাইলে শৰীয়ং
মতো আমাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, এক্ষনি টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বলো,
তিন তালাক.....

চৰ্দিষ্ট জমিদাৰ-তনয় তক্ষনি স্বৰোধ বালকেৰ মতো আউড়ালে : তিন
তালাক।

সিতারা লোটগুলি সব আৱশ্যাদেৰ গাছেৰ উপৰ ছুঁড়ে মেৰে স্থাণ্ডেৱেৰ
পটাপট শব্দ কৱতে কৱতে ঘৰ থেকে বেৱিয়ে গেল।

আৱশ্যাদ উপুৰ হয়ে ঘৰময় ইতস্তত ছড়িয়ে-পড়া নোটগুলি এক একটি কৱে

ଶୁଣେ ଶୁଣେ କୁଡ଼ିରେ ନିତେ ଲାଗିଲ । ଆଉ ଅଜ୍ଞାତେହି ଯେନ ବଳେ ଚଙ୍ଗ, ଏହି ବାବା,
ଫେଳ ନା ନୟ, ଏକ ଏକଟା କାଗଜେର ଦାମ ଦଛ, ଦଛ, ରୋପେଯା ! ଆଉ ଏହି ଟାକାଯି
ଶତ ସିତାରୀ.....

ଆଶର୍ଥ ଏକଦିନ ଯେତେ ନା ଯେତେହି ଦେଖା ଗେଲ ଶହରେର ସବ ଦୈନିକେ
“ଥାନବାହାତୁରେର କେଳେକୋରୀ” ଏହି ଶିରୋନାମାୟ ସବ କଥାହି ବେଶ ପର୍ମବିତ ଓ
ମୁଖରୋଚକ କରେ ପରିବେଶନ କରା ହଲୋ । ବଲାବାହଲ୍ୟ ତାର ଜଣ୍ଠ ଯେ କ୍ରିତ୍ତ ଧରଚ
ହଲ ତାଓ ଥାନବାହାତୁରେର ଟାକା ।

ତାହି ବଲଛିଲାମ : ଟାକାଯି ସବ କଥା ଢାକାଓ ଥାକେ ନା ॥

ଦୁଇ ଚୋଥ

ଶ୍ରୀକତ ଓସଗାନ

—କାସ୍ଟମର ଜାହାଜ ଆଇମେ ।

ସତ୍ୟଈ ବିଭାବ ପୁଲିଶେର ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲି । ମୈଶ ମଦୀର ଭିତର ଏକଟାନା ଯତ୍ରଧବନିର ଆଁଓଯାଜ କ୍ରମଶ ସ୍ପଷ୍ଟତର ।

ଜହିର ଯିବା ସାମ୍ପାନେର ବିବନ୍ଦ ଆଲୋ ଆରୋ ବାଡ଼ାଇସା ଦିଲ ।

ବର୍ଷାର ଆକାଶେ ଇତଃକିଞ୍ଚ ମେଘ । ସାରା ହଙ୍ଗୁର ବୃଣ୍ଟି ହଇଯାଇଲି । ଜଳଆବୀ ମେଘେର ଦଲ ଦିଗନ୍ତେର କୋଣେ ଛାଉବୀ ଫେଲିଯାଇଛେ । ଆପାତ ନଭ-ଅଭିଯାନେର କୋନ ସନ୍ତାବଦା ମାଇ ।

ସାମ୍ପାନେର ଭିତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହାଓସାଯ ଲର୍ଣନ ଦୁଲିତେହେ । ଆଲୋର ଦିକେ ପିଠୀ, ଜହିର ଯିବାର ଛାୟା-ମୂର୍ତ୍ତିଟୁକୁ ଆନ୍ଦାଜ କରା ଯାଏ । ଗଲୁଇସେର ମୁଖେ ଆରୋ ଏକଟି ମାହୁସ ବସିଯାଇଲି । ହାୟାର ରେଖାମାତ୍ର ।

ଜହିର ଯିବା ଆବାର ବଲିଲ, କାସ୍ଟମର ଜାହାଜ ଆଇମେ ।

—ଆଇତେ ଦାଁ୭, ଆଁଅର ସାମ୍ପାନେ ଆଫିମେର ପା’ଡ ଆଛେ ? ସନ୍ତୀ କରିଯେର ଜୟାବ ।

—ନା, ବା’ଇ, ଧୀରାଖା ମୁଣ୍ଡକିଳେ ଫେଲାଯ । ହେବାର ମନେ ଆଛେ, ଏକାଥେ ସାମ୍ପାନ ତତ୍ତ୍ଵନ୍ତ କରେ ଛାଡ଼ିଲି ।

—ଜରେବ କି ଆଛେ ? ଆଇତେ ଦାଁ୭ ।

ମଦୀର କିନାରା ହଇତେ କଥେକ ଶ’ ଫିଟ ଦୂରେ ନୋଙ୍ଗର କରିଯାଇଲି ଜହିର ଯିବା । ଶ୍ରୋତର ତୋଡ଼େ ଆଚାର୍ଡ ଥାଇତେହେ ସାମ୍ପାନଖାନି ।

—ବା’ଲୋ ହସି ବହିଯୋ, ଯିବୀ । ପାନିର ମନ୍ଦି ସାର୍କାର ଚାଉ ନଅ ?

ଜହିର ଯିବା ଆନମନା ବସିଯାଇଲି, ପାନିର ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ୟ ମେ ଯାଇତେ ଚାସି ନା । ସନ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନେର କୋନ ଉତ୍ତର ପାଇଲ ନା ।

—ବା’ଲୋ ହସି ବହିଯୋ, ଯିବୀ ।

ଜହିର ଯିବା ଏହାର ସାମ୍ପାନେର ମାବାଧାନେ ସରିଯା ବସିଲ ।

ଅକ୍ଷକାର ମଦୀବକେ ଲର୍ଣନେର ଆଲୋ ଚକଚକ କରିତେହେ । ସେଇ ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଫିରାଇଲ ମେ ।

—চুপ বইয়ে ? মন তোমার খারাব, অ যিৱঁা ? কৱিষ পুনৰাব জিঞ্চাশা
কৱিল।

জহিৰ মিয়াৰ মন খারাপ হওয়াৰ কথা। কয়েকদিন বাড়ি ছাড়া সে। আঁচ
ফিৰিয়া ঘাওয়াৰ নিৰ্ধাৰিত দিন। এখনও বিলখ হইতেছে।

—ঝাঅৱ মন আছে ? ইডা কি কও, যিৱঁা ? হফ্তা পাৱাব। গ'ৱৎ
একশুয়া চৈল ন আছিল।

এক সপ্তাহ জহিৰ মিয়া বাড়ি ছাড়িয়াছে। ঘৰে একদানা চাউল দিয়া
আসে আই।

—ও বা'বী সা'ব বা'লা মাহৰ্য। তো কিঙ্গাই ?

কিমেৰ জন্য তয় ? জহিৰ মিয়াৰ স্তৰী কুণ্ঠম যখন ভাল মাহৰ্য।

—বা'লা মানুষি দি' পেট ন ভৱৎ।

জহিৰ মিয়া বোৰানোৰ চেষ্টা কৱিল, ভালমানুষি দিয়া অঠৰ সমস্তাৰ সমাধান
হৱ না।

বোধহয় কেৱোসিন ছিল না, সৰ্থনেৰ আলো আৱো কীণ হইয়া আসিল।
তক দৃই ছায়া-মূর্তি। লঞ্চেৰ ইঞ্জিনেৰ শব্দ মিকটতৰ হইতেছে। জহিৰ মিয়া
চক্ৰ বুজিয়া মাথাখানি দৃই ইটুৰ উপৰ রাখিল।

(বাত্তিৰ কৃষ্ণছায়া জিত ঘেলিতেছে। মেঘেৰ আনাগোনা কুকু হইয়াছে
পুনৰাব। বৰ্মাৰ অনিশ্চিত আকাশ। বাড়েৰ ছোৱাচ লাগিতে কৃকৃণ।

দিগন্তে ঘন-অক্ষকাৰেৱ নিঃশব্দ বিস্তাৰ রাঙা মাটিৰ গিৰিশ্রেণীৰ ধূমৰ তুকতাৰ
বিভৌষিকাৰ প্ৰলেপ আৰিতেছে। পাতলা মেঘবাশি পাহাড়েৰ শীৰ্ষে, প্ৰত্ৰ ও
তৰঙ্গশ্ৰেণীৰ কায়ালোকে প্ৰতিবেশীৰ যমতা-সকানী। চকিত ইশারায় সকীহীন
একটি অক্ষত অস্তিত্বেৰ পৱিচয় দিয়া পুনৰাব হাবসী ঝুলুমেৰ মথে আত্মসমৰ্পণ
কৱিল।)

সেইসিকে দৃই ছায়া-মূর্তিৰ বোৰা দৃষ্টি।

বন্ধৰেৰ আৱ এক দিকে দিনেৰ স্মৃচ্ছা। বিদেশী জাহাজেৰ বাতি, পোট-
ইয়াডেৰ আলো, জেটিৰ পাহারাদাৰেৰ তীক্ষ্ণ সকানী-ৱশি—সব মিলিয়া
প্ৰতিদ্বিতাৰ প্ৰতীক, ক্ৰগদ, গুৰু-গন্তীৰ কাৰ্গো জাহাজেৰ হইসেলে স্বতন্ত্ৰ অগং
থৰথৰ কাপিতেছে।

এই দিকে আৰাব চোখ ফিৰাইল জহিৰ মিয়া।

দূৰ হইতে দেখা যাব, বৈশ বন্ধৰেৰ আলোকাকীৰ্ণ ঝগ। তবু অক্ষকাৰেৱ
অনতা গৱীৰ আঘীয়েৰ ঘত মানবিক দষ্পেৰ প্ৰাসাদ-চৰেৰে প্ৰতীক্ষ্মাণ। শীৰ-

দেহ, সকোচ-আড়ষ্ট। দুই দিগন্ত, দুই ভিন্ন-দেশী অবকেন্দ্রীয় মত মিশিয়া।
বাইতেছে বিচিত্র গমক ও যুর্ছন্মায়।

—খুব দেরি হইয়ে, মিয়াং।

—দেরি আলবৎ হৈব। উঁয়াঁগোৱ নাম সদাগৱ।

—আৰু সদাগৱ বা'লা মাহুষ।

—বা'লা ! হিতাজাই দেরি ! কি কও ?

সওদাগৱ ভাল মাহুষ। সেইজন্ত দেরি হইতেছে। কৱিমেৰ কঠে প্ৰেৰ
অড়ানো।

—চেল আনব ?

—ঠিগ, দেইথে। চুলা ঠিগ, কনিয়াবে—

জহিৰ মিয়া সঙ্গীৰ কথাৰ মধ্য-পথে বলিল, চেল। অল্পষ্ট বাহিৰ হইয়া
আসিল তাৰ ঠোটে, চেল ! নিঙিদিষ্ট পুৱাতন বকুল মত সে যেন চাউলেৰ অবৱৰ
দেখিতেছে মনকচু দিয়া।

সাঞ্চানেৰ অন্ত মাঝি মহাজনেৰ আড়তে পিলাছে পাওনা টাকা আহাঙ্ক
কৱিতে। সে চাউল কিনিয়া আনিবে। তাৰই প্ৰতীক্ষা-বত হৈজন।

—বড় দেরি হইয়ে।

—কলা'ম না, উঁয়াঁগোৱ নাম সদাগৱ। ঠিয়াং ন দিইয়ে, বা'ই।

জহিৰ মিয়া প্ৰতিবাদ আনাইল। মহাজন নিষ্ক্ৰ টাকা মিটাইয়া দিবে।
চাউলেৰ সওদায় দেরি হইতেছে।

দম্কা ঠাণ্ডা বাতাস শন্খন বহিয়া গেল। আবাৰ বৃষ্টিৰ সজ্জাবনা। জেলে-
পাড়ায় কুকুৰগুলি ইষ্টাৱ ডাকিয়া থাইতেছে। নদীৰ কিনারায় মৌকা ও
সাঞ্চানেৰ মাঞ্চলেৰ সাৰি-সাৰি ছায়া-ৱেৰা। বাঁশেৰ স্তুপ পড়িয়া বহিয়াছে
কোথাও। অনুদিক জ্যোৎস্নাৰ আলো-আধাৱে জাল-বোনা ভূমি-শায়িত বাঁশেৰ
ৱেৰা স্তুপ ঝৰ্ণা ঘনে হয়, যেন বাতাস দিলেই চেউ উঠিবে।

জহিৰ মিয়াৰ মাথায় কিণ্ঠী টুপী। মগ্ৰীবেৰ মাঘাতেৰ পৰ আৱ খুলিতে
মনে নাই। অংশ দেহ তাৰ। নদীৰ জলো-বাতাসে ঠাণ্ডা লাগে। গামছা
সাঞ্চানেৰ আৱ এক কোনায় পুঁটিলিৰ ভিতৰ। অলসভাৱ জগন্দল সম্মুখে।
দেহ আৰুণ্যেৰ কোন বস্তোবন্ধ কৱিল না জহিৰ মিয়া। বক্ষস্থিত হাত ছ'টিৰ
মধ্যে উভাপ খুঁজিতে লাগিল।

লক্ষেৰ শব্দ নিকটতাৰ। আলো আলো নাই পুলিশেৰ লোক। তখু ঘুঁটঘুঁট
শব্দে মাঝিয়া। লক্ষেৰ হাল-হকিকৎ বুঝিতে পাৱে।

সঙ্গী করিমকে সাম্পানের ভিতর যাইতে দেখিয়া জহির মিয়া বলিল, আ'আর
গামছা থান্।

কিন্তু তার চেয়ে শশব্যন্ত হইয়া সে পুঁটলি ভালকণে দেখিবার অস্ত অবরোধ
করিল। দহপুরের বৃষ্টির সময় সে এদিকে ঘৰোঝোগ দিতে পারে নাই। পুঁটলির
ভিতর একটি শিখপাঠ্য পুস্তক ছিল। ভিজিয়া গিয়াছে হয়ত।

জহির মিয়ার তর সহিল না। সে নিজেই সাম্পানে ঢুকিয়া পড়িল।

—না, মিয়ঁ। বা'ই, কিতাবের গা'ত পানি ন লাগই। সঙ্গী বলিল ভিতর
হইতে।

তবু ভৱসা নাই! জহির মিয়া নিজেই পুঁটলি পরীক্ষা করিতে লাগিল।
অতি কষ্টে সে পুঁজের জন্য পুস্তকখানি খরিদ করিয়াছে। এক টাকায় পাঁচ পোয়া
চাউল ত' হইত। কুলহুমের সঙ্গে ইহা লইয়া বচসা শুরু হইবে। জঠরে অন্ধ
না দিয়া লেখাপড়া শেখানোর পক্ষপাতী সে নয়। মাইয়া ফুয়ার আকেল।

জহির মিয়া তন্মতন্ত করিয়া পুস্তকের পাতা দেখিল। না, কোথা ও স্যাতসৈতে
লাগ পর্যন্ত লাগে নাই। করিম হাসিতে লাগিল।

—যা' করতাছেন, বা'ই, আ'আর হাসি মুখতন বাঁপ দি পড়ে।

—ফুয়ার কিতাব, বা'ই।

করিম ভাবিয়াছিল কোন মণি-বাণিক্য। বিঙ্গ করিয়া সে জানাইল।

—আ'আর ফুয়ার কিতাব।

জহির মিয়ার পুত্র সমিক্ষন্দীনের পুস্তকখানি।

—ঠিগ্ আছে?

—বেগ শুয়ান ঠিগ্।

হইজমে সাম্পানের বাহিরে আসিল। রঞ্জনের শিশা নিবু-নিবু। করিম
দোলাইয়া দেখিল, তেল নাই। নিবিয়া গেজ লঠিল।

—শলাই আছে?

—ই।

জবাব আসিল, ই।

দেশলাই ভিজিয়া না যায়। সঙ্গী মহাজনের আড়ু হইতে ফিরিয়া আসিলে
রাগা চাপাইতে হইবে। এই শ্রেতের তোড়। বাড়ি ফেরা মুশ্কিল। জহির
সাবধান করিয়া দিল।

—মিয়ঁ। বা'ই, সমিক্ষন্দী মুক্তবে পড়ে?

—হ। খুব 'জেহেন' তেজ। শুলুবী সা'বে কন।

—গৰীবেৰ ঘৰৎ জেহেন-তেজ ফুয়া। আজাৰ বহুমৎ।

—জেহেন তেজ অইলৈ কি। ওঁই লেখাতে পড়াতে পাৰমু?

—আজা ধালিক, মিৱঁ-বা'ই। মিৱঁ বাইখেন। পুৱা হৈব।

জহিৰ কিছুক্ষণ শুক ধাকিয়া আবাৰ বলিল, সদাগৱেৰ গ'ৱৎ এত দেৱি।
আজ আৱ ন' আইয়ে। কৱিম মহাজনদেৱ উদ্দেশ্যে গালি বৰ্ণণ কৱিতে লাগিল।

—চূণ, মিৱঁ। মিছা গাল দি' হৈব কি?

কৱিম বিড়বিড় শব্দে আজোশ বাড়িতে লাগিল তবু জহিৰ মিয়া গলুৱেৰ
মুখে শুক। গালে গামছাধানি বেশ উভাপ ছড়াইতেছে। আজ বাড়ি-ফোৱা
উচিত ছিল তাৰ। একটি পয়সা দিয়া আসে নাই। কুলহৃষি কোথাৰ হাত
পাতিৰে! খণ-দেওয়াৰ লোকই বা কোথায়! দ্ব-দ্ব বিব্রত প্রতিবেশীবৰ্গ।
সমীৱেৰ মকৃতব মিষ্টিমিত যাওয়া হইবে না। মৰ্মেলবী সাহেব বলিয়াছেন, এমন
মেধাবী ছাত তিনি জীবনে দেখেন নাই। কোন ছকমে পড়াৰ খৰচ জোগাইতে
পাৰিলৈ এই ছাত্ৰ কালৈ বড় ‘অফিসাৰ’ হইবে। জহিৰ মিয়া ভবিষ্যৎ মৰীচিকা-
জাত আনন্দেৱ পাণপাণি নিৱাশা-ক্লিন্থ বৰ্তমানেৱ ব্যঙ্গ কশাধাত অহুভব
কৱিতেছিল সারা শৰীৱে। মহাজনেৱ টাকা না পাইলৈ ক্ষতি নাই। কিছু
চাউল লইয়া সে বাড়ি ফিরিত! সক্ষে কিছু টাকা আছে। কিন্তু সকৌটি এমন
আহস্কৰ, দেৱি কৱিতেছে বৃথাই। তিনজন না হইলৈ উঞ্জানে ষাওয়া অসম্ভব।

আকাশে চাঁদ নাই। জোহাবেৱ সময় ঠিক কৰা যাইবে না। চাঁদেৱ
কাঁটায় কাঁটায় জহিৰ মিয়া বলিতে পাৰে, কখন শুক হয় জোয়াৰ-তা'টা।

(মেষেৱ দৌৱাঞ্জ্যে কালো ছায়া পড়িয়াছে নদীৰ আৱশ্যীৰ উপৱ। দিগন্তে
পাহাড়েৱ ব্ৰেখা অস্তৰিত। শুধু মেঘ-পুঁজি ফেনস্কীত সমুদ্ৰেৱ মত গৰ্জন কৱিয়া
অগ্ৰসৱ হইতেছে। তৌৰ বাতাস ইঠিলৈ ঘূৰ্ণিবড় শুক হইতে পাৰে।)

সাম্পাদনে দুইজনেৱ মনে অবশ্য এই আশকাৰ কোন ছায়া নাই। সকৌট
প্ৰতীক্ষাৰ পিছনে অগাঞ্জ চিঞ্চাৰ বিভীষিকা লোপ পাইয়াছে।

লঞ্চ এবাৰ নিকটতৰ। নদী-সমতল অস্তকাৰ। তবু ইঞ্জিনেৱ ঘট-ঘট-
শব্দ ও বাঞ্চ-নিশ্চাৰী অলেৱ শুইৎ-শুইৎ ব্ৰহ্ম মাথিদেৱ আন্দাজে প্ৰতাৰণাৰ জাল
ফেলিতে পাৰে বা।

—খুব নজদিগ আইয়ে।

—আইতে দাও। ঝাঅৱ কিছু আছে? এত ডৱ কিমাই?

—লৰ্ণু নাই। সন্দ কৰমু না?

—ডৱ কিমাই? অঁৱা আপিম বেচি, ব গাঁজা?

କରିଯାଇଲୁ ଆନ୍ଦୋରା ଯୁବକ । କଷେ ବୀର ବେଶ । ଆବାର ଜୋର ଦିଯା ବଲିଲ,,
ଡର କିମ୍ବାଇ, ଅହିର-ବା'ଇ ?

ଜେଳେ ପାଡ଼ାଯ ଡୁଗ୍‌ଡୁଗ୍, ଟୋଲକ ସାଙ୍ଗିତେଛିଲ । ଧାନା-ବୀଧା ମେଘ ବାତାଦେଇ
ଫୁଂକାରେ ଉଡ଼ିଯା ଗେଲ । ଯୁତ ଟାଦେର ପ୍ରେତାଆ ବୋଥ ହୟ କୋଣୋଓ ମେଘେର କାହିଁ
ସନ୍ତୋର । ଆକାଶେର ଭୟକର ରକ୍ତ ଫିକେ ହଇଯା ପିରାଛେ । ଶାମ-ଶୁଭ ଜଳଦର
ବୈଶ-ଜଗତେର ପଟ୍ଟମି ରଚନା କରିତେଛେ ।

ଅହିର ଯିଯା ଆନ୍ଦମା । ଏତ ବାତେ ଗ୍ରାମେର ପଥ ପିଛଲ । ଥାନା-ଥୋଳକ
ବୃକ୍ଷର ପାନିରେ ଭରା । ବ୍ୟାଙ୍ଗେର ଡାକ ଅମ୍ବୁଧାସୀ ସାପେର ଦଳ ଜୁଟିତେଛେ । ମଞ୍ଜିଦ
ଏଥନ୍ତି ଫିରିଲ ନା । ନା, ବାଡ଼ି ଫେରା ହଇବେ ନା ଆଜ । ସମୀର ଯକ୍ତ୍ୱେର ପଡ଼ା
କରିତେଛେ' ଡିବାର ଆଲୋଯ । ତାପିଦ ଦିତେଛେ ବୁଲମ୍ବୟ । କେରୋସିନ ପୁଡ଼ିତେଛେ,
ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପଡ଼ା ସାରୋ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି...

ଲକ୍ଷ ଖୁବ ନିକଟେ । କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଠାହର କରା ଚଲେ ନା । ଅହିର ଯିଯା ଶକ୍ତାବ୍ଧିତ
ବୁକେ ଦୃଷ୍ଟି ତୌଙ୍କ-ମଜାଗ କରିଲ ଅକ୍ଷକାର ସମତଳେର ଉପର ଦିଯା । ନା, ଚୋଥ ଏଥାମେ
ପଞ୍ଚ ଇଃଶ୍ଵର ।

—କାଟମର ଆହାଜ ଆଇଯେ ।

—ହ ।

ଅକ୍ଷକାର ନଦୀବକ୍ଷ ଚିରିଯା ହଠାଂ ଆଲୋର ବର୍ଣ୍ଣ ନିକ୍ଷେପ କରିତେଛେ ତାରା ବେଳ ।
ସକ୍ତାନୀ-ଆଲୋଯ ଚୋଥେ ଦିଶା ଲାଗେ । ସବ ସବ ହଇଯା ଆମେ କିନ୍ତୁକଣ ପରେ ।
ପଞ୍ଚାଶ ସାଟି ଫିଟ ଦୂରେ ରିଭାର-ପ୍ଲାନେଶେର ଲକ୍ଷ । ଡେକେ ଆଲୋ ଜଲିତେଛେ । ଟର୍ଚ
ଫେଲିତେଛେ ଲକ୍ଷେର ଆପାତତ ମାଲିକେବା ।

ନେଶ ଡାକେ କମ୍ପାନ ଆଗେ : ଅ' ସାମ୍ପାନେର ମାଝି ।

ଟର୍ଚେର ଆଲୋ ପଡ଼ିଲ ଅହିର ଯିଯାର ସାମ୍ପାନେର ଉପର । ଆଶେପାଲେ ଆରୋ
ସାମ୍ପାନ ବହିଯାଛେ । କୋନ୍ ମାଝିକେ ଡାକିତେଛେ ଇହାରା ?

—ଅ ସାମ୍ପାନେର ମାଝି-ଇ-ଇ-ଇ...

ଅହିର ଯିଯାର ସଙ୍ଗୀ ଚିଂକାର କରିଯା ଜ୍ବାବ ଦିଲ : କି କନ ?

ଲକ୍ଷେର ଡେକେର ଉପର ହୁ-ଡିମଜନ କମେଟ୍ସବଲ । ଏକଜନ ଅଫିସାର । ପରମେ
ହାଫ-ପ୍ରୋଟ୍, ହାଫ-ଶାର୍ଟ, ଅସବେଲ୍ଟ, ରିଭଲଭାର ବୁଲିତେଛେ ନିତସଦେଶେ । ତୌଙ୍କ
ବିଦ୍ୟୁତେର ଆଲୋଯ ପ୍ଲାଟ ପ୍ରତ୍ୟୋକ୍ତି ଆରୋହି ।

କମେଟ୍ସବଲ ଚିଂକାର କରିଯା ସାଇତେ ଲାଗିଲ : ଅ ସାମ୍ପାନେର ମାଝି ।

କରିଯା ପ୍ରାଣପଦେ ଜ୍ଵାବ ଦେଓଯାର ଚଢା କରିଲ ଏତିଟି ବାବ । କାହାର ଉପର
ଏହି ଆହୁମାନ-ବାଣ ସର୍ବିତ ହଇତେଛିଲ, ଜାନା ଗେଲ ନା । କମେଟ୍ସବଲ ଡାକିଯା ଚଲିଲ ।

সমস্ত গাঁড়ের মাঝি ও ভাঙাদের অনাগত শিক্ষ-মাঝিদের যেন আজ কনেস্টবলের
প্রয়োজন ।

কি প্রাণপণ চিংকার !

অহিন্দি মিয়া জবাব দিতে থাইতেছিল, করিম বাঁরণ করিল ।

—বইয়ো । হালাগো গলার কি গিরামোফোনের কল আছে ?

—আই জবাব ছি ।

—মা, মি-ঝাবা'ই । ডৱ কিজাই ? বে-আইনী কিছু করিয়ারে ত, ডৱ ।

অহিন্দি মিয়া মাস্তলের খুটি ধরিয়া দাঢ়াইয়া পড়িল । শক্তি সে । ভয়ের
আত্মা আরো বাড়িয়া গেল । হঠাৎ লক্ষের আলো নিমেষে নির্বাপিত হইল ।
ঘড়সড় শব্দ, লক্ষের পাখনা ঝোত কাটিতেছে । নদীর উপর কাঞ্জল তমসার
আগিনির ঘনত্ব ঠেকে এখন ।

—বাতি বুজাইল, এঝো ।

—হ ।

—হালার ঘতলব আছে ।

বোধ হয় আজীবতা পাতাইতে সাম্পানের নিকটে আসিয়া লক্ষের আলো
অলিয়া উঠিল । সাম্পান হইতে মাত্র কয়েক হাত দূরে ।

ডেকের উপর হইতে কনেস্টবল জিজাসা করিল : অই, এত ডাকি, কানে
ঝ্যাঙ্গা মাই ? রাও মাই মুখে ?

অহিন্দি মিয়া জবাব দিল : দিছি ত' জবাব ।

—জবাব দিয়েছ ? আশাদের কানে ঝ্যাঙ্গা মাই ?

—বুট কই মা, ছজুর ।

—মজ্জিক আয় । লঞ্চ হইতে জবাব আসিল ।

আবার নোঙ্গের তোলার হাঙ্গামা, ইতস্তত করিতেছিল অহিন্দি মিয়া ।

—ছজুর, লঞ্চ ইন্দি লইয়াসেন । পানিয় জুর বেশি ।

কনেস্টবল-অফিসার সকলে গেটের মুখে দাঢ়াইয়া । প্রত্যেকের হাতে টর্চ ।

—নোঙ্গের বাড়িয়ে দে ।

মন্দ ঘৃঙ্খল ময় । অহিন্দি মিয়া নোঙ্গের শিকল বাঢ়াইয়া সাম্পান লক্ষে
আঝে তিঢ়াইল । একদম কনেস্টবল লাফাইয়া পড়িল সাম্পানের উপর ।

অন্ত একজন কনেস্টবল বলিল : এত ডাক্লাম—বাতি জালাসনে কেন ?
আৰু লক্ষের উপর ।

অহিন্দি মিয়া লক্ষের উপর উঠিয়া গেল ।

ছুই হাত বোঢ় করিয়া দীড়াইল সে অফিসাবের সঙ্গে।

—এই মাঝি, সাম্পানে আলো নেই কেন?

—হজুব কেরোসিন নাই। গ'রৎ সব আঁকাব।

—যিথে কথা।

—আজাব কিমা হজুব।

—ফের মুখে আজাব নাম, বে-তমীজ।

সিগারেট টানিতেছিল প্যান্ট-বুট ধারী। জিজ্ঞাসা করিল, নামাজ পড়ো?

—আই?

—ইয়া তুমি, তুমি।

—পাঞ্জগানা নামাজ ক'জা ন কইবি, হজুব।

বুটধারী হাসিল, পাঞ্জগানা নামাজ। যা হয় হোক, সাম্পানে আপিম বেথেছ?

—না, হজুব। আৱা বাঁশ বইয়ি।

ধমক দিল প্রশ্নকর্তা: সাম্পানে আপিম আছে?

শক্তি বিস্তুল জহিৰ মিয়া। প্রশ্নকর্তার অবস্থাবের দিকে দৃষ্টিপাত কৰিল।

বয়ম চৰ্বিদাব শৰীৰ। এত ক্লৰ্ক কষ্টস্বৰ।

—কথা বলিসৃ না। সাম্পানে আপিম আছে?

—না, হজুব।

—লঞ্চ দেখে নদীতে ফেলে দিয়েছ, না?

—বিখাস না লয়, শাইখেন সৱেজমিন।

সাম্পানের ভিতৱ কনেস্টবল ছিল। তাৱ উক্ষেত্রে চিংকাৰ কৰিয়া সে বলিল,
কনেস্টবল, টিক-সে দেখো।

জবাব আসিল, জী আচ্ছা।

তোমাৰ লাইসেন্স আছে?

—শাইসিন? জী।

লুকীৰ থোট হইতে একটি চিৰকুট বাহিৰ কৰিল জহিৰ মিয়া। ইহাৰ ভিতৱ
কোন জ্বালাচুৰি নাই।

সাম্পান হইতে কনেস্টবল ইাকিল: না কিছু নেই।

বুটধারী সিগারেট মুখ হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ধমক দিল। কনেস্টবল,
সাম্পানেৰ তক্ষা ওঁকে শুঁখ আপিমেৰ গৰু আছে কি না। তাৰ সহিল না তাৰ।
বিজে আৰো দুইজন কনেস্টবল সহ সাম্পানেৰ উপৰ উঠিয়া পড়িল। একজৰ
কনেস্টবলেৰ জিম্মাৰ বহিল জহিৰ মিয়া লঞ্চে।

কমেন্টবলগণ উপুড় হইয়া সাম্পাদনের তত্ত্ব উকিতে লাগিল। পুলিশের জরো
আফিম ফেলিয়া দিলেও গুরু সহজে ধাইবে না।

স্টেগ্যাও ইয়ার্ডে নাকি একবকম ভ্রাণ্ড তৌক কুহুর ব্যবহার করা হয়। এখানে
কোন কুহুর ছিল না।

একটি কমেন্টবল হঠাৎ সামনে চিংকার করিয়া উঠিল, আর।

আর সাম্পাদনের বাহিরে ছিলেন। কমেন্টবলেরা ছাউনীর ভিতর চুকিয়াছে।
পুঁটলি-হাতে একজন বাহির হইয়া আসিল।

—আর, এয় ভেতর আপিমের গুরু।

—চলো, লঞ্চে খোলা থাক।

কিন্তু তার দৈর্ঘ্য অত বন নয়। কমেন্টবলটি পুঁটলি পুলিশে খুলিতে অগ্রসর
হইতে লাগিল।

জহির মিয়া বোকার মত এই দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ সে হাঁহা করিয়া
উঠিল: আন্তে খোলেন সাব।

—আন্তে!

বুটধারী খুব জোরে এক ধামড় দিল তার গালে। সংবৃতি আগিয়া
উঠিয়াছে। আরো কয়েকজন অংশগ্রহণ করিল।

—শালা ঝুট, বাঁধ করতা থায়।

কান ধরিয়া দুই ঠোকর দিল জহির মিয়ার নিতুষ্টে।

কিন্তু নিরন্তর হইবার বান্দা নয় জহির মিয়া। তার চোখ নিম্নের শরীরের
দিকে নয়।

—আন্তে খোলেন, সাব। উরার ভিতর আর ফুঁঘার কিতাব।

—কিতাব আছে, আর আফিম আছে?

এইবার ব্যঙ্গ-ধর্মকান্দি ও লাধি ধাইল সে। মোটা বুটের লাধি।

—মারেন আশ্রে। পানির মন্দি কিতাব না পড়ে, ছজুর।

করিমকেও ধরিয়া আনা হইল লঞ্চে।

—আই আপিম ধাই, ছজুর। পেটের অঙ্গ আপিম ধাইয়ারে।

ঝোরে চিংকার করিয়া কহিয়া উঠিল জহির মিয়া। চিংকার-বেষ্টি অসহায়
প্রতিবাদ।

পুঁটলি খোলা হইল। জহির মিয়া এইবার মিথ্যা বলে নাই। খাসগাতার
মোড়কে দু-আনা ওজনের আফিম। বছবার পেটের অঙ্গে পড়িয়াছে।
ভাস্তুর কিছু করিতে পারে নাই। এখন আফিম ধাইয়া সে ভাল থাকে।

বাংলা দেশে পাড়াগাঁওয়ে আফিম ত আফিম নয়। ধৰ্মস্থরী। রোগে, শোকে ও
দৃঢ়ে।

—বুটা তবে যে বল্লি—কনেস্টবল, আমাৰ মাফ্লাইটা দে, বড়োগু—
আপিম নেই সাম্পানে।

—চোৱাই আপিম কঙে, সা'ব।

চোৱাই আফিম কোথায়। জহিৰ কাপিতেছিল। হঠাতে চড়া কথা বলিয়া
ফেলিয়াছে সে।

মাফ্লাই পৱা শেষ হইল।

—সব বুটা। চল ধানায়।

—হঞ্জুৱ !

একটা কনেস্টবল কৱিমকে ইঞ্জিন-কমেৰ এক দিকে লইয়া গেল। আবছা
অঙ্ককাৰ জায়গাটা। বীচে শ্ৰোত তৰতৰ বহিয়া যাইত্বেছে।

—বন্দোবস্ত কৰো, মিয়া। হাঁজাৰ হাঁজাৰ। ধানায় ধাও। এক দিবেক
কঞ্জি কামাই। বাষে ছুঁলে—

—বেকহুবু।

—আৱে তোৱ কস্তুৰের নিকুঁচি—। আমি বলব সাব-কে বুবিয়ে—এইবাব
ছেড়ে দিব।

নদীৰ কিনারা হইতে ভাক ভাসিয়া আসিতেছিলঃ অ সাম্পানেৰ মাঝি-
ই...অ সাম্পানেৰ মাঝি, কিনারাউ।

মজিদেৱ কঠিষ্ঠৰ। কে জ্বাৰ দিবে এখন।

—অ সাম্পানেৰ মাঝি কিনারা ধাড়াউ-উ-উ...

কঠিষ্ঠৰ ধামিয়া গেল। জ্বাৰ দেওয়াৰ উপায় মাই। উৎকৰ্ণ কৱিম। ভাকে
কথাবাৰ্তা চালাইতে হইত্বেছে।

—অ জহিৰ বা'ই সাম্পান কিনারা লাগাইও।

কনেস্টবল আবাৰ জহিৰকে ইঞ্জিন কমেৰ দিকে লইয়া গেল।

পৌছানো মাত্ৰ কৱিম বলিলঃ আছে গাঠং পা'শ টিঁয়া।

—হ।

সাম্পান ঠেলিয়া দিয়া পাটাতনেৰ উপৰ বসিয়া পড়িল জহিৰ মিয়া। মাথা
ঘূৰিত্বে তাৰ। হঠাতে মুঞ্চোখিতেৰ মত সে বলিলঃ ও বা'ই। আঘৰ
পুঁটলি, আঘৰ পুঁটলি।

হাতড়াইতে লাগিল সে। উৱ তেতৱ আঘৰ মূঘাৰ কিতাব।

অহির মিয়া চাহিয়া দেখিল, লক্ষ চলিয়া যাইত্তেছে। বদীর দ'পাশে
অক্ষকারের পরিধা।

—আজুর পুঁটলি?

—তোঁৱুৰ হাখৎ মিয়া-বা'ই।

অন্তসময় হইলে কয়িম হাসিয়া কুট-কুট হইয়া যাইত। এমন অন্তমন্তু,
উদ্ভ্রান্ত মাঝুষ। চুপ কয়িয়া রহিল সে।

হইজন কিছুক্ষণ তত বসিয়া রহিল। কি যেন ঘটিয়া গিয়াছে। এখনও
স্পষ্ট উপলক্ষ্য বাহিরে।

—অ সাম্পানেৰ মাখি কিমাৰও। আই মজিদ। অ...

ভাষ্য মিয়া মোড়ৰ খুলিয়া দিল।

(পৰদিন সকালে গ্রামে চুকিৱা অহির মিয়াৰ কোথে পড়িল বড়েৰ আক্রোশ-
শূন্ত কণ। গাছ-গাছালিৰ ভাঙা ভালে সড়ক বোৰাই। উঠানেৰ মুখে ভাঙা
মুণ্ড লইয়া স্বপারি গাছটা দুলিত্তেছে। স্বৰ্ধ উঠিলাছিল। চিকচিকে রোঝ
ছড়ানো দাওয়াৰ উপৱ) এক পাশে বসিয়া সুন্দৰিদেৱ। সমুখে কেতাবেৰ
দ্বন্দ্ব খোলা।

হাই তুলিয়া চোখ ফিরাইতে সে মানসে চিংকার কয়িয়া উঠিল, বা-জান।
সমীৰ নিবেৰ জাহাঙ্গী ছাড়ে নাই। সে জানে, পড়া ছাড়িয়া বাবাৰ খাতিৰদাৰি
কয়িতে গেলে বকুনি থাইতে হয়।

—আৰা আজুৰ জাই—

কি যেন জিজামা কয়িতে গেল সমীৰ। ততক্ষণ অহির মিয়া ঘৰেৰ ক্ষিতিৰ
চুকিৱাছে। বাহিৰ হইয়া আসিল সে তখনই।

—তোঁৱুৰ মা কণে গেইৱে।

—বা-জান কৰ্জেৰ জাই।

কুলহুম সকালেই কৰ্জেৰ অন্ত বাহিৰ হইয়াছে।

অহিৰ মিয়া আবাৰ ঘৰে চুকিল। তক্ষণ পাইয়াছে তাৰ।

কলসে জল ছিল না। বাহিৰে আসিল তৎক্ষণাৎ।

—আৰা আজুৰ জাই কিতাব—

—হাৰামজাহা, কিতাব! উড়ম পাৰস না?

—আই পড়ি, আৰা।

—গড়স। পইড়া। হৈব কি। উড় হাৰামজাহা। ভাঁক তোৱাৰ মাৰে।
আই পড়ি। পৈড়া হৈব কি।

ভীত সমীর বসিয়া রহিল। পিতার এমন মৃত্তি সে কোনদিন দেখে নাই।

—আই পড়ি! উড়।

বিভাস্ত সমীর।

জহির যিয়া বলিয়া যায় : পইড়্যা হৈব কি ? ইলেম—ইলেমের মার—হ্ট-বুট পাছার, ফির গ'স চার। ইলেমে দুরক্তির নাই। উড়। পড়নের কাম নাই।

সমীর কিছুই উপলক্ষ্মি করিতে পারিতেছিল না। তায়ে কাঠ-পুস্তলী বনিয়া গিয়াছে সে।

—উড়। জল্দি।

সমীর এইবাব দাঢ়াইল। সকোচ-আড়ষ্ট।

—হালার পুত্র কাউরে ডাইকতে পারস না। পইড়্যা হৈব কি। পড়স তুই, খাড়া র—

জহির যিয়া তখনই পুর্টলি খুলিয়া নৃত্য পুস্তক ফড়-ফড় শব্দে ছিঁড়িতে লাগিল। মুখের কামাই নাই : ইলেম—এই ইলেমে হৈব কী।

হঠাৎ তার চোখে পড়িল সমীরের দখরের উপর। কয়েকটি বই খোলা পড়িয়াছিল। তুলিয়া নইল সে হৈ মারিয়া এবং শকুন যেমন মৃতপন্থৰ অঙ্গ ছিম্বিল করে, বইয়ের পাতাগুলি তেমনই নির্দিয়তাবে ছিঁড়িতে লাগিল।

মুখে তুপড়ি ছুটিতেছে তার : হালার ইলেম। হ্ট-বুট আৱ গ'স। তাৱপৰ একটি অকথ্য গালি দিয়া বলিল, স্বট পাছাণ, গ'স মুখে, এই ইলেমে হৈব কি। বেদম্বার জাত। (সমীরের দিকে ফিরিয়া) তোয়াৱ মারে ভাক্। উড়—হারামীৰ ছাউ—উড়।

বক্ষিস

আবু রশ্মি

এমন মুনিব পাঁওয়া বস্তুতই ভাগ্যের কথা। প্রায় সাত বছর ধরে শফি চাকরের কাজ করেছে। এ সময়ের মধ্যে ছয় সাত জায়গায় সে কাজ করেছে, মুনিবও দেখেছে নামা ব্রকমের, কিন্তু এমন মুনিব তার ভাগ্যে আর কথমও জুটে নাই। মাইনে আট টাকা। বক্ষিসও পাঁওয়া থায় যথন তথন। সময় সমস্ত পূরনো পাঞ্জাবী ধুতি ও পাঁওয়া থায়। সব মিলে শক্তি মিএণ্ড বলতে গেলে রাজাৰ স্থখে আছে।

মুনিবের নাম মকবুল আহমদ। এখনও বিবাহ করে নাই, মাইনে খ' দুই টাকা পায়। দু'হাতে টাকা খরচ করে। কলকাতায় টাকা খরচ করে স্থখ আছে। শফি এটা লক্ষ্য করেছে, মুনিবৰা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাদের দিলটা থাকে বেশ দৱাজ। বিবাহ হলেই প্রধানত স্বীদের উষ্ণমিতে তারা কেমন যেন বদলে থায়, তখন একটা আধলাৰ এদিক ওদিক হ্বার যো থাকে না। মকবুলেরও শোনা থাক্ষে শীঘ্ৰই বিবাহ হবে। তখন শফিকে বাধ্য হয়েই অন্য ঘৰ দেখতে হবে।

যার সঙ্গে মকবুলের বিয়ে হ্বার কথা হক্কে তাকে সে আগে খেকেই চেনে। মকবুলের মা বাবা অবশ্য এ বিবাহে তেমন রাজী নথ—তাদের ইচ্ছা ছিলো কোন এক ধৰীকন্ঠাৰ সঙ্গে ছেলেৰ বিয়ে দিতে। তবে ছেলে একেবাৰে বেঁকে বসাতে তাদের সে ইচ্ছা আৰ কাবে পৰিণত হতে পাৰলো না। ছেলেৰ মনেৰ ইচ্ছাকে অত সহজে উপেক্ষা কৰা থায় না, বিশেষ কৰে যখন তাৰ মূল্য অগদ দু'শ টাকা দীড়াৰ। তাই মকবুল থাকে চান্দ তাৰই সঙ্গে তাৰ বিয়ে হওয়া আৰ ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

বাবুদেৱ এই একটা বিলাস—পছন্দ কৰে বিয়ে কৰা। বাবুদেৱ ভাসাই একে বলে প্ৰেম। যে মেয়েৰ সঙ্গে প্ৰেম না হোল তাকে বিয়ে কৰা বাবুয়া এক গৰ্হিত পাপ মনে কৰেন। কথাটা ভেবে হাসিতে ঠোট বেঁকে থায় শফিৰ। তাহলে বলতে হয় ফুলজানকে শফি ভালোবাসে। থাস্য আছে ফুলজানেৱ, তাৰ মুখেৰ

শ্রী অনেক ভদ্রবরের বউকে সজ্জা দেবে। লাঙ্গে এবং চট্টগ্রাম, দেহ-সোঁষ্ঠি
এবং প্রাণশক্তিতে ফুসজান কাঁকুর থেকে কম ধাই না। আর একটু ভালো থবে
ফ্রান্সে ও কিছুটা লেখাপড়া শিখলে ফুসজানকেই হয়ত মকবুল পছন্দ করে
ফেলতো। তখন ফুসজানের কল্পণার অন্তর্ভুক্ত শফিকে এখানকার চাকরিটা ছাড়তে
হতো। এ সম্ভাবনা মনে হওয়াতে শফি গাল ফুলিয়ে প্রকাণ হাসি হাসে।

‘এখন অবশ্য শফিক কোন ভাবনা নেই। যা ইচ্ছে খুশি তাই করে, মকবুল
কিছুই বলে না। মকবুলের ‘গড়রেজ’ (নং ১) সাবান দিয়ে মৃৎ ধোষ, অবাকুশ্ম
মাধায় দেয়, হেজ্জীন স্নো মৃৎ। মাথে, ১৯১৩ং ‘স্টেট এক্সপ্রেস’ টিম থেকে যথন
থে কটা ইচ্ছে সিগ্রেট তুলে নেয়।

হয়ত কোন দিন মকবুল বলে : টিনে সিগ্রেট একটু কম মনে হচ্ছে শফি।

শফি মধুর হেমে বলে : সিগ্রেট আর কে নেবে, আমরা গৱীব লোক বাবু,
বিড়ি কুঁকি।

লজ্জিত হয়ে মকবুল তাড়াতাড়ি বলে : না, আমি কি আর তাই বগছিলাম
বে।

শফি সহশৃঙ্খ মনে নিজের কাঁজে চলে যাই।

চা থেরে মকবুল কাগজ পড়ছে। এমন সময় বাজারের টাকার অন্ত শফি
এসে হাজিব। টাকা চাইবার আগে অস্ত্রজ থবে বলে, বাবু, যুক্তের ধ্বনি কি ?

মকবুল ধতই ভালো ছেলে হোক, যুক্ত নিয়ে সে শফির সঙ্গে আলোচনা করতে
প্রস্তুত নয়। একটু বিরক্তির থবে বলে : ধ্বনি আর কি, এই জার্মানরা
জিতছে।

হাওয়া কোন দিকে বইছে তা শফি টের পায়। তাই যুক্তের প্রস্তুত আর না
তুলে সোজা কাঁজের কথাটি শেড়ে বলে : বাজারের টাকা বাবু।

চেয়ার থেকে উঠে নিজের কামরার পিয়ে আলমারী খুলে একটা টাক। বের
করে মকবুল শফিক হাতে দেয়। শফি জিজ্ঞেস করে : বাজার থেকে কি
আনবো, বাবু ?

— ধা বোজ আনিম তাই। বিলিপ্প থবে মকবুল বলে।

— আজকাল বাজারে টোমাটো উঠেছে, আনবো ?

— কি দিয়ে বাঁধবি টোমাটো—আলগা আগ্রহের থবে মকবুল জিজ্ঞেস
করে।

— কেন মাংস দিয়ে। শফি চট করে অবাব দেয়।

— তা আবশ্যে বাবু। মকবুল আবাব ধ্বনের কাগজটা হাতে তুলে নেয়।

ବୁଢ଼ି ନିଯମ ବାଜାରେ ସାଥ ଥକି । ତାର ଡାରି ମାରା ହୟ ମକ୍ବୁଲେର ପ୍ରତି ।
ଆହା ବେଚାରୀ ଏ ବ୍ରକ୍ଷ ଲୋକ । ଧିରେ ନା କରିଲେ ସକଳେ ତାକେ ଏକେବାରେ ଚୂରେ ଥାଏ ।
ଅକ୍ବୁଲେର ମୁଖ ଦେଖିଲେଇ କେମନ ବେଳ ଏକଟା ମାରା ପଡ଼େ ଥାଏ । ମାରାର ଆଧିକ୍ୟ
ଶଫିର ଘନ ବାଜାର-ଥରଚା ଥିଲେ ଆଜକେ ଦୁ'ଆନାର ବେଶି ଲାଭ କରିଲେ ବାଜି ହୟ
ନା । ବିବେକ ବଲେଓଡ଼' ମାହୁରେର ଏକଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଛେ ।

ମକ୍ବୁଲ ଅଫିସେ ସାଂଗ୍ସାର ପର ଏକଟୁ ବିଶେଷ ସାଜ କ'ରେ ଶଫି ସନ୍ଦୋର ବନ୍ଦ କରେ
ଫୁଲଜାନେର ଓଥାମେ ଥାଏ । ଫୁଲଜାନ ତଥନ କାଙ୍ଗଟାଙ୍କ ସେଇ ନିଜେର ଟିନେର କାମଗାର
ଏମେ ବମେଛେ । ଶଫିକେ ଦେଖେ ଏକ ଗାଲ ହେଲେ ବଲେ : ତୋକେ ସେ ଆଜକେ ଦେଖିଲେ
ଆଜପୂଜ୍ୟ ହେଲେ । କାକେ ସର ଥେକେ ବେର କରିଲେ ଆଜକେ ବେଶିରେଛିଲ ତୁହି ?

—ତୋରେ । ଶଫି ବଲେ ।

—ବେଶି ଢକ କୁରିଲେ । ତୋର ଜଣ ଆମି ଥର ଥେକେ ବେଙ୍ଗବୋ ଏମନ ମୁନ୍ଦୋଦ
ତୋର ନେଇ ।

—କେବ, ଚେହାରାଟା ଆମାର ଥାରାପ ହୋଲ ଆକି ? ଶଫିର ଗଲାର ପ୍ରମଟା ଏକଟୁ
ଚଢ଼େ ଥାଏ ।

ଫୁଲଜାନ ମିଟିମିଟି ହାମେ ।

ଭାଙ୍ଗ ଥାଟେର ଏକ କୋଣେ ବସିଲେ ଗିଯେ ଫୁଲଜାନେର ସଙ୍ଗେ ଠୋକାଠୁକି ହେଲେ ଥାଏ
ଆର କି ।

—ଏହି ଦୁଗ୍ଧର ବେଳା ତୋକେ ଫଟି କରିଲେ କେ ବଲେଛେ । ଫୁଲଜାନ ଡେତୋ କଥା
ବଲେ ।

—ନେ ଆମାର କାହେ ଆର ସତୀଗିରି ଫଳାସ ନେ । ବୀରବ-ବ୍ୟାଙ୍କ ଥରେ ଶଫି ବଲେ ।

—ଅମନ କଥା ସବି ଆବାର ବଲିଲ ତୋ ତୋରେ ଝାଟା ଯେବେ ବେର କରେ ଦିବ ।
ଫୁଲଜାନ ଦେଗେ ଗେଛେ । ଫୁଲଜାନେର ରାଗକେ ଶଫି ବୌତିମତ ଭର କରେ ଚଲେ ।
ଫୁଲଜାନେର ରାଗ ସେ କି ଜିଲ୍ଲା ତା ଏବଂ ଆପେ ଦୁ'ଏକବାର ଲେ ଟେର ପେଯେଛେ । ତାଇ
ଫୁଲଜାନକେ ଖୁଣି କରିବାର ଜଣ ବଲେ : ଆସି ଏଲାମ କାଞ୍ଚ ଛେଡ଼େ ତୋର ସଙ୍ଗେ ଏକଟୁ
ଶମ୍ଭବ କରିବୋ ବଲେ, ଆର ତୁହି ଅମନି ଚଟେ ଗେଲି ।

—ତା ଚଟିବାର କଥା ବଲିଲେ ଚଟିବୋ ନା ? ଫୁଲଜାନ ଅମେକଟା ନେହି ହୁଏ ଥିଲେ ।

—ଚଟିଲେ କିମ୍ବ ମାଇରି ବଲଛି ଭାଇ, ତୋକେ ଭାଗୀ ହୃଦୟ ଦେଖାଯା । ଫୁଲଜାନକେ
ଖୁଣି କରିଲେ ଶଫି ବନ୍ଦପରିକର । ମନେ ଯନେ ଖୁଣି ହଲେଓ ବାଇରେ ପୋଯନ୍ତା ଭାବଟା
ବଜାଯ ରେଖେ ଫୁଲଜାନ ବଲେ : ମଜ ଦେଖେ ବୀଚିଲେ । କିଛକଣ ଚପଚାପ ।

ନିଶ୍ଚରତା ଭାବେ ଫୁଲଜାନିହି : ଆମାର ତ ତୁହି ବିଯେ କରବି ଟିକ, ଯିନିଲେ ଆମାକେ
ଶାଶ୍ଵାକ ଦିଲେ ବାଜି ହେଲେଛେ ।

—এখন বিয়ে করবো তোরে কি করে, টাকা পয়সা একটু জয়াতে হে ?
শফি ভাসা ভাসা কথা বলে ।

—টাকা জয়ালে ত বিয়ে করবি ঠিক, খোদার কসম দ্বা । ফুলজানের ঘকে
অহুময় ।

—তা করবো রে বিবি সাহেব, করবো ।

শফির প্রতিশ্রূতিতে ফুলজানের মুখ আনন্দেজ্জল হয়ে উঠে ।

শফি ফিরবার উপকৰ্ম করছিলো, ফুলজান বলে : ওঃ ভুলেই গিছলাম,--
একটা কথা আছে তোর লগে ।

—কি কথা রে ? শফি জিজ্ঞেস করে ।

—আমার পরাণ দিনের মধ্যে একটা টাকা জোগাড় করে দিতে লাগবো,
ভাবী ঠেঙাতে পড়েছি ।

—এখন এই মাসের শেষে আমি টাকা পাব কই ? অপ্রস্তুত স্বরে শফি
কথাঙ্গোলা বলে ।

—তাৰ আমি কি জানি, কিন্তু টাকা আমার চাই-ই ।

—এই ত আৱ একটা মুঝিল ফেললি তুই । শফি বিব্রত বোধ করে ।

—যে মৰদ একটা টাকা জোগাড় কৰতে পারে না তাৰ আবার পীরিত কৰা
কেন ? আবার রেগে যায় ফুলজান ।

এবার বুক ফুলিয়ে ঢঢ়া স্বরে শফি বলে : কে তোৱে বলেছে আমি টাকা
জোগাড় কৰতে পারবো না, মৰদের বাকা না আমি ।

—সানাম মৰদ, এই ত চাই । কোতুকে হঠাৎ উঠলে উঠে ফুলজান ।

—আমায় তুই কি ভোবেছিস ; এ যিএগ ইচ্ছা কৰলে কি-না কৰতে পাবে ?
মওয়াবী চালে শফি বলে । ফুলজান কিছুক্ষণ মৌরব ধাকে, তাৰপৰ অস্তুত আহ্বান
বলে : যদি পৰাণ দিন বিকেলের মধ্যে আমার এনে দিস তবে বুবো তুই
আমার সত্তাই মিৰাহ, কৰবি, আৱ বদি টাকা না আবতে পাৰিস তবে তুইও
আমার এখানে আৱ আসিস নি ।

—একটা কেব পৰাণ দিন তোৱে ছ'টো টাকা বিয়ে থাব দেখিস—অস্তুত
মুহূৰ্তে শফি প্রতিজ্ঞাই কৰে বলে ।

ফুলজান উৎকুল হয়ে বলে : সাধে কি তোৱে হেথে আমি মজেছিলাম ।

আমিৰী কাহাদায় পা ফেলে শফি ফুলজানের কামৰা ধেকে বেঁজিৰে আসে ।

মাঝার ফিরে কিন্তু শফিকে টাকা জোগাড় কৰবার ভাবনা পেঁজে বলে ।
মাঝখানে আৱ মাজ একটি দিন । এৱ মধ্যে কোথেকে সে গোটা একটা টাকা,

জোগাড় করবে ? মাসের একদম শেষের দিকে তাকে ধার দিতেই যাবে না কে । বে একটা বন্ধু আপনে বিপন্নে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো, তার সঙ্গে খফির ফুলজানকে নিয়ে চির-বিছেন হয়ে গেছে । জামী লোকেরা কথাটা ঠিকই বলেছেন, মেরেমাহুবলাই যত নষ্টের গোড়া । ফুলজানের সঙ্গে আলাপ না হলে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়াও হোত না, এবং বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া না হলে একটা টাকা ধারণ সে পেতো । অবশ্য ভাবনার তীব্রতায় এ কথাটা খফি শ্রেফ ভুলে যায় নে, ফুলজানের সঙ্গে আলাপ না হলে তাকে একটা টাকার জন্য এত ভাবতেও হোত না ।

আসল কথা হোম কি করে টাকাটা জোগাড় করা যায় । বাবুর অজাণে তার ড্রয়ার থেকে একটা টাকা নেবে নাকি ? না, তা হয় না । অমন করে চুরি করা কিছুতেই ঠিক হবে না । আর বাবু লোকটা ভাবী ভালো । এমন ভাবে তার ক্ষতি করতে ধাকলে ফলটা খাবাপ না হয়ে যায় না । অতটা অন্তায় খোদা সহিবেন না । বাজারের টাকা থেকে রোঁজ আনা তিনেক করে মাথলেও এক টাকা সঞ্চয় করতে প্রায় ছয়দিন লেগে যায় । আর এদিকে ফুলজান গো ধরে বসেছে, পরশ দিন টাকা না পেলে তার চলবেই না । অসম্ভব রকম জেদী মেঝে ফুলজান । যখন যা মনে হয় তাই করবে, অন্ত কালো কথাতে কান দেবে না । ফুলজানের প্রতি তার নিজেরও কেমন একটা দুর্বলতা হয়ে গেছে । একটা টাকা কেন, একশো টাকা দিলেও ফুলজানের ঠিক দায় হোওয়া হয় না ।

টাকার চিঞ্চায় খফির কাজেও দু'একটা ভুল হয়ে যায় । মকবুল বলে : তোর আজকে হয়েছে কি রে, খফি ? কাজে একদম যন নেই ?

—না, কি আর হবে বাবু ।

—কিছু যদি না হয়ে থাকে তবে পানি আনতে বললে ধালি প্লাস আনিস কেন ? মকবুল আনতে চায় । খফি ধালি বোকার মত হাসে ।

মকবুল আবার বলে : এইচুকু ত তোর কাজ, তাতেও চিলা দিতে লেপেছিস ।

লজ্জিত বদনে খফি তার মনিবের দিকে চেয়ে থাকে ।

মকবুল বলে : যা, আর বোকার মত অমন করে দাঙিয়ে ধাকিস না, এক প্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয় । খফি তাড়াতাড়ি চলে যায় ।

একদিন পরে । আজকে বিকালের মধ্যেই ফুলজানকে টাকা দিয়ে আসতে হবে—এই চিঞ্চা নিয়েই খফির তোরে ঘূর তাড়ে । বির্বৎ মনে উনোন ধরার । ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে চিঞ্চা করে কি করে টাকাটা জোগাড় করা যায় । বাবুর কাছ থেকে চাইবে নাকি ? মাসের শেষে বাবু বোধ হয়

ଟୋକା ହିତେ ପାରବେ ନା । ଏ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଲ୍ୟାଟାଙ୍ଗ ପଡ଼ା ଗେଲେ, ସାହୋକ ! ତା ଦେବାର ସମୟ ବାସୁ ମୁଖେ ହିକେ ଚେଯେ ଦେଖେ, ମକ୍ବୁଳର ମୁଖେ ବେଶ ହାସିଥିଲି ତାବ । ବାସୁର ମେଜାଙ୍କ ଭାଲାଇ ଆଛେ । ଖୋଲା ସତିଇ ମେହେରବାନ ।

ମକ୍ବୁଳ ବଲେ : ଏକଟା କାଜ କରନ୍ତେ ପାରବି ରେ, ଶଫି ?

—କି କାଜ ବାସୁ ? ଶଫି ଆଗ୍ରହେର ସଙ୍ଗେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ ।

—ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିବିସାହେବକେ ଚିନିମ ତ ?

—ତା ଆଉ ଚିନି ନା ବାସୁ । ସେଇ ସେ ତୀର କାହିଁ ଥେକେ ଏକଟା ଚିଠି ଏଣେ ହିସେଚିଲାମ ଆପନାକେ । ବିବିସାହେବ ଲୋକ ଖୁବ ଭାଲ ବାସୁ, ଆମାକେ ପ୍ରାୟଇ ବକଣିଶ୍ବ ଦେନ ।

ମକ୍ବୁଳ ହେଲେ : ସେଇ ବିବିସାହେବ କାହେଇ ତୋକେ ଏକଟା ଚିଠି ହିସେ ଆସନ୍ତେ ହେବେ, ପାରବି ତ ?

—ଖୁବ ପାରବୋ । ଶଫି ମକ୍ବୁଳକେ ଆଶ୍ରାମ ଦେଇ ।

—ସହି ଚିଠିଟା ଠିକ କରେ ପୌଛେ ଦିତେ ପାରିମ ତ ତୋକେ ବକଣିଶ୍ବ ଦେବୋ । କିନ୍ତୁ ଦେଖିମ ଆଉ ସେନ କେଉଁ ଟେବ ନା ପାଇଁ ।

—ତା ଆପନି କିଛୁଟି ଭେବେନ ନା ବାସୁ, ଆସି କି ଆଉ ଅତ୍ତି ଝାଚା ଲୋକ । ବଲେ ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଶଫି ରାଗ୍ରାଘରେ ଦିକେ ଥାଇଲୋ ।

ତାକେ ଦେତେ ମକ୍ବୁଳ ବଲେ : କୋଥାର ସାଙ୍ଗିଲ ରେ ଶଫି ?

—ଥାଇ ବାସୁ, ରାଗ୍ରା ଚଢାତେ, ଦଶଟାଯ ଆବାର ଆପନାର ଅଫିସ ।

—ଆରେ ବସ ନା, ତୋର ଫୁସଜ୍ଜାନଦେର ଓଖାନେ ଆଜକାଳ ଆଉ ତୁଇ ସାମ ନା ?

—ଥାଇ ବାସୁ, ହାମିତେ ଶଫି ପ୍ରାୟ ଗଲେ ପଡ଼େ, ଆଉକେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦିକେ ତାର ଓଖାନେ ସେତେ ବଲେଛେ ।

—ତୋଦେର ନିକାହ ହେ କବେ ? ବେଶ ଆଗ୍ରହେର ଦ୍ୱାରେ ମକ୍ବୁଳ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ ।

—ଟୋକା କିଛୁ ଆପେ ଜମିଯେ ନି, ବାସୁ ।

ହଠାତ୍ ଶବ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେବେ ନିଜେର କାମରାର ଦିକେ ସେତେ ସେତେ ମକ୍ବୁଳ ବଲେ : ସା ଏବାର ରାଗ୍ରା କରଗେ ଥା, ଚିଠିଟା ଠିକ ଭାବଗ୍ରାହ ପୌଛିଥେ ଦିତେ ଫୁସ ହୟ ନା ସେନ ।

ମକ୍ବୁଳ ଅଫିସେ ଚଲେ ଗେଲେ ନିଜେର ଥାଓସା ଥାଓସା ସେବେ ଶଫି ବାସୁର କାମରା ଉଚ୍ଛାତେ ଆମେ ।

ଅଧିମେଇ ତାର ଚୋଥେ ପଡ଼େ ୧୯୧୯୯୯ ‘ସ୍ଟେଟ ଏରପ୍ଲେସ’-ଏର ଟିନଟା । ବାସୁ ତାଢାହଢାତେ ଦେଇବେ ବସ କରେ ରାଖିତେ ଭୁଲେ ଗେହେନ । ଲିଟା ଖୋଲା ପଡ଼େ ଆହେ । ବସ କରନ୍ତେ ପିଲେ ସିଗ୍ରେଟ୍-ଏର ଗଢ଼େ ଶଫିର ନାକ ଆମୋହିତ ଏବଂ ମନ ଅଲ୍ଲୁ ହୁଏ ତ୍ୟେ ଆଜକେବ ହିରଟା । କ୍ରିକ୍କେଟ୍ ଚାରି ନା କରାଇ ଭାଲୋ । ବାସୁ ବଲେ ଗେହେନ ବକଣିଶ୍ବ

দেবেন। বাবু লোক খুব ভাল। কয়েকটা সিগ্রেট শফি না চুরি করলাই বা। বাবুকে এমন ভাবে সর্বস্বাস্থ করা তার কিছুতেই উচিত হবে না। কলেজা আছে তার বাবুর, নইলে কথায় কথায় কেউ এমন বকশিস্ দেয়।

শফি সব কিছু গুছিয়ে একবার কামরাটার দিকে চেয়ে দেখে। মকবুলের ঝঁঢ়ি যে অনিদগ্ধীয় তা তার কামরা দেখলেই বোঝা যায়। একটা কামরা সাজাতে বা-কিছু দরকার তার প্রত্যেকটি মকবুল এমে জড়ো করেছে। তার বিছানাটা হং-ফেনিল শুভ। দেখলেই শরীরটা আচ্ছে মন্দির হয়ে আসে।

বিছানায় বেশ আরাম করে শফি গড়িয়ে পড়ে। তার শরীরটা এখন ভারী নরম মনে হচ্ছে। অকেই বলে আরাম। ফ্যানটা ছেড়ে দিলে কেমন হব। না ধাক্ক। অত বাবুগির আরাম ভালো না, এমনিই হাওয়া দিচ্ছে বেশ।

হঠাতে শফির মনে পড়ে: তার যদি এ বৃক্ষম স্বচ্ছতা থাকতো! খোদা বে কেন একটা লোককে ধনী এবং আর একটা লোককে গৱীব করেন তার ব্রহ্ম শফি শত চেষ্টা করেও তেমন করতে পারে না। শফি যদি কোন স্বচ্ছল সংসারে জন্মাত্তে, তবে সে হয়ত মকবুলের চেয়েও বেশি উন্নতি করতে পারতো। শফির আজ্ঞাবিশ্বাস দুর্বল। আচ্ছা, কলনা করা যাক, এখন সে-ই এ ঘরের মালিক। এ কামরাটা তার নিজের। শুই যে দক্ষিণ দিকের জানালা ঘেঁষে চোরটা তাতে, ধরা যাক, ফুলজান বসে আছে। আর শফি বিছানায় গা এলিয়ে অঙ্গ চিপ্পা করছে। ফুলজান হয়ত তার সন্তানের অন্ত ‘সোরেটার’ বুনছে। আড়চোধে কর্মরত স্ত্রীর দিকে শফি চেয়ে দেখছে এবং নিজের ভাগ্যকে মনে মনে প্রশংসা করছে। বস্তুত, একটু মাজাঘরা করলে ফুলজানকে দেগেমদের মতই দেখাবে। ছক্কোর ছাই, কেবল কলনা করে আর কল্পটা স্থখ পাওয়া যায়। বিরক্ত মনে শফি বিছানা থেকে উঠে বিছানাটা বেড়ে দেয়। সিগ্রেটের টিনটা দিকে আবার তার লুক দৃষ্টি পড়ে। ছ'তিন্টা সিগ্রেট বের করে নিলে মকবুলের কিই-বা আর ক্ষতি হবে। টেবিল পাবে না সে হয়ত। তিন খলে কয়েকটা সিগ্রেট শফি বের করতে থাবে এমন সময় বাইরে কার পদ্ধতি শনে ধড়ফড়িয়ে সে টিনটা ২৩ করে দেয়। বাবু কোনো কাজে হঠাতে ফিরে এলেন নাকি? বাইরে এসে শফি দেখে, মর এ যে ফুলজান!

—তুই আবার এখন এখানে মৰতে এলি কেন? শফির কষ্ট একটু কর্কশ।

—টাকা জোগাড় করেছিস? ফুলজান সোজা জিজেস করে বসে।

—বিকেলে টাকা পাবি, এখন তুই থা।

—থাবাই ত রে। এখানে আমি ঘর পাতবার লগে এসেছি নাকি— টাকাটা দে।

—বাবু অফিস থেকে ফিরলে টাকা দিবে, তখন তোরে দিয়ে আসবো শিল্পে।

—ঠিক দিস ঘেন, মইলে তোর সঙ্গে আমার কথা বক। বাবাৰ সময় ফুলজান
শাসিয়ে বাবু।

দুৰছাৰ কাছে এসে শফি বলে : এমন কৰে না বলে-কয়ে আৱ আসিস না.
বাবু যদি বাড়ি থাকতো।

বাস্তাৰ দিকে এক পা বাড়িয়ে ফুলজান বলে : বাবুৰে তুই এত ডৰাস কেন,
আমাৰ দেখে বাবুৰ পছন্দও ত হয়ে যেতে পাৰে। আমাৰ কদম তুই বুৰলি না
এখনও !

কিছুক্ষণ শফি বোকার মত কৰ্তৃ বদলে দাঢ়িয়ে থাকে। তাৱগৰ ঘৰে তালা
বক কৰে দশ ইঞ্চৰেৰ বড়বিবিৰ কাছে চিঠিটা পোছিয়ে দিতে যাব।

ফিরে এসে শপিৰ নিখাস ফেলে শফি ভাবে : থাক এবাৰ বকশিস্ সহজে
মিচিষ্ট হওয়া গেলো। আচ্ছা বাবু কত বকশিস্ দিবেন ? এক টাকার কম ত
নয়, টাকা দুইও দিতে পাৰেন। বাবুৰ দিলটা সত্যিই খুব বড়। আচ্ছা টাকা
দুই বকশিস্ পেলে ফুলজানকে খুশি কৱিবাৰ অস্ত তাকে একটা সিকি বেশি
হেওয়া থাবে। বাকি থাকে বাবো আনা। তা থেকে একটা ভাল দেখে আয়না
কিমতে হবে। তাৰ আয়নাটা অনেকদিন ভেঙে গেছে, চেহাৰা দেখাৰ অস্থিধা
হয় বড়। আয়না কিমে থা বাকি থাকবে তাৰ থেকে সে ‘তাজমহল টকি
হাউস’-এ ‘দিলকি ভাঙু’ ছবি দেখতে থাবে। ছবিটা নাকি খুব ভালো হয়েছে।
ভাবতে ভাবতে শফিৰ গলাটা উকিয়ে যাব। বিড়ি খেতে এখন ভালো লাগছে
না। বাবুৰ টিন থেকে কয়েকটা সিগ্রেট তুলে আনলে কেমন হয় ? শেষ পৰ্যন্ত
শফি লোভ সহজে কৱতে আ পেৰে ১৯৯ মং স্টেট এক্সপ্ৰেস টিন থেকে ভিৰটা
সিগ্রেট তুলে আনে।

একটা সিগ্রেট ধৰিয়ে বাবুৰ নাস্তা তৈৱী কৱতে বসে শফি। আজকে
নাস্তা খুব ভালো কৱা চাই। নাস্তা থেৰে বাবুৰ মন যাতে আৱণও খুশি হয়।
পৱোটা শফি চিৰকালই ভালো তৈৱী কৱতে পাৰে, আজকে আৰাৰ সে বিশেষ
যত্ন নিছে। পৱোটা তৈৱী কৱা হয়ে গেলে শফি উনোনে মাংস চড়িয়ে দেয়।
আৱগৰ প্রেটঙ্গলো যাজতে বসে। যতক্ষণ আ সেঙ্গলো ঝকঝকে ডকতকে হয়ে
উঠলো ততক্ষণ অপৰিসীম উৎসাহেৰ সঙ্গে সে মেজেই গেলো।

অতক্ষিতে এক সময় তাৰ মনে পড়ে : আচ্ছা, বাবু যদি আৰকে আমাকে
বকশিস্ না দেন। পৰক্ষণেই শফি তাৰ মন থেকে সে চিঞ্চা বেঁড়ে ফেলে। এ সব
ছাইপাশ সে কি ভাবছে। তাৰ এত পৱিত্ৰম কিছুতেই ব্যৰ্থ যেতে পাৰে না।

তবে সিগ্রেট জিটা। এমন করে তিনি থেকে না তুলে নিলেই হোত। ছ'টো
সিগ্রেট এখনও আছে তার কাছে, তিনি রেখে আসাই উচিত। সিগ্রেট ছ'টো
হাতে নিয়ে শকি উঠতে থাকে এমন সময় বাইরে কড়া মাড়বার পদ। সিগ্রেট
ছ'টো তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বাইরে এসে সে দুরজ্ঞ খুলে দেয়। মকবুল অফিস
থেকে ফিরেছে। যুখ্টা তার খুব বেশি প্রভূজ মনে হচ্ছে না, হয়ত অফিস থেকে
আস্ত হয়ে ফিরে এসেছে বলেই এমন লাগছে। কিছু না বলে মকবুল নিজের
কামরার অভিমুখে পা বাঢ়াল।

বাবুচিনামায় ফিরে গিয়ে শকি টেতে মকবুলের নাম্বা ভাল করে সাজায়।
বাঙ্গাটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। চমৎকার গত বেঙ্গলে যাংসের ‘কারী’
থেকে, শকির নিজেরই খিদে পেয়ে থাক। হাসিমুখে শকি ‘টে’ নিয়ে মকবুলের
কামরায় যায়।

হাত মুখ ধূয়ে পঞ্জীয় মুখে মকবুল বসে আছে হাতল-দেওয়া চেরারে। টেবিলে
ক্ষেত্রে শকি টে-টা রাখে মকবুল তখন নিজের নিষ্ঠাকষ্ট ভাবে : চিঠিটা দিয়েছিস ?
একগাল হেসে শকি বলে : হ্যা, বাবু।

—কাবে দিয়েছিস ?

—কেন সেজবিবিকে।

—চিঠিটা তোকে কাবে আমি দিতে বলেছিলাম ?

হঠাৎ শকির প্রচণ্ড আকস্মিকভাব সঙ্গে মনে পড়ে বাবু চিঠিটা সেজবিবিকে
নয়, বড়বিবিকে দিতে বলেছিলেন। শকির বদনে শকি দাঢ়িয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক শাস্তি স্বরে মকবুল বলে : তোকে কাল থেকে আমার আর চাই
না, অন্য জাইগায় চাকরি খোজ।

একটা বিষুচ্ছ হয়েছে শকি বে একটা কথাও সে মুখে আনতে পারে না। আর
শকি জানে, মকবুলের কথায় প্রতিবাদ করাও নিষ্ফল।

বিমর্শ বদনে শকি রাঙ্গাঘরে ফিরে যায়। ফুলজামের কথা এখন তার মনে
পড়ছে না। বকশিসের কথাও নয়। এমন আরামের চাকরিটা তার সামাজিক
একটা ভূলের অন্ত খসলো, এ দৃশ্যে তার প্রায় কান্না পার। এখন কি করবে
ন্তে, কোথায় যাবে, ফুলজামকেও বা মুখ দেখাবে কেমন করে ? চারদিকে শকি
স্বচ্ছকার দেখে। রাঙ্গাঘরের বেধানে সে ছ'টো সিগ্রেট লুকিয়ে রেখেছিলো
বেবিকে তার দৃষ্টি পড়ে। সিগ্রেট ছ'টার ওপর তার বিজ্ঞাতীয় বিবেৰ
হয়। এই সামাজিক লোত সামলাতে পারলো না বলেই ত তার এত বড়
অস্বাভাবিক !

অসহায় ক্রোধে সিগ্রেট ছুটো কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে পারের তলায় দাখিলে
মে উপরে বসে বসে চকোর খেতে থাকে। তেমন অবস্থায় ফুগজান থকি তাকে
দেখতো তবে মে ভাবতো, একটাকা বকশিস পেয়ে শফি মিঠা মনের স্মৃতি মাট্টে
বসেছে।

ପଥ ଜୀବା ନାହିଁ

ଆବୁଦ୍ଧ କାଳାମ ଶାମଶୁନ୍ଦିନୀ

ମାଉଲତଳାର ଗୁରୁର ଆଲୀ ଓରଫେ ଗହରାଣୀ ପ୍ରାଯି ଉସ୍ତରେ ମତୋ ଏକଥାନା କୋଦାଳ ଦିନ୍ୟା ଗ୍ରାମେର ଏକମାତ୍ର ସଡ଼କଟାକେ କଷତବ୍ୟକ୍ତ କରିଯା ଫେଲିତେଛିଲ ।

ତାହାର ଏହି ମତଜ୍ଞନୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପଢ଼ାତେ ଏକଟା ଇତିହାସ ଆଛେ ; ଦୀର୍ଘ ଏକ କାହିଁମୀଓ ବଲିତେ ପାରେ ତାହାକେ । ଏକଟୁ ସହାଯୁତ୍ତିର ସହିତ ମେ ଇତିହାସ ବିଚାର କରିଲେ ତାହାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଲା ଖୁବିଜ୍ଞାପାଦ୍ୟା ଯାଇବା ; ଅଛିଲେ ଯେ ସଡ଼କ ଏକଦା ସକଳେଇ ସମବେତ ଚେଷ୍ଟୀଯ ଗ୍ରାମେର ଉପରିକଳେ ଗଡ଼ିଯା ଉଠିଯାଛିଲ, ଏମନ କି ଗହରାଣୀ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ତାହାର ସ୍ଵର୍ଗ ଜୟିତି ବିରାଟ ଏକଟା ଅଂଶ ଛାଡ଼ିଯା ଦିତେ ପାରିଯାଛିଲ, ହଠାତ୍ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯା ଫେଲିବାର ଅନ୍ୟ ମେ-ଇ ବା ଏମନ ଉପରିତବ୍ୟ ହଇଯା ଉଠିବେ କେନ ?

ଏହି ଗତ୍ୟକେର ପୂର୍ବକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିଷ୍ତାନେର ହନ୍ଦ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳେର ଯେ ଗ୍ରାମଙ୍ଗଳି ବହିର୍ଜଗତେର ସହିତ ଏକପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ-ଶୃଙ୍ଗ ଥାକିଯାଇ ମଞ୍ଚିର ଜୀବନଧାରୀ ଯାପନ କରିତେଛିଲ, ଏହି ମାଉଲତଳା ଗ୍ରାମ ତାହାଦେର ଏକଟି । ବିରାଟ ଏହି ଦେଶେର ଇତିହାସେ ରାଜ୍ୟବାଟ୍ରେର ତାଙ୍ଗ-ଗଡ଼ା ବହରାର ଘଟିଯାଇଛେ ; ହନ୍ଦ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କିଂବା ଢାକା-ମୁଶିନାବାଦେର ବାଦଶାହୀ ତଥ୍ବେ କତୋ ରାଜଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ-ପତମ ସାହିତ୍ୟରେ—ମର୍ଗ, ପତ୍ର'ଗୀଜ, ବର୍ଗୀର ବନ୍ଧୁ କତୋବାର କତୋ ହାନେ ଝାଡ଼ ତୁଳିଯା ବହିର୍ଜ ଗେହେ, କିନ୍ତୁ ମାଉଲତଳାର ସ୍ଵକୀୟ ଜୀବନଧାରୀଙ୍କ ତାହା କିଛିମାତ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ତୁଳିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଇଂରେଜ ସଭ୍ୟତା ମନ୍ଦାନ ଭାରତବର୍ଷୀର ସଂକ୍ଷିତିର ମର୍ମମୂଳ ଧରିଯା ନାଡ଼ା ଦିଲ୍ଲାଛିଲ ମନେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତବୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ ପୂର୍ବକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉଲତଳା ଗ୍ରାମ ତାହାର କୋନେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତରେ ଏହି ସଡ଼କଟି ନିର୍ମିତ ହଇବାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉଲତଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାତର୍ଯ୍ୟ ଅଇଯାଇ ବାଚିଯା ଛିଲ ।

ତଥନକାର ମାଉଲତଳାର କଥା ଏଥିନ ହେଲା ନିଷକ କାହିଁମୀର ମତୋଇ ଶୋନାଇବେ ତୋମାଦେର କାହେ । ଏଥାନକାର ମୁଣ୍ଡିକା-ମଂଗଳ ଜୀବନଙ୍ଗଳି ତଥନ ସଂଗ୍ରାମ-ଶୌର୍ଦ୍ଧ ଭରପୂର । ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିତିର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଯା ତାହାରା କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତି ଫଳାଇତ ; ଡୋଗେର ଅଧିକାର ଲାଇଯା ଆଦିମ ସୀର୍ବତ ସହକାରେ ମଧ୍ୟମୂଳୀ ଅନୁଶର୍ଣ୍ଣ

ଲହୁଆ ଲଡ଼ାଇ କରିଲ, ଜୋର କରିଯା ଧରିଯା-ଆନା ମେରେମାହୁସକେ ବିବାହ କରିଯା
ତାଳୋବାସିତ ଆର ଅବସର କାଳେ ଗାନ କିଂବା ପାଳା ବୀଧିଯା ଆନନ୍ଦ ଉଂସବ କରିଲ ।
ବାହିରେ ଜଗତେର ସହିତ କୋନୋକୁପ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଛିଲ ନା ବଲିଲେଇ
ଚଲେ । ଜୀବନସାତାର ଏକଟା ଏକାଙ୍ଗ ନିଜ୍ଵର୍ଷ ଓ ସ୍ୱର୍ଗସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈତି ଓ, ପଞ୍ଚତି ବର୍ତ୍ତମାନ
ଛିଲ । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ବ୍ୟାହତ କିଛୁମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ତାହା ସ୍ୟାହତ କରେ ମାଇ !

କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କରିଲ—

ଏକଦିନ ଏହି ଗ୍ରାମେଇ ଏକଜନ ପୁରୁଷ ତରୁଣ ବସିଲେ ଛିଟକାଇଯା ବାହିରେ ଗିଯା
ପଡ଼ିଯାଇଲ; ଧରିତେ ପାରୋ ଏଥି ହିତେ ମେ ପ୍ରାୟ ଚଲିଶ ବଂସର ପୂର୍ବେକ୍ୟାର କଥା ।
ମେ ସଥମ ଆବାର କରିଯା ଆସିଲ ତଥନ ସାଥେ କରିଯା ମେ ତୁଥୁ ଧନସମ୍ପଦାଇ ଆନିଲ
ନା, ଆପାତଦୃଷ୍ଟିତେ ଉପରେତର ଆରେକ ଜୀବନ-ପଞ୍ଚତି ଓ ସଭ୍ୟତାଓ ସେମ ମେ ତାହାର
ଚିତ୍ତା କର୍ମ ଚରିତ୍ରେ ବହନ କରିଯା ଆନିଲ । କୌତୁଳ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଦୀନ ମାଉଲତଳା-
ବାସୀରା ସେଦିନ ତାହାର ଚାରିଦିକେ ଆସିଯା ଭିଡ଼ କରିଲ ।

ମେ କହିଲ—ଏହି ମାଉଲତଳାର ବିଳ, ଖାଲ, ଏଇ ବିଶଖାଲୀ, ଆଡ଼ିଯଲର୍ଥୀରୁ
ଓପାଶେ, ବାଜାର ଯେ କାହାରୀତେ ମକଳେ ବଚରେ ଏକବାର ଖାଜନା ଦିତେ ଯାଇ,—
ତାହାର ଓ ଦୂର ଆରେକଟା ଦେଶ ଆଛେ—ଶହର ତାହାର ନାମ,—ମେଇ ଦେଶେର ସହିତ,
ମେଇ ଦେଶେର ଜୀବନେର ସହିତ ପରିଚିତ ନା ହିଲେ ଏହି ଗୁପ୍ରାମ ମାଉଲତଳାୟ ଏମନ
ହୀନଭାବେ ଜୀବନ କାଟାଇବାର କୋନି ଅର୍ଥ ହସନ ନା । ମାହୁସ ହିତେ ହିଲେ, ତାଳୋ
ଭାବେ ଜୀବନ-ଧାରଣ କରିତେ ହିଲେ ଏମବ ଶହର-ବନ୍ଦରେର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକାଙ୍ଗ
କୁରକାର ।

ଏବଂ ମେକ୍ଷେତ୍ରେ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହଇଲ, ଅବିଲମ୍ବେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚୋଟୀ
ହିସାବେ ଏକଟା ସତ୍ତକ ମିର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ହଇବେ ।

ଜୋମାବାଜୀ ହା ଓଲାଦାର ସେଦିନ ଏମନ ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରକାଶ କରିଲ ଯେ, ଏଥି ହିତେ
ତାହାର ଦ୍ୱୀପ ଜୟଭୂମି ମାଉଲତଳାର ଉପରି କରାଇ ତାହାର ଜୀବନେର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବଡ଼
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଲିଯା ମନେ କରିବେ ।

ଚୋଟା ଚରିତ୍ର କରିଯା ଜେଳୀ ବୋର୍ଡେର ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଧାରା ମେ ଏହି ସତ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବନ୍ଦୋବନ୍ଦୋ
କରିଯା ଫେଲିଲ । ମାଉଲତଳାର ସଙ୍ଗ-ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତତିପତ୍ର ଯାହାରା, ତାହାରା ପ୍ରଚାନ୍ଦ
ଉଂସାହେ ଗ୍ରାମୋର୍ଯ୍ୟନେର ତଥା ସ୍ଵ ସ୍ଵ ଜୀବନୋର୍ଯ୍ୟନେର କାଜେ ଲାଗିଯା ଗେଲ ।

କିନ୍ତୁ ମୁଖକିଳ ବାଧାଇଲ ଏହି ଗଛବାଲିର ମତୋ ଦୀନ ଦୁରିତ ଘଜାରା । ସତ୍ତକ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତରେ ତାହାଦେର ଜୟିର ସେ ଅଂଶଖାଲି ଯାରା ପଡ଼ିବେ ତାହା କିଛୁତେଇ ଛାଡ଼ିଯା
ଦିତେ ରାଖି ହିତେଛିଲ ନା । ଗହରାଲି ବଲିଲ : ମୋତେ ପାଚବୁଡ଼ା ଆମାର ଭୁଇ,
ହେବ ଦୁଇ କୁଡା-ଇ ସତ୍ତକେ ଧାଇଲେ ଆମି ଧାମୁ କି ?

জোনাবালি জবাৰ দিয়াছে : আৱে মেয়া, কেবল ক্ষেত্ৰে ধান বেচইয়াই
পৱসা হয় শেখছো এতোকাল । সড়কটা হইতে দেওয়া, দেখবা উপাৰেৰ আৱো
কতো রাস্তা খুলইয়া যায় । কইলাম যে, এ সড়কেৰ কেবল সড়ক বলইয়াই
ভাইব্যোনা, এ তাৰো চাইষা বড় জিনিস । সব কথা তো বোৰবানা, তউ কই
হোয়ো, এ রাস্তা নতুন জীবনেৰো ।

গহুবালি কৌ বুঝিয়াছে, প্রতিবাদেৰ তীব্রতা কিছুটা কমিয়াছিল বইকী ।
একে জোনাবালিৰ মতো ধৰী মানী লোকেৰ কথা ; তাহাৰ উপৰে স্বপ্নেৰ মতো
মে দেশেৰ বৰ্ণনা শুনিয়া তাহাৰও মন তখন এক অন্তুত সন্তোষমান ভৱিয়া
উঠিয়াছিল । এই সড়কেৰ কল্যাণে বাস্তবিকই যে জীবনেৰ সমূখে এক নতুন পথ
প্ৰসাৰিত হইয়া পড়িবেনা তাহা কে বলিতে পাৱে ! জোনাবালিৰ বাড়ি হইতে
বাহিৰ হইয়া তাহাৰ যে জমিধাৰাৰ উপৰ সড়ক যাইবাৰ কথা, তাহাৰ উপৰ
আসিয়া দৌড়াইল ।

এখনও—এই অগ্রহায়ণেৰ শেষেও প্ৰাৱ গোড়ালিৰ উপৰ পৰ্যন্ত সেখানে
কাদাৰ ডুবিয়া যায় । ধান পাকিতেছে, তাহাৰ শীষগুৰি, ছুইয়া পড়িয়াছে স্বেৰ
মতো, অধিকাংশই লুটাইয়া পড়িয়াছে কাদাৰ মধ্যে । মজা বিলৈৰ জমি—এখন
হইবেই । কোনো বৎসৱই লাভজনক ফসল এখান হইতে পাওয়া যায় না । পানি
জমিয়াই প্ৰাৱ অৰ্ধেকেৰও বেশি ফসল নষ্ট কৰিয়া ফেলে । তবু এ-দিনে ক্ষেত্ৰ-
ধানাব দিকে চাহিয়া তাহাৰ মন ভৱিয়া উঠিত এতোকাল ; আজ কী জানি কেন
মনটা খুব বিৱস হইয়া উঠিল । মনে মনে ভাবিল আৱ কাহাতক ইইভাবে দুটি
ছাতি ধান খুঁটিয়া জীবন চালানো যায় । তাহাৰ চেয়ে সমূখে যে ময়া জীবনেৰ
হাতছানি, তাহাকে বৱণ কৱিয়াই দেখুক না এবাৰ । জোনাবালিৰ কথায় সুখ-
সমৃক্ষ, মাহৰ হইয়া বাঁচিয়া থাকা, সবই নাকি তাহাদেৰও জীবনে সন্তুষ হইতে
পাৱে । শুধু যে-আবহে, যে-বীতিতে জীবন চলিত এতকাল, তাহাকে পালটাইয়া
নতুন কৱিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে । দোষ কী, দেখুকই না একবাৰ পৱন
কৱিয়া । জোনাবালি, দশবৎসৱ পূৰ্বেও যাহাৰ পিতা উদয়াল্প পৰিশ্ৰম কৱিয়া
এক মৃষ্টি অৱ সংস্থান কৱিতে পারিত না, তাহাৱই পুত্ৰ যখন আজ সেই অগতেৰ
কল্যাণে জীবনে অগাধ ধৰ্ম-ঐশ্বৰ-সমৃক্ষ আহৰণ কৱিতে পৰিয়াছে, তাহাৱাই বা
কেন তাহাদেৱ তাকৎ ও হিস্তত লইয়া ভাগ্য বহলুইতে পাৱিবে না ?

বাড়ি কৱিয়া জীকে কহিল : ঠিক কৱলাম, রাস্তাৰ লইগ্যা দিমু জমিটা
ছাড়াইয়া ।

বউটি অল্পবয়সী হইলেও বুকি বিতাস্ত কম ছিল না, ভাত বাড়িয়া দিতে দিতে

হঠাতে ধারিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুকাল ; কহিল : তা
হলৈ ধামু কী ?

—অতোশতো ভাবতে গেলে কী আর শাশের কাম হয় ? সকলেরই মনের
জন্য যে কাম তাৰ লাইগ্যা সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ শীকাৰ কৰত্বেই হইবে।
গহৱালি অবিকল জোনাবালিৰ কথাগুলি ত্বীকে বেশ ভাৰিকিছালে শোষিয়া দিল ।

স্তৰী তবু খুঁত খুঁত কৱিল : বুবিনা শাশের দশের কাম কাৰে কয়—মৌলবী
সাইবে তো কইয়া গেলেন বেশ আছি আমৰা, রাস্তা-ফাস্তা বানাইয়া এমে-ওমে
গেলে জীবনে আৱো কষ্ট বাড়বে ছাড়া কৰবে না । আৱো কইলেন ঘোলে
হগোল-ভিৰে বাইৰ অওনইয়া স্বভাবে পাইছে, এয়া ভালো লক্ষণ না ।

—ধূইয়া দেও হেব কথা । নতুন কোনো জিনিস কৰতে গেলে একদল মাছৰ
চাইৰ দিক দিয়া এৱহম বাধা দেয়ই ।

স্তৰী তবু বলিল : না হয় বোঝলাম দশের উপগাঁৱের কাম । তউ ওয়া কী
আমাগো কৱা সাজে, যগো ধাইয়া পড়ইয়াও বাড়তি আছে হেৱা কক্ষক গিয়া ।
মাস্তা আমাগো অইলেই বা কী, না অইলেই বা কী ।

গহৱালি কহিল : যাইয়া মানুষেৰ বুদ্ধি তো ! যে জিনিস মাই, হেৱ
লাইগ্যা তাৰই তো বেশি আহইট । যাগো আছে তাগো গৱজ কী ! সকলেৰ
মন্দল মাইলেই তো আমাগোও মন্দল ।

পৱে সে হাজেৱাকে ক্ষেত্ৰে যে উচু-পাড়ে তাহাদেৱ বাড়ি, তাহারই কিমারে
ডাকিয়া লইয়া গেল । জোনাবালিৰ নিকটে রাস্তাৰ বৰ্ণনা সে যেমন যেমন
তৰিয়াছে ঠিক সেইভাবেই তাহার নিকট বৰ্ণনা কৱিয়া গেল । আঙুল দিয়া
দেখাইল শাদা মেঘেৰ ভেলা ভাসানো বীল আকাশেৰ নিচেৰ রোজ-খিলমিল
দিগন্ত । সবুজ বনানীৰ সীমাবেধায়, কাশবনেৰ উকাম ইশাৱায় সে দিগন্ত যেৱ
কোৱ স্বদূৰ স্বপ্ন-বাঞ্জে হারাইয়া গিয়াছে ।—আৱ মুখে সে আবৃত্তি কৱিল
জোনাবালিৰ সেই কথা কয়টি : এ কী কেবল সড়ক ! একটা নতুন জীবনেৰে
মাস্তা । স্বথেৰ আৱ সমৃদ্ধিৰ—

হাজেৱা আৱ সে সেই সড়ককে কলমায় দূৰ হইতে দূৰ বিছাইয়া চলিল ।
পৃথিবী যতোধানি তাহাদেৱ ধাৰণায় কুলায়, যেন তাহার শেষ সীমানা অবধি ।
এতোকাস আচৰিত জীবনেৰ প্রতি যনে যনে তখন বিৰোহ উদ্বাম হইয়া
উঠিয়াছে ; উৱততৰ জীবনেৰ অন্য যনেৰ গতি তখন বাধাৰক্ষহাৰা । এই সড়ক
তাহাদেৱ সে কামনাকে পৰিপূৰ্ণ কৱিতে পাৰিবে কিনা, তাহা বিচাৰেৰ সাধ্য
তাহাদেৱ ছিল না, তখুন বিখাসেই তাহারা উজীবিত হইয়া উঠিয়াছে । গহৱালি-

অপৰণ বৰ্ণনায় ভবিষ্যৎ জীবনের মে চির হাজেরার সমুদ্ধে তুলিয়া ধৰিল, সরলা
গ্রাম্য তরুণী হাজেরা অর্থবিদ্যাস অর্থবিদ্যালে তাহা দেখিয়া গ্ৰোয়াক্ষিত হইয়া
উঠিল। গহৱালিৰ হাত পৰ্শ কৱিয়া বাবুবাৰ সে জিজাসা কৱিল : সত্য ?
হাচইও ?

—দেখবাই ভবিষ্যতে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ কথাটিৰ ব্যাপ্তি বড়ো বেশি। সময়সময় তাৰ অস্ত প্ৰত্যক্ষ
কৱিতেছি বলিয়া মনে হইলেও, কাৰ্যকালে তাহাৰ অস্ত খুজিয়া পাওয়া মুশকিল।
গহৱালিৰ তাহাৰ পৰিমাপ কৱিতে পারিল না।

অবশ্যে সমস্ত বাধাৰিপত্তি ও প্ৰতিকূলতা কাটাইয়া সড়ক নিৰ্মাণ শেষ হইল।
জোনাবালি দুই দুইটা গোৱু জবেহ কৱিয়া প্ৰমিকদেৱ আপ্যায়িত কৱিল। সে
মেজবানে গ্ৰামেৰ অধিকাংশ লোক শৱিক হইল। রাত্ৰে বসিল পালাগানেৰ
আসন। এমন উৎসৱ এখনকাৰ নিষ্ঠবন্ধ জীৱন বড়ো বহুবাৰ কৰে নাই।

পুৰুষেৱা একে একে প্ৰায় সকলেই একবাৰ কৱিয়া শহৰ ঘুৰিয়া আসিল।
এবং সকলেই আসিল কিছু না কিছু সেই সত্যজগতেৰ চিহ্ন লইয়া। প্ৰথম
উন্মাদমাটুকু কাটাইয়া লোকে অবশ্যে সড়কেৰ উপন্থ গোৱু বাধিত ; ক্ষেত্ৰে কাঞ্জ
কৱিতে কৱিতে তাহাৰই পাখে বসিয়া গল্প কৱিত ; হ'কা টানিত—আৱ তাহাৰই
ফাঁকে ফাঁকে গ্ৰামেৰ চাৰি পাচটি ঘূৰক ভাগ্যান্বেষণে বাহিৰ হইয়া গেল।

গহৱালিৰ একদিন যে কয়টা পিৱহান ছিল একে একে সব কয়টা পৰিয়া
মাধ্যাম মুখে ভালো কৱিয়া তেল মাখিয়া প্ৰসাধন কৱিয়া একখানা তেল-চকচকে
বাঁধানো লাঠি হাতে কৱিয়া তিনদিন ধৰিয়া শহৰ বন্দৰ ঘুৰিয়া দেখিয়া আসিল।
জোনাবালিৰ কথাৰ চাকুৰ প্ৰমাণ মিলিল এবাৰ। সত্যই তো, এখনকাৰ
মাঝৰেৱা সত্যই অভিনব। স্বত্ৰে ঐশ্বৰে পৰিপূৰ্ণ আৱেক জাতেৰ মাঝৰে সেখানে
বাস। তাহাদেৱ প্ৰতিটি চাল-চলন, কথা-বাৰ্তা, জীৱন-বীতি গহৱালিৰ নিকট
পৱন লোভনীয় বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তবু সব দেখিয়া শুনিয়া একটি দৃঢ়ে
বৰাবৰাই তাহাৰ মনে খচখচ কৱিয়া বিঁধিতে লাগিল—উহাদেৱ ঘেন ধৰা হোয়া
কিংবা নাগাল পাওয়া যাইতেছিল না। তাহাৰ মতো দীন দৱিতেৰে প্ৰতি কেহই
লক্ষ্য দেৱ না, দুইবগু ধায়িয়া এখানে কেহই তো তাহাৰ কুশলও জিজাসা কৰে
না। তাহাদেৱ মাউলজলাতে অপৰিচিতকেও সজ্ঞাবণেৰ মে বীতি, তাহা এখানে
নাই। এমন কী কেহ চোখ তুলিয়া তাকায়ও না, যদিৰ বা কেহ কথমো
তাকাইয়াছে, গহৱালি বড়ো অস্পতি বোধ কৱিয়াছে সে দৃষ্টিৰ সমুদ্ধে। সে দৃষ্টিতে
মায়া বৱ, যমতা বৱ, আজীৱনতাৰ সত্ত ইঙ্গিতও বৱ, শুধু তাঙ্গিল্যমাখা বলিয়াই

বোধ হইয়াছে তাহার । কেবল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল সে সক্ষ্যাকালে বাজারের পথ দিয়া শাইবার সময় , দুইধারে সারি সারি যেয়েরা - কেহ বিলোল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল , কেহ বা আহ্মানও করিয়াছিল হাতছানিতে , তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই একটি যেয়ের কী কথায় সকলে যখন হাসিয়া উঠিল । গহরালি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল । ব্যাপারটা কী বুঝিতে পারে নাই । তবু একটি যেয়ের চোখের চাওয়াটুকু বড়ো ভালো লাগিয়াছিল ।

দ্বিতীয় দিন সক্ষ্যাকালে সে আবার সেই পথে গেল । সেই যেয়েটি তখনে সেখানে দাঢ়াইয়া । গহরালি তাহার নিকট দিয়া শাইবার সময় সে একটু ধূম করিয়া হাসিল । গহরালির মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া গেল ; ইঁক করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্ধচেতনের মত সে সেখানে দাঢ়াইয়া রহিল ।

যেয়েটি হাতছানি দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল : আয়েন ।

গহরালি সম্মোহিতের মতো তাহাকে অহসরণ করিল ।

যেয়েটি তাহাকে শহিয়া গেল হোগলাপাতা আৱ টাঁচের বেড়া দিয়া বুনানো ছোট একটি ঘৰে । একপাশে একটা বিছানা, অন্তদিকে ছোট একটা হারিকেন । যেয়েটি আলোটা উক্ষাইয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল : নতুন আইছো প্রায় খেইক্যা, না ?

গহরালি মাথা দোলাইল ।

বেশ ! তা, ট্যাঙ্ক ভাৱি আছে তো ? দশ টাকায় কম কাম অইবোৱা, কইলাম । দেহি কতো আছে,—বলিয়া যেয়েটি তাহার কোমরে হাত দিল । গহরালি যেমন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তেমনি ভয়ও পাইল । বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও তাহার ছলনায় শেষ পর্যন্ত সে ভুলিয়া গেল ।

পাঁচমিনিট পৰেই গহরালির প্রায় সবি আদায় করিয়া যেয়েটি তাহাকে উঠাইয়া দিল : আৱো বইলে টাকা আৱো দেওয়া লাগবে ; এহোন ধাৰ যিয়া ।

প্রতিদ্বন্দ্বি গহরালি কী পাইল, তাহা সে-ই জানে । তবু এই অনাত্মীয় দেশে আত্মীয়তা বুলিয়া, সহস্যতা বলিয়া সে যাহা তাৰিয়াছিল, তাহা একেবাবে চুৰমাঙ্গ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল ।

মনে মনে গভীৰভাবে সে উপলক্ষ্য করিল এখানে পয়সার মূল্যে সব জিনিসেৱাই যাচাই হয় । পয়সাই এখনকাৰ জীবন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈছে । পাঁপেৰ কোনো মূল্য ইহাবা দেব না । বড়ো একাকী আৱ বিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহার ॥ তৃতীয় দিন সকালে একটা বিৰুল যন শইয়া সে প্রামেৰ পথ ধৰিল ।

তবু সামাপ্তি ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই পয়সার ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ জীবনকে পড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিল। এবং পয়সা উপায়ের পথ খুঁজিতেই তখন হইতে তাহার ব্যন্তি শুরু হইল। হতাশ হইয়া এপথে কিছু কয়া গেলনা বলিয়া অঙ্গ চেষ্টার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার মতো মৃত্যু তো তাহার আৰু নাই। যমে যমে একটু দমিয়া পড়িলেও স্তৰীর নিকট যে বাহাহুণী করিয়াছে একদিন—তাহারই জন্ম সে হাল ছাড়িল না।

ধূম সে একাই নয়, আৰো পাঁচজন মিলিয়া তরিতৱকারী, মাছ যে যাহা জোটাইতে পারে, তাহা লইয়াই সে পথে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। এমন যে থানকুনি পাতা—যাহা এখনে বনেবাদাড়ে অক্ষয় জয়ায়, কেহ ফিরিয়াও দেখেনা, শহরে তাহাতেও পয়সা। এমনি করিয়া ধীৱে ধীৱে গ্রামের প্রতিটি বন্ধ শহরের পথে নীত হইতে লাগিল। হাজেরা একদিন পরিহাস করিয়া কহিল : যা আৱস্তু কৱলা, শেষকালে আমাগোও না বাজারে লইয়া যাও !

গহুবালি তখন বেশ দুপয়সা উপার্জন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বছৰ তিনেকের মধ্যে খোড়োঘরের চাল ফেলিয়া সে তিই তুলিয়া ফেলিল। যাহারা জোনাবালিৰ কথায় সংশয় প্ৰকাশ কৱিয়াছিল, এবাৰ তাহাদেৱও চোখ খুলিল।

কিন্তু এইপথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানীতেও ছুটাছুটি শুরু হইল ধীৱে ধীৱে। শান্দামাটা-সকল জীবনে আসিতে লাগিল কৃটবুকি আৰু কোশলেৱ পড়িজাল। এই সড়কেৱ চারিদিকে প্ৰচুৰ গলি ঝুঁজিয়ও স্থষ্টি হইল। অনেক বাঁক অনেক মোড়। মাউলতলা জটিল হইয়া উঠিল। বুবিবা তাহার প্ৰভাৱ পড়িল এখানকাৰ লোকেৱ মনেৱও উপৰ।

এমন কী একদিন এই সড়কেৱ উপরেই গোৱতে ধান ধাৰাবাৰ সামান্য বিষয় লইয়া দুইদলে লড়াই এবং একটা খুন পৰ্যন্ত হইয়া গেল।

জোনাবালি খবৰ পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন আসিয়া পৌছিল তখন খুন তো একটা হইয়া গিয়াছেই, আৰু তাহার এতো সাধেৱ সড়কেৱ একটা অংশে তিল তৈৱিৱ কাজে উড়িয়া পিয়াছে।

সকলকে ডাকিয়া কহিল : সড়ক কী এয়াৰ লাইগ্যা বানাইছেলাম আমৱা ? আকার্টমুৰ্ধ জানোয়াৰেৱ দল ! জোনাবালিৰ ভংসনায় কাহারও মুখে কোনো ভাৰাস্তৱ দেখা গেল না। ধানা, মামলা-আদালত লইয়াই তখন তাহাদেৱ চিষ্ঠা।

ইতিমধ্যে যুক্ত লাগিল।

তাহার চেউ এ পথ বাহিয়া এবাৰ আসিল এখানেও। এ দেশেৱ ইতিহাসে তাহা এই প্ৰথম ; রাজ্য-স্বার্থ লইয়া ভাঙাগড়াৱ এইসব গ্রামেৱ কোন পৱিত্ৰতা

ঘটে নাই কোনো দিন, কিন্তু অতীতের শত শত বৎসরে থাহা ঘটে নাই, যাই শত
বৎসরের ইংরেজ-শাসনের ফলে এবার এখানে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল।

চাল-ভালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল
জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বাহিয়াই আসিল যথস্থল। আসিল রোগ-
ব্যাধি, চোরাবাঞ্চার আর দুর্বীতির উভাল জোয়ার। তাহার সমুখে যতোটুকু
নিমিত্তিগত ছিল, কোথায় ভাসিয়া গেল।

মুশাসনে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী আসে এই পথ বাহিয়া, আবার দুব পকেটে
লইয়া ফিরিয়া যায়। শহরের সাহেবের বার্চিট্যানার কাজ করে যে লুক্ফর,
তাহার সহিত আসগরউভার সোমত কল্প কুলহৃষি উধাও হইয়া যায়। লড়াই
ফেয়ত ইউন্ফের স্তু কঠিন স্তুরোগে হাত-পা-মুখে ঘা লইয়া শেষ নিখাস ত্যাগ
করে। আবার আসে তরী-তরকারী, কাঠ, মুরগী—ছানোত্যানো নানা জিনিস
কিনিতে মিলিটারীর দালাল।

ঘটনাচক্রে তাহাদের একজনের সহিত গহরালির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ভগিয়া
গেল। তখন মন্ত্রস্থরের কাল। গহরালির নিদানকণ কষ্ট। ভাবিল, তাহাকে
ধরিয়া দিব তাহার কোনো একটা উপায় মিলিয়া যাব।

কিন্তু উপায় হইল না কিছুই; কেবল একদিন সকালে দুব হইতে উঠিয়া
গহরালি হাজোরাকে খুঁজিয়া পাইল না।

আবার সে দালালেরও আবার দেখ মিলিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রায় মাইল
দীতেক দূরে একজন চাবীর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, হ্যা, দুব বিহানবেলা এই
পথ বাহিয়াই একটি মেয়েমাহুকে একজন পুরুষের সঙ্গে সে থাইতে দেখিয়াছে
বটে।

মন্ত্রস্থে গহরালি বিঃখ হইয়াছিল বাহিয়ে, এবাবে হইল অস্তরে। নিঃবুম
হইয়া দৃঢ়ি দিন সে বাড়িতে পড়িয়া রহিল। মনের আবেগ, ক্ষোভ, দৃঃখ অরুণাপ
কিংবা রাগ কোনো ভাবা পাইল না, কপ পাইল না; কেবল এক সময় ক্ষিপ্তের
মতো একখানা কোঢাল হাতে লইয়া সে নিজের যে-জিবানার 'উপর' দিয়া
সড়কটা গিয়াছে, সেদিকে ছুটিয়া গেল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল স্তুর শোকে
গহরালি পাগল হইয়া গিয়াছে। শনিয়া সকলে তাহাকে দেখিতে আসিল।

গহরালি তখন উদ্বাদের মতো অবিশ্রান্তভাবে সড়কটাকে কোণাইত্বে
তাহার সব দুর্দশার মূল ষেন ঐ সড়ক, এই ভাবেই সে তাহাকে ভাজিয়া মাটিতে
মিশাইয়া ফেলিবার অস্ত ধরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একাব চেষ্টাতে সে পাখিকে
কী না তাহা একবারও তাহার মনে হইল না।

সকলে প্রশ্ন করিল : 'আহাৰ, এ কদো কী গহনালি ?

—ভাঙতে আছি। হাত না ধামাইয়াই, চোখ তুলিয়া না চাহিয়াই গহনালি
জ্বাব দিল।

—ক্যাম ?

—ভূগ, ভূগ, অইছিলো এ বান্তা বানাইগুাৰ। আমৰা যে বান্তা চাইছোম
হেয়া এ না ;—ঠিক অয নাই। কোদাল চালাইবাৰ ফাঁকে ফাঁকে গহনালি যেন
আজ্ঞাগতভাবেই কথাগুলি বলিয়া গেল।

সকলেৱ ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা কৰে ঠিক হইত কী হইলে, কিন্তু গহনালি দূৰেৱ
কথা, তাহাৰা নিজেৱাও কী তাহা তাৰিত ! অন্ত কোনো নয়া সড়কেৱ ষপ তো
তাহাদেৱ মনে কেহ আগাম নাই !

ନେତା

ଆବୁ ଜାଫର ଶାହସୁଦ୍ଦୀନ

ସେ ରାଜନୈତିକ ମଲେର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ଛିଲ ତାହାର ଛିଲ
ବକ୍ତାର ଦୈତ୍ୟ । କାଜେଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବକ୍ତା ଦିତେଇ ଆମି ଏକଟି କୁହେ ନେତା ବନିବା
ଗେଲାମ ।

କି ସେ ବକ୍ତା ଦିଯାଛିଲାମ ବା ଦିତାମ ତାହା ଆଜି ଆର ମନେ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଏ-
କଥା ସେଇ ଭାଲୋ କରିଯାଇ ମନେ ଆଛେ ସେ, ବକ୍ତା ଖେଳେ ସଥିନ ମଞ୍ଚ ହିତେ ନାମିତାମ
ତଥିନ ଚାରିଦିକ ହିତେ ଶ୍ରୀ-ପୁରୁଷେର ସମ-କର୍ତ୍ତାଳି-ଧନି ଆମାର କାନେର ଭିତର ଦିଯା
ଯଗମେ ପଶିତ ଏବଂ ସେଥାମେ ଶୁଧା ବର୍ଣ୍ଣ କରିତ । ଆମାର କମତାର ଆମିହି ଚମଂକୁତ
ହଇୟା ଯାଇତାମ ।

ପ୍ରଥମ ଜୀବନେଇ କେବ ସେ ଏ-ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦିତେ ବାହିର ହିଇ ନାହିଁ, ସେଇତିଥି
ଆଫଶୋସ ହିତ । ନିଜେକେ ଧିକ୍କାର ଓ ଦିତାମ, ଲୋକ-ଚନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳାଲେ ଲୁକ୍ଷାଇଯା
ଥାକିଯା ଏକମାତ୍ର ଉଦୟରେ କୃଧା ନିର୍ବନ୍ଧିତ କାଙ୍ଗେ ସହି ଏତଦିନ ମଞ୍ଚଭୁଲ ନା ଥାକିତାମ
ତବେ ଆମାର ନାମଓ ସେ ବହ ପୂର୍ବେଇ ନିରିଲ ଭାରତୀୟ ନେତାଦେର ନାମେର ସଙ୍ଗେ ଛାପାର
ହରକେ ମୁଦ୍ରିତ ହିତ ମେ ବିଷୟେ ବିଦ୍ୟୁମାତ୍ରର ସନ୍ଦେହ ଛିଲ ନା । ବିଶେଷ କରିଯା ସହି
ପୂରାତନ କୌନ ରାଜନୈତିକ ମଲେ ଯୋଗ ଦିତାମ ତବେ ତ ଆର କଥାଇ ଛିଲ ନା । ଚାଇ
କି ଉଜ୍ଜୀବ-ନାଜୀର ଓ ହଇୟା ଯାଇତେ ପାରିତାମ ।

ପାଟି ସିଟିଂ-ଏ ସଥିନ ବକ୍ତା କରିତାମ ତଥିନ ଶ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମତ୍ୟ
ଟୁ ଶକ୍ତି ନା କରିଯା ଶୁଣିତ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ଦେଖିତାମ ଆମାଦେର ବନ୍ଧୁ ଦେବକୀର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତାରା ଆମାର
ମୂଖେର ଦିକେ ଏକଦୂଷିତ ଚାହିଯା ଥାକିତ । ମେ ଚାହନିତେ କି ଭାବୀ ଛିଲ ତାହା ଆମି
ବଜା, କବି ନାହିଁ, କି କରିଯା ବୁଝିବ ! ତବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିତାମ ସେ, ମେ ଚାହନିତେ
ଅର୍ଥ ଏକଟା ଛିଲ ନିଶ୍ଚରି । ମେ ଚାହନିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଏମନ କି ପ୍ରେସର ଥାକିତେ
ପାରେ ଏକପ ସନ୍ଦେହ ଓ ଆମାର ମାଝେ ମାଝେ ହିତ ।

(ଜୀବନେ ଆର କଥନ ଓ ନାମୀର ପ୍ରେସ ପାଇ ନାହିଁ । ମେ ସେ କି ଶୁଧା ଦେହେ ବର୍ଣ୍ଣ
କରେ ମେ ଅଭିଭାବା ଆମାର ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ଜୀବ-ଜଗତେ ଶାତାବିକ କାହିଁଥେ
ବାହୀଜାତି ମଧ୍ୟେ ଆଶ୍ରମ ଓ ଔଦ୍‌ଧର୍ଯ୍ୟ ଛିଲ ଅଚୂର ।)

লোকেও যে না ছিল তাহা নয় ।

শ্রীমতী তারার দিকে, কাজেই, ঝুঁকিয়া পড়িলাম । ছুতা-নাতায় তাহার
সহিত কথা কহিতে ভালোবাসিতাম ।

সে কিন্তু আমাকে বেশ একটু সমীহ করিয়াই কথা কহিত । সবে যাত্র
য্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল সে ; কাজেই আমার মতো একজন নেতৃত্বান্বিত
ব্যক্তির সঙ্গে মেলা-মেশা করিবার সময় সমীহ করিয়া চলিবে বইকি !

কিন্তু তবু কি করিয়া যেন একটা অস্তরণতা আমাদের মধ্যে স্থাপিত হইতে
লাগিল । ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেবকীর সহিত আমি পূর্বের চাইতেও বেশি
করিয়া মিশিতে লাগিলাম ।

দেবকী ছিল একজন মামজান্দি রাজনৈতিক কর্মী । সে-শুগের সন্নামবাদী
বিপ্লবীদের সঙ্গে নাকি তাহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল । সমগ্র বাংলা দেশে
তাহার নামের খ্যাতি ছিল ।

আমার সঙ্গে যখন তাহার আলাপ হয় তখন সে সন্নামবাদী আন্দোলন ও
নীতির প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ হারাইয়াচ্ছে । সর্বসাধারণের সহযোগিতা, সমর্থন ও
সক্রিয় অংশ প্রহণ ব্যক্তিরেকে যে আদর্শ-স্থলে পৌছা অস্ত্ব এই সত্য সে ঠেকিয়া
শিখিয়াছিল ।

এই সত্য উপলক্ষ্মি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে গ্রামে পার্টির জন্য অন-
সমর্থন স্থাপিত করিয়া বেড়াইতেছিল । পায়ে ইটিয়া প্রতিদিন সে মাইলের পর
মাইল গ্রামের ধূলিকীর্ণ ও কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া চলিত ।

পঞ্চাশের মন্দস্তর তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ।

সে সময়ে রাজনীতির কথা, ফ্যাশীবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে জরুরণের এক
হইয়া লড়িবার কথা পরিহাসের মতো শুনাইত । তবু দেবকীর বিশ্রাম ছিল না ।

জীর্ণ-জীর্ণ দেহ গ্রাম্য অনসাধারণের কাছে সে রাজনীতির কথা বলিয়া
বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে বাজারে বন্দরে সভা-সমিতিও করিত ।

এমনি এক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সে আমায় আমন্ত্রণ জানাইল । বলিল :
তারাও রাজনীতির প্রতি বেশ খৌক দেখা যাচ্ছে । সে-ও নাকি
বক্তৃতা দেবে । তোমারও যেতে হবে ভাই ।

তারা যাবে শুনে আমার অস্তর খুশিতে বাগবাগ হইয়া উঠিল । স্বদূর গ্রামে
সভা হইবে ; সেকিম আর শহরে ফিরিতে পারিব না, কাজেই তারার সঙ্গে বহুকণ
অবাধে মিশিবার স্বযোগ অবশ্যই যে পাইব তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না ।
একেপ স্ববর্ণ স্বযোগ ত্যাগ করিলে আর পাওয়া না যাইবারই কথা ।

କାଜେଇ ଯାଇବ ସେ ତାହା ବଳାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ହିସ କରିଯା ଫେଲିାମ ।

କିନ୍ତୁ ତରୁ ଏକଟୁ ଦର ବୁନ୍ଦି କରା ଦରକାର । କାଜେଇ ଧରା ଦିବାର ପୂର୍ବେ ଏକଟୁ ଛଲନା କରିତେ ମନ୍ତ୍ର କରିଲାମ ।

ଖିଙ୍ଗା କରିଲାମ : ମେ କତ୍ତୁର ?

—ତା' ବେଶ ଦୂର ଭାଇ । ‘ବାମେ’ ସେତେ ହବେ । ପ୍ରାୟ ମାଇଲ ତିରିଶେକ ହବେ ।

—ରାତ୍ରେ ଥାକବୋ କୋଣା ?

—ମେଜଟେ ତୋମାର ଭାବତେ ହବେ ନା । ବେଶ ସଞ୍ଚପ ଏକଟି ଜେଲେ ପରିବାର ଆଛେ । ଓଦେର ବାଡ଼ିତେଇ ଥାକବୋ, ମେ କଥା ବଲେ ଏସେଛି ।

—ଲୋକ-ଟୋକ ହବେତ ? ନା କି ତୁ' ଏକଶ ଲୋକେର ସାମନେ ବହୁତାବାଜି କରେ ପଲା ଫାଟିତେ ହବେ ?

—ଆଖା ତ କରଛି ଥୁବ ଲୋକ ହବେ । ହାଟେ ବାଜାରେ ଟୋଳ-ଶତରତ ଦିଯେ ସଭାର କଥା ଆନିଯେ ଦେଓୟା ହସେହେ । ତା' ଛାଡ଼ା ଖାଟ୍-ସମ୍ପାଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରା ହବେ ବଲେ ଆନିଯେ ଦେଓୟା ହସେହେ କି ନା, କାଜେଇ ଲୋକ ନା ହେଁ ପାରେ ନା ।

ଏକେ ତାରାକେ ଆୟ ଚରିଶ ସନ୍ତାର ଜନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ପାଇବାର ନିଶ୍ଚଯତା, ତାର ଉପର ଆୟାର ବଡ଼ ଅମାଯେତ ହୁଏୟା ସଥକେ ଦେବକୀର ଆଶ୍ଵାସ—କାଜେଇ ଆମାର ଆଗାହ କେବଳଇ ବୁନ୍ଦି ପାଇତେ ଲାଗିଲ ।

ବଲିଲାମ : ଏତ କ'ରେ ଯଥନ ବଲ୍ଲ ନା ହୟ ସାଂଗ୍ୟ ଧାରେ ।

—ସେତେଇ ହବେ କିନ୍ତୁ । ବଲିଯା ଦେବକୀ ଦେଦିନେର ମତୋ ବିଦ୍ୟାୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲ ।

ପରଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ସାଂଗ୍ୟ-ଦାଓୟା ମାରିଯା ବେଳା ଏଗାରୋଟାଯ ଗଡ଼ିରାହଟା ରୋଡ଼େର ମୋଡେ ଉପଚ୍ଛିତ ହଇଲାମ ।

ମେଥାମେ ଗିଯା ଦେଖିଲାମ ଦେବକୀର ଭାବ-ପାଶେ ତାରା ଓ ଦୀଢ଼ାଇଯା ଆଛେ । ଶାଦୀସିଦେ ପୋଶାକେ ତାରାକେ ବେଶ ମାନାଇତେଛି ।

ଆମାକେ ଦେଖିତେଇ ଦେବକୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହଇଯା ଉଠିଲ । ବଲିଲ : ଏସୋ ଭାଇ ଏସୋ—ବାଦ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଆର ମୋଟେ ପାଇଁ ମିନିଟ ବାକି ।

ଆୟ କିଛୁ ନା ବଲିଯା ତାରାର ଭାବ ପାଶେ ଗିଯା ଦୀଢ଼ାଇଲାମ । ମନେ ମନେ ଭାବିତେ ଲାଗିଲାମ : ସାମାଜିକ ବିଧି-ନିଷେଧେର ଦୂର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଭାଡ଼ିଯା କୋନଦିନ କି ତାରାକେ ସର୍ବଦାର ସଜ୍ଜିବୀ ହିସାବେ ପାଇବ ?

ଏକଟୁ ପରେଇ ‘ବାଦ୍’ ଆମାଦେର ଲଈଯା ଜ୍ଞାତ ଗତିତେ ଅଗ୍ରମର ହଇତେ ଲାଗିଲ ।

*

*

*

ପଞ୍ଚମ ବାଙ୍ଗାର ଗଣ୍ଡାମେର ହାଟ । ବେମନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ତାର ଚେହାରା ତେମନି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା । ଉଟକରେକ କୁଆକ୍ତିର ମୋଚାଳା ସର ଆଭସନ୍ଧିନ ବିଧବୀ ରମଣୀଦେର

মতো আবাধানে দীক্ষাইয়া ছিল। বেড়ার বালাই কোন ঘরেই ছিল না। গোলদার দোকানের মধ্যে একটিমাত্র মুদীখানা ছিল।

আঁকা-বাঁকা ক্ষেত্রে আইন পথে বাস-স্টেশন হইতে গায় তিন মাইল ইটিয়া-আমরা থখন সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সভায় লোক সমাগম শুরু হইয়া গিয়াছিল।

*

*

*

বক্তা করিতে উঠিয়াছি। দেশী বিদেশী বাঙালীতি সমস্কে জোর গলায় বলিতেছি আর যথর-তথন ফ্যাসীবাদী শক্তি-সমূহের মুগ্ধপাত করিতেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জুলমের সমস্কেও অবশ্য বলিতে হইতেছে। যাবে যাবে করতালিও যে না পাইতেছি এমন নয়।

সঙ্গ্য হইয়া আসিতেছিল। স্বর্য ভূবিতেছে। একটু একটু করিয়া অঙ্ককার হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় আমার দৃষ্টি-পথে এক অস্তুত দৃশ্য বেঁধপাত করিল। যক্ষের উপর হইতে বক্তা করিতেছিলাম বলিয়া দৃষ্টি বহন্ত্রেও যাইতেছিল।

দেখিলাম প্রায় অর্ধ মাইল দূরে দীর্ঘ এক সারি মাঝে দেখা বাইতেছে। আম একটু অগ্রসর হইতেই পরিষ্কার বুরা গেল উহারা প্রাণোক এবং এদিকেই আসিতেছে। ক্রমে সেই কাফেনা আরও মিকটৰ্টি হইতে লাগিল। যমজ-দেহগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল।

ধুলিমলিন শতচিহ্ন চৌরে আবৃত জীর্ণ-শীর্ণ দেহগুলি সমুখের দিকে ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বাতাস উটাদিকে বহিতেছিল। সে বাতাসের বেগ তাহারা সামলাইতে পারিতেছিল না। কাজেই দেহ বুজ হইতে বুজতর হইতেছিল। কাহারও কাহারও মস্তক যেন সম্মুখে মাটির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘদিনের তৈলবিবর্জিত ধুলি-বালি মিশ্রিত কেশে জটা লাগিয়া গিয়াছিল। বিলম্বিত সেই কেশের উপরে কাপড় ছিল না। প্রবল হাঁওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ সেই কেশ ছিস্পত্রের মতো এদিকে-ওদিকে উড়াইতেছিল। জীর্ণ-বাসের অঁচল দেহের একদিকে উড়িতেছিল। কালো তাপ্ত্যর্ণ দেহগুলিতে হাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। উদৱ পিঠের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। স্বধাৰ অঁধাৰ তৃষ্ণদয় শুকাইয়া চামচিকের মতো হইয়া হইয়া জামার ছেঁড়া পকেটের মতো তাহাদের বুকে ঝুলিতেছিল। কাহারও বক্ষে, কোলে বা কাঁধে শিশুও দেখা যাইতেছিল।

তাহারা তবু অগ্রসর হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন একদল সঙ্গীসহ

ଆକା ବୀକା ହଇସା ହାମାଣଡ଼ି ଦିଯା ଅଗ୍ରସର ହଇତେଛିଲ । ଚୋଖେ ଶୁଦ୍ଧ ତାହାଦେର ହିଂଶ କୁଥା ପ୍ରକଟ ହଇସା ଉଠିଯାଇଛେ । ଯେବେ ବୈଶାଖେର ମେବ ଉତ୍ତରେ ଦେଶ ହଇତେ କାଳବୈଶାକୀର ରାପେ ପୃଥିବୀକେ ଗ୍ରାସ କରିବାର ଜଣ ବିପୁଲବେଗେ ଅଗ୍ରସର ହଇତେଛିଲ । ଯେବେ ଛୋଟ, ବଡ଼, ମାଝାବୀ, ମକଳ ପ୍ରକାର ହିଂଶ କାଳୋ, ବିକଟ କାଳୋ, ତାଥାଟେ କାଳୋ, ଶାନ୍ଦା କାଳୋ, ଧ୍ୟକେତୁର ରଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚିତ, ଭିନ୍ନ ଅଗତେର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲୋକେ ଦ୍ୱୀପ ଆଭାପ୍ରାପ୍ତ ଭୌତି-ଜ୍ଵଳକ କାଳୋ ମେଘରାଜି ଟୁକରା ଟୁକରା ହଇସା ବା ସାରି ବୀଧିଯା ସମଗ୍ରୀ ଅଗତକେ ଗ୍ରାସ କରିଯା ସାଥା ବଂସରେ କୁଥା ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଜଣ ଅଗ୍ରସର ହଇତେଛିଲ ।

‘ତାହାରା ଅଗ୍ରସର ହଇତେଛିଲ । ମନେ ହଇଲ ଯେବେ ତାହାଦେର ଦୀର୍ଘ ବାହଣି ଦେହେର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହଇତେ ଆଲଗା କେବଳମାତ୍ର ସାମାଜିକ ଏକଟା ଉପଲକ୍ଷେର ଉପର ଝୁଲିତେଛିଲ । ମହା-ଯହୀକରେର ଶାଖା କାଟିଯା ଦିଲେ କେବଳମାତ୍ର ବାକଳଟା ଯେମନ ଝୁଲିତେ ଥାକେ ତେମନି ଝୁଲିତେଛିଲ । ମିଉଜିଯାମେ ମାହୁମେବେ କକ୍ଷାଲେର ବାହୁ ଯେମନ ଝୁଲିଯା ଥାକେ ତେମନି ଝୁଲିତେଛିଲ । ଆଙ୍ଗୁଳଣ୍ଡିଲିକେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଏକଟା ପେରେକେର ମତୋ ମନେ ହଇତେଛିଲ । ଚକ୍ରବୟ କୋଟିର ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଇସା ଭୌଷଣାକ୍ରତି କୋମ ସମ୍ବିହିତେର ବର୍କ-ଚକ୍ର ବର୍ଗ ଧାରଣ କରିଯାଇଲ । କୁଣ୍ଡିରେର ଦୃଷ୍ଟରାଜିର ମତୋ ତାହାଦେର ଦୃଷ୍ଟରାଜି ଓ ଚୋଯାଳ ଛେଦିଯା ବାହିର ହଇସା ଗିଯାଇଲ ।

ମନେ ହଇତେଛିଲ ଏ ସେବ ଇୟାଙ୍ଗ୍ରେ-ମାର୍ଜନ୍ରେର କାଫେଲା, ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ ତାହାଦେର ଧାରାଳ ଡିସ୍କାଯ୍ ଚାଟିଯା ଥାଇସା ଓ କୁଥା ନିଯୁକ୍ତି କରିତେ ପାରେ ନାଇ, କାହେଇ ଆଜ ଖୋଲା ବିଶେ ବାହିର ହଇସା ପଡ଼ିଯାଇଛେ : ବୃକ୍ଷ-ଲତା-ପାତା, ପଞ୍ଚପଢ଼ି, ମାହୁମ, ସାଗର-ଜଳ, ଏକ କଥାଯ ହୃଦ-ଜଳ-ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେର ଶାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରିଯା ତ୍ରୈ ଇହାଦେର କୁଥା ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ । କୁନ୍ତ ସାଗର ହଇତେ ଉଥିତ ବୃକ୍ଷ ଯେମନ ସମ୍ମୁଖେସ ସବ କିଛୁ ଉଦୟରମ୍ଭ କରିଯା କେବଳଇ ଅଗ୍ରସର ହୟ, ଇହାରା ଓ ତେମନି ପଥେ ଯାହା କିଛୁ ପଡ଼େ ସବହି ଉଦୟରମ୍ଭ କରିତେ କରିତେ ଅଗ୍ରସର ହଇବେ, ଦୟା ଥାକିବେ ନା, ମାଝା ଥାକିବେ ନା, ହିଂସା ଥାକିବେ ନା, ଦୟେ ଥାକିବେ ନା, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଥାକିବେ ନା, ମହୁଞ୍ଜୁଦ୍ଧେର କିଛୁଇ ଥାକିବେ ନା, କୁଥାର ତାତ୍ତ୍ଵ ନୃତ୍ୟ ମାତିଯା ଉଠିଯା ଇହାରା ସମଗ୍ରୀ ଅଗତକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଭାବିକ ଭାବେ ହିମରକ୍ତ ପଞ୍ଚର ନିର୍ବିକାର ଉଦୟରମ୍ଭ କରିବେ,—ଦେଉୟାଲେର ଟିକଟିକି ସେମନ ଯକ୍ଷିକାଣ୍ଡିଲିକେ ନିର୍ବିକାରଭାବେ ଉଦୟରମ୍ଭ କରେ, ଟିକ ତେମନି ନିର୍ଭାସରାମ ଉଦୟରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ବିପୁଲ ଉଦୟା କୁଥାର ହାତ ହଇତେ ତୋମାର, ଆମାର, କାହାର ଓ ନିଷାର ନାଇ ।

‘ବର୍କତା କଥମ ସେ ଆପନି ଧୀମିଯା ଗିଯାଇଲ ତାହା ବଲିତେ ପାରିବ ନା ; ତୁ ଅକ୍ଷେତ୍ର ଉପର ଦୀଡ଼ାଇସା ସମ୍ମୁଖେର ଦିକେ ଏକଦୂଷି ଚାହିୟାଇଲାମ । ଶରୀରେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି

লোম কাটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। যেন একটা শক্তিশালী চুবক আমাকে অঙ্গের উপর আঠক করিয়া রাখিয়াছিল।

সর্প-বিশেষের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার শিকার যেমন নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ধীরে ধীরে আপনি ভক্তকের উদ্বেশে প্রবেশ করে, আমিও ঠিক তেমনি স্ফুর্ত আগমনশীল ঐ মহাশুভ্রপ সরীসৃপ বাহিনীর উদ্বেশে প্রবিষ্ট হইয়ার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছিলাম।

তাহারা আরও মিকটবর্তী হইল। ক্রমে তাহারা সভার একান্ত মিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কতকগুলি অবকক্ষালের মাংসহীন বাহ যেন আপনি সম্মুখে প্রসারিত হইল। ঐ প্রসারিত বাহুর সম্মুখে বাহা পাইবে তাহাই মৃষ্টিবন্ধ করিতে চাহিতেছিল,—যেন বিপুলাকার গলদাটিংড়ি তাহার দীর্ঘ হাতের মধ্যে ঝাঁক করিয়া শিকার ধরিয়া মুখে দিতে উচ্ছত। মনে হইল কোন আহুশক্তিবলে যেন কতকগুলি অবকক্ষাল জীবন পাইয়াছে এবং মহুষসভ্যতাকে গ্রাস করিবার জন্য এইখানে সমবেত হইয়াছে।

হঠাতে এই দানোয়া পাওয়া নয়কক্ষালগুলি একযোগে “খারাক” করিয়া চিংকার করিয়া উঠিসঃ অন্ন চাই! চাল চাই! ধান চাই! মনে হইল যেন একটা প্রকাণ বাশের বাড়ের সবগুলি বাণ একযোগে একটা বিকট “খারাক” শব্দ করিয়া চিরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই বিকট শব্দে আমার চুম্বকের মোহ টুটিয়া গেল। এক বিকট চিংকার করিয়া সভামঞ্চ হইতে লাফাইয়া পড়িলাম এবং উর্ধবাসে জেলাবোর্ডের লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা ধরিয়া ছুটিতে লাগিলাম। মনে হইল এই দোড়ের কৃতকার্য্যার উপরই আমার জীবন-মৃণ নির্তন করিতেছে, পিছু ফিরিয়া চাহিতেও সাহস হইল না, কেবল যেন শুনিতে লাগিলামঃ অন্ন চাই, চাল চাই, ধানের পোলা চাই, ধান চাই। সে শব্দ কানের পর্দা ভেদ করিয়া আমার বুকে যেন হাতুড়ি পিছিতে লাগিল।

আরও আরও উর্ধবাসে ছুটিলাম। আর আর লোকের কথা তখন ভুলিয়া পেলাম, নিজের প্রাণ কি করিয়া বাঁচানো যায় কেবল সেই কথাই ভাবিতে আবিতে ছুটিলাম। আমি নেতা, আমি বজ্ঞা, আমাকে ইহারা গ্রাস করিবেই। মনে হইল কক্ষালগুলি যেন তাহাদের সেই বিকট শব্দ করিতে করিতে আমাকে ধাওয়া করিয়াছে।

আরও আরও উর্ধবাসে ছুটিলাম। আমি নেতা, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। আমার ভবিষ্যৎ আছে। দানোয়া পাওয়া কক্ষালসার দেহগুলি অত্যন্তকাল যথেষ্ট

শাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তাহার পরেই আবার আমাৰ স্থিতি আসিবে।
কাজেই আমাকে আজিকাৰ মতো ইহাদেৱ আক্ৰমণ হইতে বাঁচিতেই হইবে।
বাঁচিতেই হইবে—প্রতিজ্ঞা কৰিয়া কেবলই উৎসৰ্ব্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, আজ পৰ্যন্ত সেই ছুটোৱ নিয়ন্ত্ৰণ হইল না।

ମାମଲା।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଏ ବହୁ ସେମନ ଫସଲେର ଆଗାମ ସମ୍ଭାବୋହ ଦେଖା ଯାଇଁ ତାଁତେ ଆର କାଟି ଥୁବେ ଡାଡ଼ାଙ୍ଗ ଉଠିତେ ହବେ ନା । କ୍ଷେତର ଆଲେର ଧାରେ ଦୀଢ଼ିରେ ଧବଧକେ ସ୍ଵଜ୍ଞ କଟି ଧାନଗାଛଙ୍ଗଲୋର ଦିକେ ତାକିଯେ ଏ କଥାଇ ମନେ ହଲୋ ବଣୀରତେର । ଆର ତାଓ ସହି ହୟ, ଗେଲୋ ହୁଇ ବହୁରେ ଯତ ସହି ଗ୍ରାନ୍ଟ୍‌ବେ ବୌନ୍-ବର୍ଷା ଏସେ ସବ ଡୁବିରେ ଦେଇ, ତାହଲେଓ ତୋ ଏକଥାନା ନୋକାର ଦୂରକାର । ଏ ତଳାଟ ଡୋବା ଦେଶ ବର୍ଷାର ପାନି ଢୋକାର ସାଥେ ସାଥେ ନୋକା ଛାଡ଼ା ଆର ଗତ୍ୟସ୍ତର ଥାକେ ନାଏ ପାମଛା ପରେ ମାଧ୍ୟମ ବୋରା ନିଯେ ଗଲା-ବୁକ ପାନି ଝେଲେ ହାଟ-ବାଜାର କରିତେ ହୟ । ହ'ଟୋ ଭାଲୋ ମନ୍ଦ ଶୋନ, ତବେ ନୋକାଯ ଚଢ଼ । କ୍ଷାର ଏମନ ତେମନ ହଲୋ ଅେ ପାଇୟେଇ ଲାଗାନ୍ତିରେ ତାଇ ବଣୀରତ ଭାବଲୋ, ଏବାର ସେ କରେଇ ହୋକ୍ ଏକଥାନା ନାଓ ତାର କିନିତେଇ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଟାକା ! କମିଲେ କମ ସାଟ ସନ୍ତୁମ୍ଭ ନା ହଲେ ବାରୋ-ତେରୋ ହାତ ଏକଥାନା ଆକାଠେର ନାଓ-ଓ ପାଓୟା ଯାଇ ନା । ଟାକାର ପ୍ରଥମ ଆସିତେଇ ଚୋଥ ଏଦିକ ଓଦିକ ଥେକେ ଯୁବେ ଏସେ ସେବାମେ ଗିଯେ ଧାମଲୋ, ମେଥାନେ ଏକଟି ଶାହଳା ରଙ୍ଗେ ଦାମଡ଼ା ବାଚୁର ଚପଚପ କ'ରେ ଦୂରୀ ଧାସ କାହିଁକେ ଥାଇଛି । ଏଥିମେ କାମାଇ ଦିତେ ଆରୋ ପୁରୋ ଏକ-ଦେଖୁଟି ବହୁ । ତା'ଛାପ୍ରଥମ ସର୍ବ ଗେଲୋବାରେ ଯତ ବଜା ହୟ ଏଲେ ଏକେ ବୀଚାନୋଓ କଠିନ । ହ-ହାତେ ପୋଛର ଦେଓୟା ହାଡିର ଖୁଟି ଟେମେ ତୁଳିତେ ତୁଳିତେ ବଣୀରତ ଭାବଲୋ, ଏହି ପକ୍ଷଟାକେଇ ଛାଡ଼ିରେ ଦେବେ ସେ, ଆର ଏଇ ଟାକା ଦିଯେଇ ଏକଥାନା ନାଓ କିମେ ଆନବେ । ସର୍ବ ସହି ତେମନ ହୟ, ତାହଲେ ଏକ ସର୍ବ ନାଓ ଚାଲିଯେ ଥେରେ ପରେଣ ଅମନଧାରା ଏକଟା ଗର୍ବ ମେ କିନିତେଇ ପାରବେ ।

(କଥା କାଟିକେ କିଛି ବଲଲେ, ତାର ଦାୟ ଥାକେ ନା । ନାନା ମୁଖେ ନାନା ରଥ ନେଇ । ନାନାନ ଜନେ ଅହେତୁ ନାନା ପରାମର୍ଶ ଦିଯେ ନିଜେର ବୁଦ୍ଧିଇ ଗୁଲିଯେ ଦେଇ) ଯବ ଭେବେ ବଣୀରତ ମନେର କଥା କରେକହିନ ଚେପେ ଗ୍ରାଥଲୋ, ତାରପର ଏକହିବ ଲକାଲେ ଉଠେ ବଉକେ ବଲଲୋ : ଛାହର ଗା, ହ'ଟୋ ଭାଲେ ଚାଲେ ମିଶିରେ ଥିବୁଢ଼ି କ'ରେ ଦେଓ, ଆମି କାଶିଲାଧିପୁରେର ହାଟେ ଥାବ ।

ছাহুৰ মা আমে এক গুৰু কেনা-বেচা ছাড়া সেই একদিনের পথ কাশিনাথ-পুৰো হাটে কেউ যায় না। তাই সে চমকে উঠে বশাঃতের মনের উদ্দেশ্ট। জানতে চাইলো : কাশিনাথপুর ? সে হাটে ক্যান ?

বশারত বলতে চেয়েছিল, মেঘেমাহুষের এত খবর নিয়ে দুরকার কি । অস্ত ব্যাপার হলে হয়তো তাই-ই বলতো ! কিন্তু এই গুৰুটা বিজীৱ ব্যাপারে সে এত কঠোৱ হতে পাৰলো না । কেননা গুৰুটা পালন কৰতে যত্ন-আত্মি কৰতে ছাহুৰ মায়েৰ গুৰুটাও কম খাটেনি । তাই সে ধীৰুৰ্বৰে নিৰ্বিবাদে বললো : গুৰুটা বেচে দেব ।

ক্যান, তোমাৰ ঘাড়েৰ 'পৱ রইচে নাকি, তৃষ্ণি ওৱ ধাস-পানি দিছ, যে বেচতে চাও ? বলতে বলতে ছাহুৰ মা কাঠা হাতে চাউল মাপতে এগিয়ে গেল ।

বশারত বললো : বৰ্ধায় চলা-ফেৱা যায় না ; তাই একখানা নাও কিমতি চাই । নাও কিমতি যে টাকাৱ দুৱকাৰ তা কহান খে পাৰ । এটা ছাড়া আৱ উপেক্ষ নাই ।

ছাহুৰ মা একটু অভিযানেৰ স্বৰে বললো : মা আমি চাই না, আমাৰ বাছুৰ তৃষ্ণি বেচতি পাৰবা না । যে কষ্টেৱ বাছুৰ আমাৰ ! নাও দিয়ে আমি কি কৰবো, নায়াৰে যাৰ নাকি বে বান-বৰ্ধায় নাও লাগবি আমাৰ ?

মূখ্যেৰ কথা শেব না হতেই বশারত ধমক দিয়ে উঠলো : (মেঘেমাহুষ তুই, কাজেৰ ধাৰা বুবিসু কি ? যা অত প্যান প্যান কৰিসু না !

সত্যিই তো সংসাদে অনেক কাজ আছে যা মেঘেমাহুষ অত ভালো বোৰে নাই ।)এ কথা ভেবে ছাহুৰ মা চুপ কৰে রইলো । কিন্তু এই গুৰুটা আছে, যাকে ছেলে-পেলেৰ মত কত যত্ন-আত্মি ক'ৱৈ ছাহুৰ মা পালন কৰে, শেষটা আৱ আজ থেকে থাকবে না ! ঐ জায়গাটা শৃঙ্খ পড়ে থাকবে, বেদনাৰ থাৰ্ম থাৰ্ম কৰবে ছাহুৰ মাৰ পৰাণটা । একথা ভেবে মনটা কেবল তড়পাছিল । তবুও থালায় খিচুড়ি বেড়ে দিয়ে ছাহুৰ বিশুকে ক'ৱৈ একটু তেল নিয়ে গুৰুটাৰ শিং ছ'টোতে বেশ কৰে মাথিয়ে দিয়ে এলো । তেল মাথিয়ে ফিৰিবাৰ সময় গুৰুটাৰ চোখ-মূখ্যে দিকে এক নজৰ চেয়েছিল ছাহুৰ মা । আহা, এত বস্ত্ৰে গুৰুটা, এতটুকু ভাবতোই তাৰ চোখ বেয়ে পাৰি এলো । ছাহুৰ মা আৱ ওখানে দীড়াতে পাৰলো না, এক ঘত ছুটে চলে যাবাৰ মত ক'ৱৈই পালিয়ে গেল । তাৰপৰ বশারত ধখন-গুৰুটাৰ দড়ি খুলে টৈনে নিয়ে গেল, ছাহুৰ মা ওহিকে গেলই না । কিন্তু পাৱবে কেন ? কিছুক্ষণ পৱ ছাহুৰ মা

বাবান্দাৰ এসে দীড়িয়ে দেখলো, বশাবত মাঠের পথ দিয়ে গুৰুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে জুত চোৱ তাপিলে লেজ মুচড়িয়ে দিছে, কিন্তু গুৰুটার চোৱ দেন কত আপত্তি। বড়কণ না বশাবত গুৰুটাকে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে উপাশের গাঁয়ের বেত-বনের পথে হাঁয়িয়ে গেল, ততকণ ছাহুৰ মা সেখানে দীড়িয়ে এক ধেয়ানে তাকিয়ে দেখলো। তাবগৰ এক সময় একটা দীৰ্ঘবাস ছেড়ে আৱার নাম নিল।

আবাদ প্রায় সব জাহগায়ই এ সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই বাজাবে গুৰুৰ আৱ তেমন চড়া দাম নেই। লাঙলে জোত না ধাকলে কেউ জিজাসাই কৰে না। বশাবত বলছিল, এই মাঠৰ দেড় বছৰ বয়স, এখনো দীৱ শেষ হয় নাই, বড় হলে গুলাতক উঁচু হবে। পশ্চিমা বাঁড়েৰ জাত—বোগুড়া ষাঁড় ছৱ মাসেই জোংলামো থাবে। আসছে বছৰে লাঙলে জুত্লে হ'টো দামড়াৰ কাম দেবে।

গুৰুটাকে দেখে লোভ তো হয়ই। কেমন খলখলে শৱীৱ, আৱ উচু লস্বাও বেশ। তাই অনেকে হ'চোয়াল ঝাঁক ক'বে কৰ দীতেৰ তা দেখে নিচ্ছিল; আৱ লেজে হাত দিয়ে বলছিল, চোটেৰ আছে বটে। অনেক দামাদামিৰ পৱ রকা হলো পঞ্চান টাকায়। বশাবতেৰ ইচ্ছে ছিল, আৱও কিছু বেশি। কমসেকম বাট টাকা না হলে বেচবে না। কিন্তু নানা লোকেৰ নানা কথায় সে আৱ মৰ্টাকে হিয় বাখতে পারলো না, ঐ পঞ্চান টাকাতেই রাজি হয়ে গেল।

এখন বৈঝৈ মাস ! আৱ কয়েকদিন না গেলে, পানি না ভাসলে নৌকা পাওয়া থাবে না ! তাই বশাবত টাকা কোমৰে খুব ক'বে কৰে বেঁধে বাড়িয়ে পথে পা বাড়ালো। এদিকে আম খুব সন্তা ! একবাৰ ইচ্ছে হৱেছিল, কয়েক হালি আম কিনে বাঢ়ি নিয়ে যাব, কিন্তু কি ভেবে তা আৱ সে কিনলো না। অমনকি কুবা লাগা সৰেও দু'চাৰ পয়সাৰ মুড়ি-মুড়িকি পৰ্যন্ত খেল না। এ টাকা সে ভাঙতে পারবে না। একখনা পছন্দসই আওয়েৰ কি দাম হয় তাৱ ঠিক কি ?

অনেক বাতে বাঢ়ি এলো বশাবত, পানি নিয়ে হাত মুখ ধূলো, খেতে বসলো, কিন্তু এ পৰ্যন্ত ছাহুৰ মা তাকে কোন কথা জিজেস কৱলো না। তাৱ পৱ শোবাৰ আগে বশাবত বধন গাঁট খুলে টাকা বাখতে গেল, তবন ছাহুৰ মা বললো : কৃততে বেচলো ?

: 'হই কুড়ি পনৰ।

তিনি কুড়িও হলো না ? এমন সোনার বাছুরটা !

মুখ দেখে তো আর দাম হয় না, কাম দেখে দাম। জাঁজে জোঁকানো
থাকলে ওর চেয়ে অনেক বেশি হতো !

ঐ পর্যন্তই । গুরুটাকে নিয়ে আর কোন কথাবার্তা হয়নি । যক্ষ দেমন
পাহারা দেয়, পানি না আসা তক বশারত তেমনি ক'রে টাকাঞ্জলো পাহারা
ছিল, এক পয়সা এদিক-ওদিক করলো না, শেষে যদি সামান্যর জঙ্গে ঠেকে
নাও কেনা না হয় । ।

আবার মাসে নালা ডোবায় পানি আসতেই গাঁয়ের ছলিমকে সাথে নিক্ষে
বশারত বাদাই হাতে গেল নৌকা কিমতে । উখানে হাতের ভাঁজে দূর-
দূরাস্তর খেকে নালা চংয়ের নালা মাপের তৈরী নৌকা মিজীরা নিয়ে আসে
বিজীর জঙ্গে । টাকা হলেই পচন্দসই নৌকা পাওয়া যায় । সারাদিন ধরে
রোকা পচন্দ আর দামাদামি হলো । কিন্তু কি যে কাণ্ড, পচন্দ হলে দামে
কুলায় না, আবার দামের মধ্যে এলে মোটেই পচন্দ হয় না । দুই-তিনি সাল
পুরানো, নয়তো আকাঠের তৈরী, ছান্দও ঢিলা-ঢালা । বশারত মনে মনে
খুব ঘৰাড়ে গেল । শেষে বুঝি নৌকা না কিনে থালি হাতেই বাড়ি ফিরে
থেতে হয় । অবশ্যে কে একজন দূরে জেকে নিয়ে কানে কানে বললো,
আসেন পচন্দসই, নাও দিছি । সত্যই পচন্দ মাফিক । গড়ন ভাল, কাঠও
আকাঠা নয়, জাত কাঠ, তাও একেবারে সারে তৈরী । একসাল মাত্র
পানি পেয়েছে । দামাদামিও বেশি করতে হলো না । বশারত বুবলো,
লোকটাৰ খুব গৱজ । চলিশ, পঞ্চতাঙ্গিশ, শেষে পঞ্চাশে কিনে ফেললো
বশারত । মনে মনে ভাবল, কমসেকম বিশ-পচিশ জিতেছি ।

নৌকা ঘাটে এনে বাঁধতে রাত হলো আয় এক গ্রহণ । তবুও ছান্দুর যা
খবৰ পেয়ে বিশুকে ক'রে তেল এমে নৌকার গলুইতে মাথিয়ে নৌকা বৱণ
করলো । মনে মনে আঞ্জার নিকট ঘোনাজাত জানালো—আয় আজা,
এ নায় যেন বৱকত হয় ।

নৌকা কিনে আনবাব পৱ থেকে আজ কয়েকদিন বশারত প্রায় বাড়িতে
আসে না । শুধু নৌকা বেয়ে বেয়ে এখানে-ওখানে মনের আনন্দে বেড়িয়ে
বেড়ায় । যতটুকু সময় বা বসে, তাও দেখ, ঐ নৌকা ঘাস জাবা দিয়ে ঘৰে,
মেঝে সাফ-সাফাই কৰছে । ছোট বেলা থেকেই একখানা নৌকার জবৰ-
শখ ছিল বশারতের । কতজনের নৌকা চাইতে গিয়ে কত গালি মন্দ শুনেছে ।
কারো একখানা ভালো নৌকা দেখলেই শোভাতুর নয়নে তাকিয়ে থেকেছে ।

আহা, এমন একখানা নৌকা থাই তার হতো। গামছা পরে গলা-যুক-গালি
ভেডে পায়ের লগি ঠেলতে ঠেলতে কত দূরের পথ সোনাতলির হাট করেছে,
বাহির মাঠ থেকে জল ডোবা ধান কেটে মাথায় বয়ে এনেছে, আর একখানা
নৌকার জঙ্গে মনে মনে কত আহাজাজী করেছে। আজ তার নিজস্ব একখানা
নৌকা হয়েছে তাই মনে মনে তার কত গর্ব। বর্ষার কষ ঝীৰে আর পোহাতে
হবে না। এসব কথা ভাবে আর লগি দিয়ে নৌকা বেয়ে কল কল ক'রে
এগিয়ে যায় বশারত।

সেদিনও অমনি ঘাছিল, হঠাঃ গাঁয়ের চৌকিদার তোফেল ডাক দিলঃ
ও বশারত, বলি শোন।

প্রথম দুই-তিন ডাক শুনতেই পায়নি। তারপর তোফেল যখন চিৎকার
করে ডাকলঃ বশারত—ও বশারত, শুনতে পাচ্ছু না—নাকি কথা কানে
যায় না? নাও ভেড়াও এখানে।

বশারত ডাক শনে ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর দেখিলো, তোফেল চৌকিদার
সাথে একজন সিপাই, আর একজন ঘেম কে। মনে মনে ভাবলো, এইরে
সেরেছে, এবার হয়তো ব্যাটার্ডের কোথায় কোন পাড়ে নাখিয়ে দিয়ে আসতে
হবে। নাওখানা পায়ের কানায় একদম অষ্ট ক'রে রেখে যাবে। এ ভেবে
বশারত নৌকা বাইতে বাইতেই জবাব দিলঃ শুয়ু নাই ভাই, হাটের বেলা
হয়া আ'লো, হাটে যাতি হবি।

তখন সিপাইজী হেকে উঠলেনঃ ধাম ব্যাটা। বলি লাট সাহেব হইছিস
মে, কথা শুনবি না।

এরপর আর না ধেমে উপায় থাকে না। বশারত দুই ঠোট শুন নেড়ে
বিড় বিড় ক'রে কি বলতে বলতে নৌকা এমে ডাঙৰ লাগিয়ে দিলো।

তৃতীয় ব্যক্তিটি চেঁচিয়ে উঠলোঃ এই নাও-ই আমাৰ হছুৱ।

সিপাইজী বললেনঃ তোফেল বাঁধো ব্যাটাকে। ব্যাটা চোৱ কাহেকার,
এই গৱীৰ মাহুষটাৰ নাও চুৱি করেছ শালা। যাও এখন, খন্দৰ বাঢ়ি থেকে
সুবে এস ছয় মাস—বছৰ।

বশারত কিছু বুবতে না পেরে হতভয় হয়ে সিপাইজীৰ মুখের দিকে চেয়ে
রইল কতক্ষণ। তারপর বললোঃ মেকি হছুৱ, নাও কিনে আবছি, বাদাই
হাট ধে, এক ধোকে দুই কুড়ি মশ টাকা ওপে দিছি হছুৱ। সাক্ষী আছে
ছলিয়। আমাৰ চৌক শুষ্টিতে কেউ চোৱ নাই, এমন যিছে চুৱিৰ বদনাম দিলি
জহুৰ থাক্কা জান দিব হজুৰ।

ৰাণি আছে ?

ইয়া, চিটও আছে হচ্ছে । চলেন বাড়ির পৰ দেখাচ্ছি । সত্যিই এক গতি ভেঙচিটে কাগজে লেখা আছে—“মজিমদি শেখ, বাপের নাম বেরামদী শেখ সাকিন মামুদপুর । দুই কুড়ি দশ টাকা বুবিয়া পাইয়া থৃণু খোসালীতে এই নাও বিক্রী কৱিল ।”

নৌকাওয়াগা দানেজ মণ্ডল বললোঃ কাঁৱ নাও, কে বেচে ! তা'ছাড়া মামুদপুর সাকিমে নজিমদিন শেখ বলে লোকই নাই । আপনি তদন্ত ক'বৈ দেখতে পারেন, এ চিট জাল ।

ছলিম পুলিশের থবৰ পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে । অসব হচ্ছত হাঙামের মধ্যে নেই । ওৱ নাম পুলিশের বাবা, বশারতের সাবে ঘোঁগ আছে বলে চালান ক'বৈ দিতে কতক্ষণ ! তাই সাক্ষী পাওয়া গেল না । বশারত নৌকাসহ ধানায় চালান হয়ে গেল ।

দানেজ মণ্ডল কানুতি মিনতি জানালোঃ নাওখান দিয়ে দেন হচ্ছে ।

থানার দারোগা বাবু বললেনঃ তা হয় না । যতদিন কেস ফয়সালা না হয়, ততদিন নৌকা থানার হেফাজতে থাকবে ।

বশারতকে সদৰ হাঙতে পাঠিয়ে ঢারোগা সাহেব মামুদপুরের মজিমদি শেখকে ধৰার হুম দিলেন । কোথায় কে নজিমদি শেখ । মামুদপুরে কেন, আশপাশ আৱ দশ গীয়েও এমন লোকের হস্তি মিলছে না, কেসেরও কোনো হালা-গোছা হচ্ছে না, বশারত হাঙতে পচে যৱছে । যে নৌকা নিয়ে এত, সে নৌকা থানা-ঘৰের সামনে রোহে শুকাচ্ছে । ছেলেমেঝেরা নৌকার মধ্যে খেলার ঘৰ তৈয়া ক'বৈ ধূলো-বালি ভাঙা বাসন-পত্র—ৱাজ্যের সব কত কিছু জয়া ক'বৈ খেলাৰ-আসনৰ জয়ায় ! কোনো কোনো বাতে হয়তো কোনো বিৱৰণী সিপাইজী নৌকার গলুৰের উপৰে ব'সে তাৱ প্ৰেমিকাকে স্মৰণ কৰে গাই গায় ।

মামলাৰ থখন দিন পড়ে দানেজ মণ্ডল এই পথে সদৰে যাব । আসবাৰ-বাবাৰ পথে প্ৰথমে রাস্তাৱ দাঢ়িয়ে অপলক নয়নে নাওখানাৰ দিকে তাকাব । তাৱ দুৱবহাৰ লক্ষ্য কৰে । দু'খানা মাথা-কাঠ দু'দিকে ঝুঁকে গেছে, আগ়া নাওখেৱ গলুইটা দিচেৱ দিকে বেঁকে ঝুলে আছে । ধূলো-বালিতে সে চকচকে কাঠ আৱ চকচকে নেই । কত বছৰেৱ পুৱানো যনে হয় । কি মনে ক'বৈ সে একবাৰ খেলাৰ দিকে তাকাব । তাৱপৰ অঞ্চলায় বেয়ে এসে কাঁধেৰ গামছাখানা দিয়ে ধূলো-বালিটা বেড়ে-বুড়ে সাফ-সাফাই কৰে দেৱ । লক্ষ্য কৰে, বোবে বোদে তক্কাঙ্গলো চড় চড় ক'বৈ ফাটছে । তাপৰৱ অঞ্চলেৰ

ধাৰ থেকে ছইৱেৰ একটা পুৱাৰ ভাঙা গাত্তি কুড়িয়ে নিয়ে পাশেৰ খাল থেকে পানি এনে বৌকাৰ উপৰ ছড়িয়ে দেৱ আৱ বলে : তোৱ গাও-গতৰটা একেবাৰে পেলৰে। কিষ্ট আমি কি কৰতি পাৰি, আমাৰ যে ক্ষমতাৰ বাইৱে। গাছেৰ একখনা ময়া ভাল ভেড়ে এমে গলুইটাকে টেনে সোজা কৰে প্যালা দেয়, তাৱগৰ বেলাৰ দিকে তাকিয়ে দেখেই হন হন ক'ৰে সদৰ মুখে ইাটতে থাকে। এখনো সামনে দশ বাবো মাইল পথ।

বৰ্ষা গিয়ে শুকনা কালও যায় যায় প্ৰায়। ঘোকদমা শুধু দিন পড়ে পড়ে পিছায়। এবাৰে দানেজ মণ্ডল গিয়ে আগেই নিজেৰ মোকাবকে ধৱলোঃ হছুৱ, দয়া কৰে মামলাটাৰ একটা ফয়সালা ক'ৰে দিন। যে মাওয়েৱ জিঞ্চ মামলা সে না ও তো পৰায় শ্ৰেষ্ঠ হয়ে গেছে।

মোকাবাৰু বলেন : আৱে বল কি ঘোকদমাৰ ফয়সালা কি আমাৰ হাতে নাকি ? তা'হলে তো কৰেই হয়ে যেত। যা হোক, আৱ দেৱি নাই হই-একটা তাৱিধেৰ মধ্যেই রায় হয়ে থাবে। ঘোকদমা তুমি পাৰে। ও ব্যাটা নিৰ্ধাত জেলে থাবে।

দানেজ বলে : আৱও দুই একটা তাৰিখ ? মামলা পাইয়া আমাৰ দৱকাৰ নাই হছুৱ, মামলা আপনি ওকেই দিয়ে দেন, তবু শিগ্ৰিৰ ফয়সালা হোক, মাওখনা তা হ'লে হয়তো বীচতো। আমাৰ বড় শখেৰ মাও হছুৱ— একেবাৰে মিছমাৰ হইয়া গেল।

মোকাবাৰু বলেন : আজ্ঞা না-বুঝ পাগল তো। ঘোকদমা ওকে দিয়ে তো তুমি হাজিৰ হও কেন, গৱহাজিৰ থাক, আপনিই ও পেংয়ে থাবে।

দানেজ এ কথাৰ পৰ অনেক কিছু ভাবলো, তাৱগৰ এক সময় যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে পথ ধৰে মীৱবে ফিরে গেলো।

নিৰ্দিষ্ট সময়ে ডাক পড়লো—দানেজ মণ্ডল হাজীৰ। কোথায় দানেজ মণ্ডল ? কোন পাতা নেই : বাদীই নেই, তাৱ আৰাম ঘোকদমা কিসেৰ ? হাকিয়েৰ কলমেৰ এক খোঁচায় মকদমা ডিসমিস।

‘বশাৱত কিছু বুঝতেই পাবলো না, ঘোকদমাৰ কি হলো। সে যে খালাস পেয়ে গেলো সেইটৈই বড় কথা, অত বুঝে দৱকাৰ কি ? ছয়মাস হাজৰত খেটে সে বশাৱত আৱ বশাৱত নেই ! চেনাই যায় না এখন। পাগলেৰ মত চেহাৱা।

ধাৰার কাছে পৌছতে পৌছতে আয় বিকেল হয়ে এলো। ধানা-বাঢ়িৰ নিকটে এসে কেবল ভাবছে মাওখনাৰ একটু খোঁজ নিয়ে থাবে নাকি, তাৱতেই

যাথা তুলে সাথনে তাকিয়ে দেখলো, কে একজন লোক একথানা না ও যবে মেজে
সাফ-সাফাই করছে ! বশারত এগিয়ে গেল। এই তো সেই লোক, সেই
দানেজ মণ্ডল, কোটে কৃতব্যার সাক্ষাৎ।

দানেজ চমকে উঠে বশারতের দিকে ধাঢ় উঁচিয়ে চাইলো, তারপর বললো:
মাওখান সাক সাফাই ক'বে দিয়ে গেলাম ভাই, রোদে রোদে তজাঞ্জলো ফাটে
ফাটে বিছিরি হ'য়া গেছে, গন্তুইটা ভাণে গেছে। মিস্তিরি দিয়ে সারিয়ে
পঁয়ব-গোবর দিয়ে নিও। তাইলি দশ-পানিতো চলবি। এর মধ্য শুভ্র
আপন্তির কথা বলবি না। জাত কাঠের নাও, তা ও আবার সারাঙ্গ, আকাঠের
কিছুই নাই।

বশারত ঈ। ক'বে তাকিয়ে যেন দানেজ মণ্ডলের কথাঞ্জলো গিললো প্রথমে।
তারপর নৌকার দিকে এক ধেয়ানে তাকিয়ে রইলো। নৌকার অবহা দেখে
দানেজ মণ্ডলের বত্ত-আস্তি দেখে চোখ বেয়ে তাৰ পানি এলো। সে বললো :
যামলা আমি পাইছি ভাই, কিন্তু না ও যথন তোমার হক্কেৱ, তথন এ নাও তুমিই
নেও, আমি চললাম। এ বলে সে কিৰে যেতে লাগলো।

দানেজ মণ্ডল লাক দিয়ে উঠে দাঢ়াল, তারপর বশারতকে ফেরাতে ক্রত
পঁয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললো : না, না, ভাই না, তা হয় না।

বৃষ্টি

আলাউদ্দিন আল আজাদ

(বৃষ্টি নামবে। দ্বিংশ শিল্পির হোঁয়া বসন্ত রাত্রে মক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল ধরা শুকনো মাঠ আৱ পাতা-বৰা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অভিস্রে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এৱ পৰ গৰ্জনে বজ্জে বিদ্যুতে ছিৱতিল হয়ে থাবে সাৱাটা আসমান, মঙ্গলমুখ্যার মতো অজ্ঞ ধাৱায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালাপালাঙ্গলি কঢ়ি পাতায় ভৱে উঠবে, সাৱা শামাৰ ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুৰের রোদে পাট খেতেৰ চাৱা বাছতে গিয়ে শৰীৰ থেকে হয়তো দুৰবৰ কৰে ঘাম ঝৱবে, কিন্তু তাতে আসবে না একটুকু ঝাপ্টি। কেৱলা, অনুম কসলোৱ খোঁয়াও প্রাবনেৱ মতো যিশে থাকবে বজ্জেৱ বিদ্যুতে বিদ্যুতে।)

(কিন্তু সে বছৱ এসব কিছুই হল না। ফালুন চলে গেল, উত্তৰ দিকটা কিঙ্গিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চললো, আকাশে দু'একদিন শুক শুক আওয়াজ হল, খোঁট হয়ে রাইল সাৱাটা প্ৰকৃতি, কিন্তু এৱ বেশি কিছুই নহ।)

(এৱ পৰ এলো বৈশাখ। আৱ এখনও সূৰ্য আগন্তৰে ফুলকি উড়িয়ে তৌৰ তেজে জলতেই লাগল, মাটিৰ বুক চিৱে মাথা উঁচিয়ে-ওঠা পাটেৰ চাৱাঙ্গলি আন্তে আন্তে কুকড়ে গেল। ওপৰে থা-থা শৃঙ্খল, বীচে আদিগন্ত মুক্ত স্বদূৰ, তাৰও বীচে বাঘবন্দী নকশাৰ মতো জিঞ্জলি রোদে-পোড়া, বিৰ্বৰ। দুপুৰ বেলা খেতেৰ আনেৱ ওপৰ গিয়ে দীড়ালে কলজেটা সহসা ছাঃ কৰে উঠে। বলসানো তামাটে ভিজ্বা বাৰ কৰে সাৱা মাঠটা ভাইনীৰ মতো হী কৰে আছে। জগন্ত কৃতা নিয়ে সে নিজে বুকেৰ শিশু-শস্ত্ৰকে প্ৰাপ্ত কৰেছে, আগামী বছৱ যে গুৰু নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।)

কিন্তু কেন? এৱ পিছনে বিশ্ব কোনো গুৰুত্ব কাৰণ আছে। সেদিন জুনী নামজ্বেৰ পৰ আলোচনা উঠল। যিদৰেৱ কাছে দীড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,—বেৱাদৱানে-ইসলাম! আমি অধম বাল্বা, আপনাদেৱ খেমতে কি বয়ান কৰিব, আপনাৱা সব বিদ্যয়েই ওয়াকিফহাল।

କିତାବେ ଆହେ ଖୋଦାର ଗଜବ ନାମେ ତଥବି, ସଥି ହୁନିଯା ଶୁଣଗାରିତେ ଭଲେ
ଯାଏ । ଆମରା ଏବଂ କି ଦେଖିଛି ? ନା, ଛେଲେ ବାପେର କଥା ଶୋନେ ଆ-
ଜ୍ଞାନାମା ବେ-ପର୍ଦୀ, ଚୁରି-ଭାକାତି ବଦମାସେପିତେ ହୁନିଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁଥେ । ଏହିକେ
ଆମାଜ ନେଇ, ଯୋଜା ନେଇ, ହଜ୍ ନେଇ, ଆକାତ ନେଇ । ଆଜ ଚଳୁନ, ଆମରା
ତୀର ଦୟବାରେ ଜ୍ଞାନ-ଜ୍ଞାନ ହେଁ କୀଟି । ମାଠେ ଗିରେ ସବାଇ ହାତ ତୁମେ ମୋନାଜାତ
କରି, ତିନି ରହମାତର ରହିମ, ଇଚ୍ଛା କରଲେ ଏକଟୁ ଦୟା କରତେଓ ପାରେନ ।

ମୋଲାନା ସାହେବେର କଷ୍ଟସବେର ଶୁଣ ଗନ୍ଧିର ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗେ ପାକା ମସଜିଦେଇ
ଭିତରଟା ଗମଗମ କରତେ ଲାଗଲ । ମସଜିଦେଇ ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଉଠେ ଦୀଢ଼ାଲେନ ହାଜି
କଲିମୂଳାହ । ଧୂତନିତେ ଏକଞ୍ଚ ଶାଦା ଦାଡ଼ି, ମାଥାଯ କିଣି ଟୁପି, ନାମାଜ ପଡ଼ତେ
ପଡ଼ତେ କପାଳେର ଘାବଧାରଟାଯ ଦାଗ ପଡ଼େଛେ । ତିନି ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଧାକରାନ୍ତି
ଦିଲେନ, ପରେ ଆବେଗକଷ୍ଟିତ ଗମାଯ ବଲତେ ଲାଗଗେନ, ମୋଲାନା ସାହେବ
ଯା ବଲବେନ, ତା ଅବଶ୍ଯଇ ଆମରା ପାଲନ କରବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍ଗେ ଏକଟି
କଥା ସକଳେର ମନେ ବାଖତେ ହେବେ, କୁ-କର୍ମେର ବିଚାର ଚାଇ । ଏହି ଅନାବୃତି
କେବ ହଲ, ଆପନାରା ଭେବେଛେ କି ? ଖୋଲାଥୁଲି ବଲତେ ଗେଲେ, ବିଶ୍ଵଫୁଲ
କୋନୋ ମେଯେ ଅବୈଧଭାବେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଁଥେ, ତୌବା ଆନ୍ତାକଫେରୋଜା ।
ଏହି ଅକଳେ, ଆଶେ ପାଶେର କୋନୋ ଗ୍ରାମେ ଅଧିବା ଆମାଦେଇ ଗ୍ରାମେରୁ
ହତେ ପାରେ । ଏହେବା ତାଙ୍କୁ କରେ ବାର କରତେଇ ହେବେ, ନଇଲେ ଏହି
ଆଜାବେର ହାତ ଥେକେ ଛାଡ଼ା ପାଓୟା ଯାବେ ନା । ଏହେବା ହୁବ୍ରା ମେରେ ଠାଣ୍ଡା
କରତେ ହେବେ ।

ଡାନ ହାତେର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦାଡ଼ିତେ ଏକବାର ଚାଲିଯେ ଗରମେ କାପତେ କାପତେ
ବସେ ପଡ଼ଲେନ ହାଜି କଲିମୂଳାହ । ତୀର ସଗଜେର କୋଷେ କୋଷେ ସତ୍ୟକାରେଇ
ଅପରାଧକେ ଝଁଝେ ପାଓୟାର ଭାବନା ।

ହପୁରେର ଝାଁ ଝାଁ ବୋଦ୍ଦୁରେ ଝୁଟିବଳ ଖେଳାର ମୟଦାନେ ସେବିନ ‘ମେଦେଇ ଆମାଜ’
ହୋଇଥାଏ କଥା, ତାର ଏକଦିନ ଆଗେଇ ଅନ୍ତରେ ପଡ଼ଲେନ ଶୁଣ୍ଟି ମୋଲାନା ମହିଉଦିନ ।

ଆମାତେ ଇମାମତି କରବାର ଅନ୍ତ ହାଜି ସାହେବକେ ଗ୍ରାମେର ତରଫ ଥେକେ
ଅନୁରୋଧ କରା ହଲ । ପ୍ରଥମେ ବିମୟ କରଲେଓ, ସକଳେର ଥେବମତେ ପରେ ବାଜି
ହଲେନ ।

ସେବିନ ଆମାଜ ଶେଷ ହୁବ୍ରାର ପରେ ପଞ୍ଚିଯ ଥେକେ ପୂର୍ବଦିକେ ମୁଖ କରେ
ଦୀଢ଼ାଲେନ ହାଜି କଲିମୂଳା, ବହୁମ ଚାଉନି ବୁଲିଯେ ଦେଖଲେନ ହୁନିଯାଟା ଏଥିମୋ
ଜିନ୍ଦେଶୀର ଅଧୋଗ୍ୟ ହେଁ ଓଟେନି, ଏଥିମୋ ଡାକ ଦିଲେ ଆଲେମୂଳ ଗ୍ରାମେର ହୁବ୍ରାରେ
ହାଜିଯା ଦିଲେ ହାଜାର ଲୋକକେ ପାଓୟା ଯାଏ । ତିନି ଚେଯେ ରହିଲେନ, ଆଜା

দেখলেন অগশিত টুপির শোভা, হোক না সেওলি তেল চিটচিটে অথবা হেঁড়াধোঁড়া। খোলা প্রাঙ্গনে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুরা: হ'হাত তুলে দুরাজ গলায় উচ্চাবণ করতে সাগলেন, ‘ইয়া আশ্বাহ, ইয়া বাবে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর তোর বান্দাদের। তুই আসমান-জমিন, চান-স্কুজের মালিক, তোর আঙুলি হেলনে সাগৰ দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, অহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেষ দে, পানি দে, ছাওয়া দে, শাস্তি দে, তুই !’

‘আশ্বাহয়া আমিন ! আশ্বাহয়া আমিন !’ সারা জামাত জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুরাৰ শাদা দাঢ়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেন্দে জাৰ-জাৰ হয়ে তিনি দোয়া খতম কৰলেন, ‘সোবহানা কাৰাবীল রাবীল ইজ্জাতে আশ্বাইয়াসমেফুন, আস্মালামু আলাল মুসালিনা, আশহামহ লিঙ্গাহে রাবীল আলামিন !’

এইভাবে একদিন, দুদিন, তিবিনি যয়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলে-বুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল কুকড়ে ধাওয়া থামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা এক মাঘের এক পুত্রের গায়ে চূম কালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলা ব্যাং আৱ বিষক্টালিয় গাছ রেখে রাতের পৰে রাত মেঘখেলা খেলে, মদীৰ ধারে সিঁজি বেঁধে কলাপাতায় ফকিৰ-ফাকিৰকে থাওয়াল। তাদের ধাড়ে ব্যথা হয়ে গেল ওপৰের দিকে চে়ে, থাকতে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ চুয়ানো কাক-চকু নীল, এক থগু মেঘের আভায় দেখা গেল না।

মগবেৰের মামাজেৱ পৰ পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুরা, তাৰ চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছাঁচ। গভীৰ ভাবনাৰ কাৰণ আছে বইকি ! স্বতোৱ চোৱাকাৰবাৰ থেকে বে কৰেক হাজাৰ টাকা পেয়েছিলেন তাৰ অৰ্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনাৰ বন্দৰে, বাকি অৰ্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ কৰতে না পাৱলে গুদাম কেনাৰ ফাৰদা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আৱ কী হয়। অথচ এ বছৰও গুদামটাকে ভিজে ব্যবহাৰ কৰতে পাৱলৰেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে স্বভূলি জমি নিজে চাৰ কৰেছেন। এখনটাৱই হয়েছে চৰম বোকায়ি। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজাৰ

দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত ; কিন্তু মুনি-মজুর ও জমিদারক করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-বিড়ি পর্যন্ত পয়সা-কড়ি কম ধৰচ হয় নি, ভবিষ্যতে আরো হবে, অধিক এবিড়িকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

স্বতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেন নি। গত বছর হাঁওয়া-পাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ করে এসেছেন ; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের আয়মেলাতে নিজেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমি-জমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেষ্টে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সং-অসং-এর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে সাম-খয়রাত করলেই হল।

জামানার বাইরে থেকে আয়ের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশবাড়ে শালিকের কিটির-মিচির অনেকটা ঘনীভূত। তমবিহুর গুটগুলি চঞ্চল হয়ে শুরুহে হাজি কলিমুল্লার আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মন্তা জমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুণ ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল,—‘মিয়া সা’ব এখানে ? মসজিদে ধান নি ?’

‘না শবীরটা খুব ভালো নয়।’ হাজি সাহেব শুরু মুখের দিকে চেঁরে বললেন,—‘তা’ ছাড়া তোর গিপ্পি মা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।’

দিয়ে পথেরো হল নতুন গিপ্পি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনবাব তাৰিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বোকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্তুকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তা ও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্তুকে বেলার দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্তু মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তাৰ মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদাই কুদুরত, কাৰ সাধ্য তাৰ কিমারা কৰে ? তিনি কগালে যা লিখে রেখেছেন. ‘তা’ একদিন ফলবেই। গতবাব যখন হজে যাচ্ছিলেন, তাৰ মাসখানেক আগে স্বাই ধৰে বসলো, এমন সোনার সংসাৰ, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

କିନ୍ତୁ ପାତ୍ରୀ ? ସରଲେ ଥାଟ ଫୁଲୋ ହତେ ଚଲିଲ, ଏଥିମ ହାତେ ଧରେ କେ ନିଜେରେ
ଦିଲେ ଥାବେ ?

‘ହାସାଲେନ ହାଜି ସାହେବ, ହାସାଲେନ ! ଆପନାର କିମା ପାତ୍ରୀର ଅଭାବ ?’
ଯଜୁ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରିତେ ହାତ ବୁଲିଯେ ବଲିଲେ,—‘ଆପନି କ’ନ ସେ ବିଯେ କରିବେନ,
ଆମି ପାତ୍ରୀ ଠିକ କରେ ଦିଲିଛି ! ତାଓ ସେମନ ତେମନ ବର୍ଷ, ଏଥିମ କଞ୍ଚା ଦେବ, ଚୋଥେ
ପଳକ ପଡ଼ିବେ ନା ।’

ହାଜି କଲିମୁଣ୍ଡାର ଚୋଥେର ତାରା ଛଟୋ ଖୁଶିତେ ଚକ୍ରକ୍ର କରେ ଉଠିଲ । ଏକଟା
ଅଜ୍ଞାନ ଅହର୍ଭାଗିତେ ତାର ହୃଦ୍ଦିଗୁଡ଼ିଟା ଧୂକୁଧୂକ କରିଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ବାଇରେ, ଆଗାମୋଡ଼ା
ମାନ ହେଁଇ ବିଲିଲେନ, ଆଗେକାର ମହାରମିନୀଦେର ସ୍ଵତି ଏତୋ ଶିଗଗିର ଭୁଲେ ଥାଓଇଲା
ଉଚିତ ନାହିଁ । ତିନି ଏକଟା ଢୋକ ଗିଲେ ବଲିଲେ,—‘ଦେଖୁନ, ତିନିକାଳ ଗିଲେ
ଏକକାଳେ ପଡ଼େଛି, ଏଥିମ ଆମୋଦ-ଆହଳାଦ କରାର ସମସ୍ତ ନାହିଁ । ସରେଇ ତଦାରକ
ଆର—ଆର ଆମାର ଫାଇ ଫରମାଇଶଟା କରତେ ପାରିବେଇ ହଜାର ।’

‘ତାତୋ ବୁଝିଲାମ ।’ ଯଜୁ ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତି ଦେଖିଲେନ,—‘ଭାଙ୍ଗ-ମାନ୍ୟେଓ କାଙ୍ଗ
ଚଲେ, ଆବାର ମତ୍ତନ ନାହିଁସେ ଚଲେ । କିନ୍ତୁ କୋନ୍ଟା ଆମରା ଚାଇ ! କୋନ୍ଟା ଦିଯେ
ଗାଂ ପାଡ଼ି ଦିଲେ ସୁଧ ?’

ଏବଗର ସାତକାନି ଜମି ସାଫ-କାଣଳୀ କରେ ଦିଲେ ସେ ପାତ୍ରୀ ଠିକ ହେଁଇଲ,
ମେ ଯଜୁ ପ୍ରଧାନରେଇ ଯେବେ-ଯେବେର ନାତନୀ । ବସେମ ଏକୁଥ-ବାଇଶ ବହର ହବେ ।
ଏ-ଦେଶେର ଯେବେରା କୁଡ଼ିତେଇ ବୁଡ଼ି ହସ୍ତ ମେ-ହିସେବେ ହାଜି ସାହେବେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା
ମୋଟେଇ ବେଶମାନ ହସିଲି !

ରାଜ୍ଞାଘରେ ହାଜି ପାତିଲ ଗୁଛିଯେ ଜୈଶୁନ ଏଲ । ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାସ୍ତିର୍ଦେବ ସଙ୍ଗେ
ଏକଟା ପିଂଡି ଟେଲେ ନିଯେ ବସଲୋ । ହାଜି ସାହେବେର ଗୁଜିକା ତଥିନୋ ଶେବ
ହସିଲି । ମୂର୍ଖର ବିଡ଼ବିଡ଼ ଧାନିକକ୍ଷଣେର ଜଣ୍ଠ ଧାଇସେ ତିନି ଜିଗଗେସ କରିଲେ,
—‘କିରେ କିଛୁ ଖବର ଆଛେ ?’

‘ଜୈଶୁନ ବଲିଲ,—‘ଆଛେ ।’

‘କି ଶବ୍ଦି !’ ତଥିବିହର ମାଲାଯ ଆଙ୍ଗୁଳ ଧେମେ ଗେଲ ହାଜି କଲିମୁଣ୍ଡାର,
ତିନି ଉତ୍ସର୍କ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଚାଇଲେନ । କାଙ୍ଗ-କର୍ମର ଫାକେ ଫାକେ ଗୋପନ ଖବର
ଜଣାଇବାର ଜଣ୍ଠ ତିନି ଜୈଶୁନକେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛିଲେନ, ଆର ସେଜଣ୍ଠିଇ ଏହି
ଆଗ୍ରହ ।

‘ଆମି ଆଜ ଗିଯାଇଲାମ ବାତାସୀର କାହିଁ । ଗିଲେ ଦେଖି, ମେ ତାର
ବାସିଟାର ଜଣ୍ଠ ଆମପାତା ପାଇଛେ । ଆମାକେ ଦେଖେଇ ମେ ନାମାନ କଥା ବଲିଲେ

ଲାଗଲ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଚେଯେ ରଇଲାମ ଓ ଶ୍ରିଲେଖ ଦିକେ ।' ଦରଜାର ଏକବାର ଚେଯେ
ନିଯେ ବୈଶ୍ଵନ ବଳ, —' ଓ ତଳପେଟ୍ଟା ବେଶ ଫୋଳା ମନେ ହଲ ।'

ହାଜି ଚିନ୍ତିତଭାବେ ଜିଗଗେମ କରିଲେନ, —' ଓ ଜାମାଇ ନା କବେ ଯାଏ
ଗେଛେ ? '

' ତା ସାତ-ଆଟ ମାସ ତୋ ହବେଇ ! ' ବୈଶ୍ଵନ ବିଶେଷ କରେ ବଳ, ' କିନ୍ତୁ ଓ ର
ପେଟ ମନେ ହଲ ଚାର-ପାଚ ମାସେର । '

' ତାଇ ନାକି ? ତାହଲେ ତୋ ବେଶ ଅନେକ ଦିନେର ଝାକ ? ' ହାଜି କଲିମୃଣା
ଯେମ ସତ୍ୟଦର୍ଶନ କରିଛେ, ତୀର ଚୋଥେ ଆଶାର ଆଲୋ ଫୁଟ୍ଟ ଉଠିଲ । ନିଚୁ ଗଲାର
ଜିଗଗେମ କରିଲେନ, —' ଆଜ୍ଞା ବାତାସୀର ଘରେ ଯେ ଲୋକଟା ଥାକେ ତାକେ ଦେଖଲି ? '

' ହଁ, ଦେଖିଲାମ । ଅରୁଥ ଏଥିରେ ମାରେ ନି, ତବେ ଆଗେର ଚେଯେ ଏକଟୁ ଭାଲୋ ।
ଆସି ଦରଜାର କାହେ ଧାଡ଼ିଯେ ଦେଖି ମେ ସରେର ଭିତରେ ବିଛାନାରୁ ଥିଲେ ଆଛେ । '

' ତା 'ହୋକ, ତା 'ହୋକ । ' ହାଜି ଅସହିଷ୍ଣୁର ମତୋ ବଳିଲେନ, —' ଶୁଭେ ଥାକଲେ
କି ହବେ ? ଶୁଭେ ଥାକଲେ କି ଆର ଏସବ କାଜ କରା ଯାଏ ନା ? ନିଶ୍ଚର ଯାଏ ।
ତୁଇ କି ବଲିମ ? '

' ହଁ, ଆପଣି ଟିକଇ କଇଛେ । ତା ଛାଡ଼ା ବାତାସୀର ଚଳାକେରା ଆମାର
ଭାଲୋ ମନେ ହୟ ନା । ରଙ୍ଗବାଲି ବେଚେ ଥାକତେଇ ଏବ ସର୍ବତ୍ର କତ ଲୋକ କତ
କଥା ବଲେଛେ । ନାମା-ପାଡ଼ାର ଛମ୍ ଯେ ଓ ଦରଜା ଖୁଲେଛିଲ, ତା କି କେଉ ଶୋନେ
ନି । ରଙ୍ଗବାଲି ଟେବ ପେରେଛିଲ ବଲେଇ ନା ଦୋଷଟା ଛମ୍ବ ଧାଡ଼ ଗିଯେ ପଡ଼ିଲ ।
ନା-ହଲେ ମେଘେମାହୁରେର ଚୋଥଟାଗାନି ଛାଡ଼ା କି ଅମନ କାଜ କେଉ କରିବେ
ସାହସ ପାଇ ? '

' ଯଦି ଏହି ଠିକ ହୟ, ତାହଲେ ତୋ ଆର କୋନୋ କଥାଇ ନେଇ । ଆମାର
ବିଶ୍ଵାସ, ବାତାସୀଇ ଏ-କାମ କରେଛେ ! ନା ହଲେ ବୁଝି ହବେ ନା କେନ ? ' ହାଜି
ଆବାର ତମ୍ଭିହ ଜପତେ ଲାଗଲେନ, ଧାନ୍ତିକକ୍ଷଣ ଚୁପ ଥାକାର ପର ବଳିଲେନ, —' ତବୁ
ବୀର, ଆସି ନିଜେ ଏକଟୁ ପରଥ କରେ ନିହି, ଏବପର ଏକଟା କିଛୁ କରା ଯାବେ । '

ଜୈପଣ ଚଲେ ଗେଲେ ଆବାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଣି ହଲେନ ହାଜି କଲିମୃଣା ।
ତାର କପାଳେର ବଲିରେଥା ଆରୋ କୁଚକେ ଗେଲୋ । ତମ୍ଭିହର ଗୁଡ଼ିତେ ଥମ ଘନ
ଆତ୍ମ ଚଲତେ ଲାଗଲ । ବାତାସୀ, ବାତାସୀ, ବାତାସୀ । ବାତାସୀ ଛାଡ଼ା ଏ-
କାଜ ଆର କାରୋ ନା । (ଅଭ୍ୟବର୍ତ୍ତେ ସାମୀ ଯାଇବା ଯାଓଇବାର ଏହି ଦୋଷ ! କେନନା
ସାମୀର ସମ୍ବ ଏକବାର ଯେ ପେରେଛେ, ମେ ମେହି ଥାବ କି ସହଜେ ଭୂଷତେ ପାରେ ?
ଏ ହଜେ ଆଖିମେର ମତୋ, ଭାତ ଛାଡ଼ା ଯାଏ, ତବୁ ଛାଡ଼ା ଯାଏ ନା ଏବ ନେଶୋ)
ତା ଛାଡ଼ା ଓ ଏଥି ପୁରୋ କୋହାନୀ । ସେମନ ତେମନ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବ ଗ୍ରହ

কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা ঢাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অধিক কথা বলার কি বায়দা। মাঝাতো ভাই, দিনমজুরী করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিড়ে ভিজে না। আসলে লোকটাকে এমেছে এক বিছানায় রাত-কাটাবার জন্য—এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হকুম মানলে, গলা-ইত্তে পুঁতে এর মাথায় পাথর মারতে হবে, যতক্ষণ না প্রোপটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা' সম্ভব? ধানা আর পুলিশ রয়েছে যে! তা'হলে উপায়? জুতো মারা? একবারে করে রাখা? গ্রাম খেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লা যখন এসব ভাবমার তয়ার হয়ে ছিলেন, তখন থালেন তার অঙ্গুল মাকে নিয়ে মরা-গাঁড়ের পান্নির কাছে এসে দাঢ়িয়েছে।

পূর্ণিমা টাঙ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়াল্লা দেয়ার অনেক আগেই, এইবাবা তা' বাঁশবাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঘুলমল করছে। চারদিক নিরামুম, গাছ-পালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরা-গাঁড়ে এখন ইঠু পানি। দুই পাশে কাঁচা টেনে ডাঁড়ার সঙ্গে যে সক পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার শ্রোত। পান্নির ডিতর থেকে গজিয়ে উঠা বোনো খেতক্কলিতে কঢ়ি ধানপাতার জড়াজড়ি।

বীচু হয়ে জুতো-জোড়াটা তানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অস্থিধে হচ্ছে দেখে পিছন থেকে থালেন পাশে এসে বলল,—‘মাজুকে আমার কাছে দিন।’

শুরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম ‘আপনি’ বলতে সজ্জ। করত থালেদের, কিন্তু এখন আর সে ভাবটা নেই।

জোহরায় আলোকিত বড়ো ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা তুকর নীচে শুরু হৃদের চোখ দু'টো আরো স্মৃতি মনে হল তার, (একটা অব্যক্ত অস্মৃতির ছলছলানিতে বনের অক্ষকাবে শিহরিত মদীর মতো দুলে উঠল শুকের ডিতরটা!) আচ্ছ যদে জিগগেস করল,—‘তোমার কষ্ট হবে না তো?’

থালেন হাসলো। বলল,—‘না এ আবার কষ্ট কি?’

সাজুকে পাঁচ বছরের মেখে ওর আশা এলেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদুর ষষ্ঠ না পাওয়ায় ওকে কাঁচারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। অঙ্গুল মাকে তার অমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার

কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন মাইওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে
উঠে চলে গিয়েছিল।

(অন্ত কাঁধের উপর থেকে অবোরে ঘুমিয়ে ধাকা ছোটো ভাইটিকে নিজেক
কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, ক্রপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের
মতো কোঁচল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি অশিকের জন্ম
হঠাতে হাওয়ার টাপার কলির মতো কাঁপুনি থেরে গেল। নিম্নে তার সমস্ত
শ্রীরাটা শিশু করে উঠল সন্মানে বিদ্যুৎ সকারের মতো। পলকের জন্ম
তার চোখে পড়ল, সহসা কেবল বাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মৃৎ, তার সারা
চেহারার রক্তের প্রবাহ বহির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঢ়িয়ে
ধাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিষিদ্ধ স্থূলি অস্পষ্ট মনে পড়ান
মতো কী এক অজানা বেদনায় মৃৎ ফিরিয়ে নিয়ে বিবরিয়ে পানির উপর
দিয়ে হ্যাঁথে ইটতে লাগল।)

কিন্তু জোহরা দাঢ়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে
মৃৎ উঠিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে।
এরপর সে চক্ষু হয়ে উঠল। সেই ক্রপালি বালুর উপরে ফোর্যার শ্রোতে বয়ে
চলা বাস্তাটায় অন্ত হরিশীর মতো পাফেলে ইটু পানির কাছে গিয়ে আবাক
দাঢ়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ঝাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাঢ়িটা কুঁচকে এবে
ভাব হাতে ইটুর কাছে ধরা, জোহরা-উচ্চল কালো পানির দিকে মৃৎ নিচু
করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোটো
ছোটো চেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাও। হঠাতে মৃৎ তুলে সে ডাকল,—
‘খালেদ !’

‘কি !’—কিছুর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

‘আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ !’—স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল,—
‘আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ। পানিটা কি স্বদর !’

খালেদ ফিরে এল। বলল,—‘আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন
তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে !’

‘ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে !’ পানি ঠেলে কিছুর এগিয়ে
আবার ধরকে দাঢ়াল জোহরা। ঝিলিয়িলি চেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,—
‘দেখছ, কি স্বদর পানি ! এমন পানিতে মরতেও হৃৎ !’

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মৃৎ নীচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পানি জেকে জেকে যাচ্ছে—‘বৈ কথা কষ্ট !’

মানী পেছিয়ে এসে চপ্চপ্চ পানি থেকে পা দুটো খাড়া দিয়ে দিয়ে বর্তুল
জুতো জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিত্তিয়ে কিছু নেই,
বিষাণী হাওয়ার ঘতো কিসের এক বিজ্ঞ হাহাকার শব্দের শব্দের ঘরছে।
নিজের কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠল, তার শরীরটা বিষ ধরে অবশ হয়ে
এল।)

খালেদ আস্তে আস্তে ইটেছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-সব
ত্বরণে পেল,—‘একটু দাঢ়াও !’

‘আবার কি হল আগনীর !’

‘কি আনি কিছু বুঝতে পারছি না ! আমার চোখ দিয়ে এমন পানি
পড়ছে কেন ?’ জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে
নিজের দুটো চোখ বিস্ফোরিত করে দাঢ়াল, টাহের আলোর দেখা গেল, তার
টকটলে দু’টো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অঙ্গবিন্দু গঁজিয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,—‘কি হল আগনীর ?’

‘তুমি কিছু জান না, কিছু বুব না ?’ কাগজের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো
মুছে জোহরা অপ্রকৃতিহীন ঘতো বলল,—‘সাজুকে দাও আমার কাছে।
চল শিগগির। লোকজন নেই, আমার বড় ভয় করছে।’

প্রবা যথন মুখোযুথি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিংবিধি হাওয়া
বইতে শুরু করেছিল, আর যথন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন এক থেকে
দ্বিতীয় কালো মেষ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল।

থৰ্ডম পায়ে উঠানে পাইচারি করছিলেন হাজি কলিমুজা, আকাশের দিকে
চেঞ্চে তিনি চমকে উঠলেন। তাহলে তার আন্দাজই ঠিক ?

‘জৈগুম ! ও জৈগুম !’ তিনি থমকে দাঙিয়ে বলতে লাগলেন,—‘দেখে
যা, আমরা যা ভাবচি তাই ঠিক। আসমানে সাজ দেখা দিয়েছে।’

জৈগুম চোকাটের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,—‘তবু তো আগনি
বলছেন, আরো পরখ করতে। আমার মনের কোণে স্বীকৃত নাই।
বাতাসী যা ছিনাল।’

আকাশে চলমান যেষটাৰ দিকে চেঞ্চে আবার পাইচারি করতে লাগলেন
হাজি। কলিমুজা, এব বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ দ্বন্দ্ব পৰে জোহরা যথন এল, তারে তারে তার সঙে আলাপ করতেও
বাবু বাবু তাল কেটে বেতে লাগল, অনেক মাত্ৰ পৰ্যট চোখে দূৰ
এল না !

অমন্ত্রিত করে প্রদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে পুর পাড়ায় আমবাগানের ওধারে। দীপের চালার মীচটাই পাকালের খারে বসে ও খুনের জাউ রঁধিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন গণ্যমান্ত লোক, সাত জন্মে একবাৰ এসেছেন ওৱ এখানে, কি দিয়ে মেহমানদারি কৰবে, সে ঠৰ্হৰ কৰতে পারল না !

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজিৰ মোটেই নজৰ ছিল না, তিনি গোপন আড় চোখে হৱিহাত লাবণ্য পিঙ্ক ওৱ দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন !

এদিকে বাড়িৰ মাশতা-পৰ্বেৰ তদারক শেষ হওয়াৰ পৰ জোহুৱা গুৰি হৱে বসেছিল তাৰ শোবাৰ ঘৰে চৌকিৰ কিমারায়।

‘বিষে হওয়াৰ পৰ থেকে কিসেৰ ঘেন এক আশৰ্দ্ধ মাস্তা বিনা কাজেৰ দ্যময়টুকু মে এখানটাৰ বসেই কাটিয়ে দেৱ ?’ এ কিসেৰ আছ ? কিসেৰ অঙ্গা ? জোহুৱা তা বুঝতে পাৰে না। বাড়িৰ চেহাৱা বেধ হৱ অনেক দিক থেকেই অদল-বদল হৱেছে, কিন্তু এ কামৰাটায় কোন পৰিবৰ্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হৱেছে মাত্ৰ। আগেকাৰ দিনিদেৱ হাতেৰ ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হৱেই আছে, অক্ষকাৰে বসে থাকলে তাদেৱ চৌটেৰ ফিল্ফিল আলাপ ঘেন মে শুনতে পাৰ। তথুনি ওৱ মনে হৱ, এবৰে চোকবাৰ কোনো অধিকাৰ নেই, এখামকাৰ সব দৰ্খন কৰে মে জাকাতেৰ কাজ কৰল।

‘কিন্তু আমাৰ কি দোষ ? আমি তো রাজি হতে চাইনি ! মানা বলস, বোন কাহিসনে ছ’একটা বছৰ সবুজ কৰ, বুড়োটা মদল বলে। তখন বেশ জোহুৱান দেখে একটা বৰ ছুটিয়ে দেব। এখন সপ্তস্তো হাত কৰে নে।’ জোহুৱা আপন মনে আওড়াল,—‘ছাই সপ্তস্তো !’

ঐগুণ্ডে ঘা’ৰ শুপৰ দিয়ে গৱম বাতাস বইতে থাকলে ঘেমন কৰে জলে, তাৰ বুকেৰ ভিতভটা তেমনি কৰে জলতে লাগল। বস ঘেন কৰ্যেই বৰ হৱে আসছে, এক সময় সে পোৱ টেচিয়ে উঠল। ওৱ চোখেৰ ছটো তাৰায় জলজল কৰতে লাগল একটা হৰিনীত বস্তুতা।

মগ ছটা পিস্পিম কৰছিল, এলোচুলে বৰ্ণকড়া মাধাটা একবাৰ ঝাড়া দিয়ে জোহুৱা বাইছে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওৱ দৃষ্টি পড়ল কুয়াৰ দীয়ে

মেহেদি গাছটাৰ দিকে, তিজে বাটিৰ রসে তাতে বন হয়ে কচিপাতা হেখা দিয়েছে।

ক'বিন সংকলন করেও সে এই মেহেদি গাছটা কাটিতে পারেনি। কিন্তু আজকে তাৰ হাতটা শিশু শিশু কৰতে লাগল। অস্ত পারে সে চলে গেল রাখাঘৰেৰ ভিতৰে। সেখান থেকে ধাৰাল বাঁটো এবে একেক কোণে একেকটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

‘আহা হা, কৱেন কি গিমিয়া’ বৈঙ্গ দোড়ে এল। বলল,—‘গাছটা অনেক দিনেৱ, মাসৰেৱ কত কাজে লাগে। কৰ্তা শুলে ভীষণ রাগ কৱবেন।’

‘তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ কৱবেৱ, না কৱবেন, তোৱ চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমাৰ ইচ্ছা হয়েছে আমি কাটিবোই।’

‘আমি কাম কৱে থাই, আমাৰ কি? আপনাৰ ভালোৱ অস্তই বলছিলাম।’

‘আশ্র্ম! জোহুৱা মুখ তুলে চাইল। বলল,—‘আমাৰ ভালো ঘন্দেৱ চিষ্ঠা তোকে কৰতে হবে? দুনিয়াতে আৱ লোক নেই।’

কৰ্তাৰ প্ৰিয় গিঙ্গিকে দাঁটাতে সাহস কৱল না বৈঙ্গ, মুখ কালো কৱে সে নিজেৰ কাজে চলে গেল।

(কেমন কৱে দুপুৰ হল, কেমন কৱে এস বিকেল) আৱ কেমন কৱেই বা বাতি অসে পৃথিবীৰ মুখ ঢেকে দিল, জোহুৱা কিছুই বলতে পাৰবে না। তাৰ হৃদয়েৰ একটা অংশ কে যেন বাকবাকে ধাৰাল ছুঁঁ দিয়ে কেটে দিয়ে গেছে, অতিদিনেৰ উচ্চল টেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষেৰ আঞ্চনিক যতো শুধু একটি জাল।)

এশাৱ নামাজেৰ পৰি বিছানায় শৱে হাজি কলিমুজা বললেন,—‘বা ক্ষেত্ৰেছিলাম, বাতাসীই কুকাম কৱছে।’

‘কেমন কৱে আনলেন?’—জোহুৱা শুধাল।

‘এ সব জানতে কি আৱ খুব বুদ্ধি লাগে? তাৱে টিকমত যা দিলাম আৱ তা’ বেজে উঠল। ব্যাস, আৱ ভাবনা নেই। বিচাৰটা কৰতে পাৱলে বিষি হবেই।’ হাজি একটুখানি বৌৰব থেকে বললেন,—‘আগামী উক্তবাবে’ বাত বারোটাৰ পৰি বিচাৰ বসাব। ‘হেখা ধাক কী হয়।’

(জোহুৱা চুপচাপ শৱে বাইৱেৰ দিকে কাল পেতে রাইল। আমেৱ বোলেৰ গৰু এমন মাতাল কেন? বাত কেন এমন কালো, অকুকাৰ? সৰ্ব থবি আৱ না উঠল, ভালৈছে ছিল ভালো, সবাৱ চোখেৰ আঢ়ালে চিৰছিনেৰ অস্ত নে হাঞ্চিৱে বেজ, বেখানে কেউ অকৰবে না।)

কগালে কোমল হাতের ছোয়া পেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন হাজি কলিমুস্তা। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার পাশে তারে আছে একটা ঘৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত শান্ত। কাপড়ে ঢাক।। সে কোমল হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঢ়াল। অতি সন্তর্পণে ধিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছতলার এল।

‘সারাদিন কোথার ছিলে তুমি?’ খালেদ চুপি চুপি বাড়ির ভিতকে ঢুকতেই সঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা-গলায় বলল,—‘আ থেকে থাকতে খুব ভাল লাগে, না?’

কখা বলার চেষ্টাও না করে খালেদ ধ’ হয়ে রইল। হঠাৎ ভাব হাতটা তুলে ওর গালে একটা চড় মেরে কিংবেধ মতো জোহরা বলল,—‘আমি আর এত কষ্ট সইতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও তুমি! ’

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে কান্দতে লাগল। (তার দুই চোখ থেকে ঝরবু করে পড়ছে, কঠরোধ হয়ে আসছে। তোর বেলার অঙ্গেরা দূম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলোর উপর দিয়ে মিছিমিছি সে হেঁটে বেড়াল, এর পর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই সেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন এক অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।)

শুক্রবারে রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই গিয়ে হাজির হল। মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈষ্টকখানায়। এর আগেই কানাঘুরার মারফতে ব্যাপারটা সারাগ্রামে আমাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিস শুধু গ্রামের আলেম মঙ্গলী ও মাতৃবন্দের নিরে। দুরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসমীয়ের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনিদিন তিনিগুজি হান্দিস-কিভাব ধেঁটে একটা ফতোয়া তৈরী করেছিলেন হাজি কলিমুস্তা। মৌলানার অভ্যন্তি নিরে তিনি তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়োগ শুরু করছিল, এবারে ঝুকতে

কেন্দে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, ‘ও মা গো, এ-ও আমাৰ কপালে
ছিল গো ! অঁতুড়ঘৰে কেম মুখে হুন দিয়ে মেৰে ফেললে না গো !’

‘এই বেটি, কাওয়া থামা !’ হাজি ধৰক দিয়ে উঠলেন। বললেন,—‘সে
সময় বৃঝি খুব কুর্তি লেগেছিল ?’

মেলানা মহীড়িকে বেশ চিঞ্চিত মনে হল। তাঁৰ সৌম্য মূখ্যঙ্গলে
বেদনাতুৰ গান্ধীৰ্থের কাষ্টি। ধীৱে ধীৱে মুখ তুলে তিনি শাস্তি গলায় জিগগেস
কৰলেন,—‘কিগো, তোমাৰ কিছু কওয়াৰ আছে ?’

‘কি কইব বাবা, আপনাৰা তো গৱিবেৰ কথা বিদ্বাস কৰেন না। আমৰা
তো মাহশই অই, কুকুৰ বেড়াল ! আমাদেৱ আবাৰ ইজ্জত কি !’ বাতাসী
চোখ মুছে বলল,—‘না হলে এমন বছনাম আপনাৰা আমাৰ উপৰ ফেলতে
পাৰতোন !’

‘কিষ্ট এসব কথা তো আৱ আসয়ান খেকে শড়ে না !’ হাজি কলিমুজা
বললেন,—‘অন্ত কাৰো মায়ে তো ওঠেনি ?’

‘সে আমাৰ কপালেৰ দোষ। না হলে, ও বেঁকে ধাকতেই আমি কতবাৰ
বয়ি কৰেছি, প্ৰতিৱোজ পোড়ায়াটি আৱ তেঁতুল না খেয়ে ধাকতে পাৰিবি—
এসব জিমিস কাৰো চোখে পড়ল না !’

একটা যন্ত্ৰ। কাঁথা গাঁৱে জড়িয়ে বসে বসে কোকাছিল বাতাসীৰ
মামাতো ভাই বহিমন্ডি। তাকে সওয়াল কৰলে ফ্যাল ফ্যাল কৰে তাকিয়ে
ৱইল ক্ষুধ।

বিচাৰেৰ আলোচনা যথন এগিয়ে চলছিল, তথন দক্ষিণ দিক থেকে পালে
পালে কালো মেৰ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চান বাবে বাবে
আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও থামাৰে নদীতে আলো-ছায়াৰ লুকোচুৰি।

(এক সময় বাতাস বৰু হয়ে গেল, অনেকক্ষণ কুকু হয়ে ৱইল-সাৰাটা
প্ৰকৃতি। ঘৰবাড়ি কাপিয়ে কাপিয়ে থাকে থাকে শুক শুক আওয়াজ উঠল,
সকে সকে চমকাল বিহুৎ। ঘৰেৱ ভিতৰ সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঐটিক এমনি সময় হাজি সাহেবেৰ বাড়িৰ পিছনটাৰ আমগাছেৰ মীচে
দীড়িয়ে ছিল একটি মাঝুৰেৰ ছায়ামূৰ্তি। পা টিপে টিপে খোলা জানালাৰ কাছে
এসে অনেকক্ষণ সঞ্চাবী দৃষ্টিতে চেঞ্চে ৱইল। ঘৰেৱ ভিতৰে আলো নেই;
নাম না জানা অৱশ্যেৰ ভিতৰ কোনো প্ৰেতপুৰীৰ মতো সমস্ত বাড়িটা কুকু-
নিশ্চালে বিষ ধৰে আছে।

জানালা থেকে সৰে এসে শূর্ণিটা ভিতৰ ধাৰ দেঁৰে চলতে কুকু কৰল,

বাজারের পাশ দিয়ে ঘৰেৱ দৱজাৰ সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবাবি
বিজলি চমকাব, আৱ সে ঘেন শিউৱে উঠে গভীৰ আতঙ্কে)

কিছুক্ষণেৰ মধ্যেই বাতাস বইতে উফ কৱল, যেনে যেনে সংষাতে গৰ্জমে
চাৰদিক তোলপাড় হতে লাগল। দৱজাটা হয়তো ভোমো ছিল, আচমকা
সমকা হাওয়ায় তা' সখনে খুলে গেল। মাহুষটা অস্ত পদে এসে উঠল বাৰান্দায়।
এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় মৱিয়া হয়েই যেন ঘৰে ঢুকে পড়ল।
ওপৰে নীচে কেবল শব. শব. আৱ শব। জোৱা বাতাসেৰ তোড়ে একেবাবে
মোচড় খেয়ে উঠে কৱগেটেৱ চালগুলি, কাঠেৱ বেড়ায় অবিভৃত ধূপধাপ
আওয়াজ।

থাটেৱ কাছে এসে ইত্তত কৱতে লাগল মাহুষটা, কি কৱবে যেন ঠিক
কৱে উঠতে পাৱছি না। শৱীৱে রোঁমগুলি কাটা দিয়ে উঠেছে, টিবটিব
কৱছে হৎপিণ্ড, চিন্চিন্ কৱে মন্তিকে রক্ত উঠে চোখ দু'টো বাগসা কৱে
দিছে। তাৱ ভাবনা, কোথায় এল সে। একি জ্ঞান, না মৃত্যু ? একি সব
হাৰানোৱ হাহাকাৰ, না মিলনেৱ উন্নত সংযোগ ? কান পেতে সে ঘেন
শুল, চূড়িৱ রিনিটিনি, এক গভীৰ শাস্ত নিখাস, কাপড়েৱ মৃত খসখস !
আণ আসছে। একি আমেৱ বোলেৱ, না চুলেৱ গৰ ? না, না এখানে নয়
এতো সে চায় না, চাইতে পাৱে না।

এক পা দু'পা কৱে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অহুভব কৱল, একটা
স্থুষ্ট নগ মশুণ হাত অস্তকাৰ খেকে উঠে এসে গানেৱ কলিৱ মতো পৱন
আখাসে তাৱ হাতকে আকৰ্ষণ কৱল।

| তখন সমস্ত আকাশে যেয়েদেৱ ঝড়োছড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দগৰ্জমে
একেবাবে কেপে কেপে উঠেছে সাবা পৃথিবী। একটানা বড়েৱ 'তীব্ৰ বেগে
ছিন্নতিন্ন'হয়ে যাচ্ছে গাছপালা; মস্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুঁষ্মেৱ উচ্ছুঁষণ
তৎপৰতাৱ। স্বৰ্গ-মৰ্ত্য-পাতাল মহন কৱে যেন মহাপ্লানেৱ উচ্চকিত শব্দেৱ
ভয়ংকাৰ-হৃদৰ রাগিনী !!

এইভাবে কৃতক্ষণ বড় চলল হয়তো কেউ বলতে পাৱবে না। বাতাস যখন
কমতে লাগল, তখন অযুত মুক্তাবিস্মুৰ মতো আহল বৃষ্টি।

(ধোৱাল হাওয়াৰ সঙ্গে প্ৰথম যখন বৃষ্টি আহল, তখন তাতে বৱইস শুধু
নয়জাতকেৱ বিক্ষেত, ঘৰ-বাড়িৰ ওপৰ দিয়ে শুধু ঘৰ ঘৰ বাগটা দিয়ে গেল।
কিন্তু বেশিক্ষণ এ বৱইল না। ঝপদ সংগীতেৱ বিলিষ্মিত লয়েৱ ঘতো বাতাস
বৰাই কমতে লাগল, বৰ্ষে ততই এল বিবিড়তা। এৱ পৰ শুধু ঝৰ্মৰূপ শৰ।)

এইভাবে কড়কণ কেটে পেল জানা নেই। এক সময় খোলা হবজা পার হওয়ার পরে উঠানে নেমে বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই টলতে টলতে উত্তর ভিটির ঘরের ভিতরে অনুগ্রহ হয়ে গেল মাঝুষটা।) তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এসে মেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঢ়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথার ঘাড় বীচু করে ধূকতে-ধূকতে বাড়িতে চুকলেন হাজি কলিমুঞ্জা। হঠাতে তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,—‘অত দেরিয়ে ! আর এদিকে আমার বড় ভৱ লাগছে !’

‘কি আর করি বল, আপন চুকিয়ে এলাম !’ ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন,—‘মে একটা পৌড়-হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোক থীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফা-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না ? হ’টোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো, করে, তার ওপর কালকে গী ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আঞ্চার রহস্য ? সুজ সঙ্গে বৃষ্টি নামল !’

‘হ্যাঁ তাইতো বড় তাজ্জব ব্যাপার !’ কথাটা শেষ করে অম্বৰম বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উঠানে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন,—‘আরে, আরে করছি কি ? তুমি পাগল হলে না-কি ? এত রাত্রে ভিজছ সর্দি করবে যে !’

‘না, সর্দি আমার কোনো কালেই করে না।’ জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একারাশ চুল ডান হাতে ‘সরিয়ে ফোটা-ফুলের মতো উচ্ছল মুখটা তুলে মধুর হাসি-ওপচানো-ঠোটে বললো,—‘আপনি জানেন না ? বছরের পয়লা বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল হবে।’

পুইশাক

আড়োমার ঝুঝাল

ইস্তল নিয়ে এতো কাও। অঞ্চ সবাই নির্বিকাৰ।

বাষ্পবন্দী খেলাটা জয়ে উঠেছে টুষ আৱ সামিৰ মধ্যে। চাঁৰপাশে গোল
হয়ে বসেছে আৱ-আৱ ছেলেমেয়েৱা। সামি হাঁৰছিলো বাষ নিয়ে। দুখে
বাজে এখন, ছোঁ, ও আবাৰ একটা বাষ মাকি? যৱা কেঁদো। ছাগলেৰ
ওঁতোড়েই ত্ৰিভূবন পাৱ।

এৱই মধ্যে একবাৰ পেছনেৰ দিকে চেৱে নিয়ে হঠাৎ বাঁশু বলে উঠলো,
ত্ৰিভূবন পাৱ কৱাজ্বে, দাঢ়াও! ছাগল-থেকো শাক আসছে!

চক্ষেৰ নিময়ে ভেল্কি খেলে গেল। বাঁশ-ছাগল এক সাধে ছিটকে সঙ্গেৱ
সবচেয়ে হাঁলা ছেলে বাঁশ হেঁড়া 'ৰ্ব' পৰিচয়' প্ৰথম ভাগ খুলে সুৱ ধৰে দিলো,
হৃষ-ই ট ই-ট, হৃষ-উ ট উ-ট।

ফ্ৰকেৱ কোখটা মুখৰ ভেতৱ ওঁজে দিয়ে ঘিঁটমিয়িৱে বাঁশু বললো, দিই
বলে? পুইশাক আজ চিবিয়ে থাক তোনৈৱই।

সবকঠি চোখ একবাৰ ওঠা-নামা কৱলো। না, পুঁচকে ঝঁড়িটাকে আৱ
অৰু কৱবাৰ সময় মেই। পুইশাক এখন আজিনীৱ মধ্যে।

পুইশাক অৰ্ধাৎ জমীৱ পণ্ডিত এনে পড়লেন। মাৰারি গোছেৱ
আধমোটা, গোৱৰ্ব মাহষটি। মুখে একবাশ শাদা দাঢ়ি। বড়ো বড়ো চোখ
ছাঁচি শুকতাৱাৰ মডো দপ, দপ, কৰে। সাধাৰণত সবাই ভাকে 'পণ্ডিত
সাহেব' বলে। চাৰী ঘৰেৱ ছেলেমেয়েৱা সংক্ষেপে বলে 'পন সাব'। এৱ
থেকে কবে ঘেন টিক যনে পড়ে না এখন আৱ, কোন জুহু ছেলে জেটেৱ
আড়ালে মুখ লুকিয়ে উপবাসট। প্ৰথম উচ্চারণ কৱেছিলো, পন সাব না,
পুইশাক।

জমীৱ পণ্ডিতকে দেখে পড়তে পড়তেই উঠে দাঢ়ালো সবাই। চোখ তুলে
চাইলো একবাৰ। ত'জি-ভাঙা পুৱোনো কোট, কাৰে-কাটা শাদা লুঙি।
কাচা চামড়াৰ পানাইৱেৰ বালে পা঱ে আজ মোটৱ-টাইৱেৰ আগুল। চোখ
আৱ বাসতে চাৰলা কাৰো।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধরকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, পিট পিট করে দেখছিস' কি, উদ্বেড়ালের দল? দরজা খোল। সেকেও পণ্ডিত আসেনি এখনো?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে রাখ সবিনয়ে বললো, চাবি, প'ন সা'ব।

চাবি দিতে গিয়ে একেবারে আতকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, অঁঁজি, করেছিস' কি, গাধার দল? সাকুল্যে মোটে তেরোজন? বলি, আমি কি শেয়াল-পণ্ডিত যে ইন্সপেক্টর-কুমীরকে তিরাশিজন দেখিয়ে দেব? বেরো, হতভাগারা। বেরো এখন থেকে।

বেকলো না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শেয়াল-কুমীরের গল্লের প্রসঙ্গে হাসি আসছিল ওদের। 'ধরক শুনে সেটাও চেপে দেতে হল।

পণ্ডিত 'হায় হায়' করেই চলেছেন, সব গেল, স-ব। নিজেও ম'লো, আশাকেও মারলো। ঘূন লাণ্ডক এমন ইষ্টুলে।

রাখুই উঠে দাঢ়ালো সাহস করে, প'ন সা'ব, ছাই না বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে আনিগে। টুহুও ধাক আমার সাথে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রাইলেন পণ্ডিত। তারপর আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন রাখুকে। হাত বুলিয়ে আদরে আদরে করে দিলেন মাথাটা, আহা-হা বৈচে ধাক বাবা, বৈচে ধাক। আর্মার চুল-দাঙ্গির মতো পরমায় দিক তোকে আ঳া। বড়ো ভালো বুদ্ধি বার করেছিস। শিগগির যা। ঝাটকুড়ের বেটা ধাবার বেলা একটার মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আর, দেখবি তো, সেকেও পণ্ডিতের কি হল?

রাখু-টুহু বেরিয়ে গেল এক মৌড়ে।

পণ্ডিত উদ্ধিষ্ঠ কষ্টে ভাক দিলেন, রাখু, শিগগির বাক্স খোল। নামের খাতা বার করিসনি এতক্ষণও?

রাখুর দোষ নেই। চাবি পায়নি। কিন্তু জমীর পণ্ডিতের আজ আর তর সহচে না। না সইবারই কথা। চলিশ বছরের ইষ্টুল। এর প্রতিটি দিনের স্বত্তিতে স্বাক্ষর রয়েছে জমীর পণ্ডিতের। যা যেমন শিশুকে মাহৃ করে তোলে, তিনিও তেমনি তৈরী করে তুলেছেন এই ইষ্টুলকে। একে কি ছাড়া হায়, না, ভোগা যায়? অথচ মড়বন্ধ চলেছে তারই।

আইন-হয়েছে নতুন, জমীর পণ্ডিত শুনতে পান,—সজোধে বিজ্ঞপ করে বলেন, আইন নয়, পাগলা বাইন যাছ ছাড়। পেয়েছে, আচক্ষে বেড়াচ্ছে,—, অন ধন পাঠশালা রাখা চলবে না কোনো এলাকার, হলি না ট্রেনিং-পাওয়া

শিক্ষক থাকে। সাহায্য করা দুঃসাধ্য, ব্যবহারও অনিয়ন্ত্রণীয়। অতরাং ছ'টো চারটো এবার উঠিয়ে দিতেই হবে।

বাজারে গুজব,—রাটিয়েছে ওই নতুন পাড়ার হোড়াগুলো, বারা হচ্ছে। করে একটা পাঠশালা খাড়া করেছে এই সেদিন, যতো রাজ্যের বোকাগুলোকে ধরে এনে বিনে পঞ্চায় মাটোর বানিয়েছে,—ইয়া, বাজারে গুজব, অমীর পশ্চিতের ইঙ্গুল এবার উঠেই যাবে। কারণ, পশ্চিতের যতো ইঙ্গুলও এখন জীৰ্ণ। চৈত্রের পঞ্চায় পাড়ির নীচে হাওয়া লেগে ঝুর ঝুর করে বালি ঘরে পড়ে, গাউখালিকগুলো বেগতিক দেখে গর্জ ছেড়ে উড়ে পালায়। ওই উপয়াটাই লোকে ইঙ্গুলের উপর প্রয়োগ করে। দেয়ালের বালি ঘরে তো বয়েছে হাওয়ায়, হয়তো বা পশ্চিতের বিশ্বাসেও। ছেলেমেয়েরা সরে পড়েছে একে একে। পশ্চিত সাহেব,—গ্রামীণ সংক্ষিপ্ত রূপ প'ন সা'ব,—এবার আপনিও সরে পড়ুন,—আড়াল-আবড়াল থেকে ছষ্টুলোকের কথা শোনা বাস্তু, বাতের ব্যথাটা আর বা ঢাবেন না এই বয়সে ইঙ্গুলে বসে থেকে। এদের নাকি যত্যন্ত,—ইন্সপেক্টর পাঠিয়ে তদন্তের নামে একটা শাক-দিয়ে মাছ-চাকা কাঙ্গ করা। কিন্তু দেখে নেবেন অমীর পশ্চিতও, কার পেটে কটা ‘ক’। অমন অনেক ইন্সপেক্টর তাঁর দেখা আছে। অনেক ঘূঘূ দেখেছেন তিনি। আজকালকার এরা আবার জানেই বা কি?

চিন্তার ধূমধূম করে পশ্চিতের মুখধানা। বাশ-টুশুকে আদর করতে দেখে ছেলেমেয়েরা সাহস পেয়েছিলো একটু। আবার তয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পড়াশোনায় অবধি ভুল হয়। কিন্তু অমীর পশ্চিত সামাজিক ধর্মকটিও দেন না।

ইঙ্গুলের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ফসল নেই এখন, চূড়া-মাটির বুকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ছোটো-বড়ো মাঝারি চেলা। অথবা দৃষ্টিতে মনে হয় বেলে পাথরের টাই পড়ে রয়েছে বুধিবা। মাঝে মাঝে বাবলা আর শিমুল গাছ। দূরে, বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার ধূ-ধূ চৰ। আশে-পাশের গাঁয়ের ঘাসবেষ আশাপীঠ ওই মাঠ আর চৰ। চাষ করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কি ফসল ফলাবে, কে জানে।

ইঙ্গুল ঘরের দিকে তাকিয়ে অমীর পশ্চিতের মনে হয়, এটাও যেন একটা মাঠ। কতদিন থেকে জ্ঞানের চাব করে আসছেন তিনি এখানে। আশা করেছেন ঘাসবেষ ‘ফলন’ আনবেন। মাঠ এতদিন ফসল দিয়েছে, ইঙ্গুলও। কিন্তু এবার কি হবে? ইঙ্গুল সবক্ষে এবার এ-চিন্তা তাঁর মাঝায় ঝুকেছে বিশেষ করে ইন্সপেক্টর আসার পর থেকে।

ঃ পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন ?

চিন্তার বাধা পড়লো জমীর পণ্ডিতের। চকিতভাবে পেছন কিয়ে দেখলেন, জানলার পাশ থেকে উকি দিয়ে কথা বলছে ওপাড়ার হাশিম। নতুন পাঠশালার এক নবর গাঙ। প্রশ্নটা বিজ্ঞপের মতো মনে হল তাঁর কাছে। বললেন, গুরু চরাচৰ্জ। ইস্তে আর কি করে লোকে ?

হাশিম একটু অপ্রস্তুত হল ; কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তেই, তওবা, তওবা, কি যে বলেন আপনি। ছেলেমেয়ে কাউকে দেখছিনে কিনা। তাই, ভাবছিলাম—

একটু থেকে আবার প্রশ্ন করলো, তা আজকাল আর বুঝি কেউ আসে না ? সেকেও পণ্ডিত সাহেবকেও দেখছিনে।

ইন্সপেক্টর আসার পর থেকে একটু সকাল-সকালই আসেন জমীর পণ্ডিত। আশা নেই, বেশি করে থেটে ইস্তেলটাকে ভালো করে তুলবেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখে সেকেও পণ্ডিত প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাস্তিতে বসে থাকেন আজকাল। আর, ছেলেমেয়েরা আসে সেই আগের মতোই দেরি করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বাড়ির কাজ-কর্ম ব্যথাসম্বন্ধ সেরে তক্ষে আসে। ধরক দিয়ে লাড হয় না, দেওয়া উচিতও নয়। সংসারের অভাব-অন্টন উপেক্ষা করে, কাজের চাপ লাঘব করে ওরা যে ইস্তেলে আসতে পারে শেষ পর্যন্ত, এই-ই তো অনেক। কিন্তু এসব কথা রাগ দেখিয়ে শোনানো চলে না হাশিমকে। বললেন, আসেনি এখনো, আসবে। সময় হলে তবে আসবে। ইস্তেল চালাচ্ছা হৈ রৈ করে, আর এটুকুও জানো না।

হাশিম এবার মৃৎ-চোখ কঙ্গণ করে বললে সহাহৃদ্দতিতে, পণ্ডিত সাহেব, ভুল বুঝছেন কেন আমায় ? আপনার চেয়ে বেশি বুঝি, এমন কথা বলে বেয়াদপি করতে চাইলে। এই ইস্তেলটা উঠে যাক, একি আমরা কামনা করতে পারি ? হাজার হলেও একই গ্রামের ইস্তেল তো ! ইস্তেল যতো বেশি হবে, লেখাপড়াও ততো বেশি শিখবে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। গাঁয়েরই উন্নতি হবে।

জমীর পণ্ডিত তীক্ষ্ণ দৰে প্রশ্ন করলেন, ইন্সপেক্টর তোমাদের শুধানে গিয়েছিলো, না ?

ঃ হ্যাঁ, আপনার শুধানে কি বলে গেলো ?

ঃ বলবে আর কি ? একি আর কানে কানে বলবার কথা ? যা বলবে, সবাই জানতে পারবে।

জওয়াব দিয়ে জমীর পণ্ডিত ভাবলেন, এ মৰ্জ হল না, জওয়াব দেওয়াও হল, এড়িয়ে দাওয়াও হল। ইন্সপেক্টর যে কি বলবে, তা এখনো আনা যাবনি। ভালো কিছু যে রিপোর্ট দেবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হলেও খারাপ কিছু যে বলবে না, এমন আশা তিনি করতে পারেন। তার কারণ, ইন্সপেক্টরটিকে অভ্যন্তর ভূমি বলে মনে হয়েছে তাঁর। কাজও জানে। যতোক্ষণ ইস্কেলে ছিলো, স্বীকৃতিমতো সশ্রদ্ধ এবং সহামুক্তিময় ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে। পার্কিস্টানী আমলের হঠাতে প্রমোশন পাওয়া ইন্সপেক্টরদের মধ্যে এতোক্ষণ তিনি এর আগে আর দেখেন নি।

অবিশ্বিত, একটা বিষয়ে খটকা রয়েছে তাঁর মনে। ইন্সপেক্টররা এসেই চা-নাশতা চেয়ে বসে থখন। সে অল্পে এবার আগে ধাকতেই চা আনিয়ে রেখেছিলেন রাখুন্দের বাড়ি থেকে। ইন্সপেক্টর ধারাপত্র দেখবার সময় জমীর পণ্ডিতের ইচ্ছিত মতো রাখু এগিয়ে দিয়েছিলো মিষ্টি, ফলমূল আর ফ্লাকের চা। কাপে মুখ লাগিয়ে অগ্রমনস্থভাবে ইন্সপেক্টর বলেছিলো, বেলের শরবত গরম কেন?

রাখু মেয়েটি মৃদুরা। স্বিতমুখে চট করে বলে উঠেছিলো, না, সার এখো শুড়ে পানা।

এক মুহূর্ত রাখুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ইন্সপেক্টর হেসে বলেছিলো, তা'হলে তো ছোবড়া বেছে থেতে হবে। আধ মাড়াইয়ের কলটা বোধহয় ভালো ছিলো না। তুমি দেখোতো এবার, একটা ছাকনি পাও কি না।

বলেই সে কাজে মন দিয়েছিলো।

কাপের মধ্যে সত্যি সত্যিই চায়ের একটা পাতা ভাসছিলো। রাখু সেটা উঠিয়ে নিয়েছিলো অতি সাধারণ, সন্তর্পণে।

শুধু এই ঘটনাটির জন্মেই ইন্সপেক্টরের মন-মেজাজের নিশ্চিন্ত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি আজও জমীর পণ্ডিত।

হাশিম আবার সাজ্জনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, ওপরে একটু খোজ-খবর নিলে হত না।

জমীর পণ্ডিত কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, খেমে গেলেন। রাখু এবং আরও করেকটি ছেলেমেয়ে এসে চুকলো ঘরে। এই ঘরের স্বত্ত্বা,—নানান সলে আসা। একা আসতে পারে না। ভালো লাগে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধব একে-ওকে ভাকাভাকি করে দল বানিয়ে ভবে আসে।

হেরি করে আসার সজ্জিত বা অপ্রতিক্রিয় হল না। কেলেমেয়ের চুপচাপ

বলে গেল নিজের জায়গায়। শ্রেষ্ঠ বার করে হাতের লেখা লিখতে শুরু করলো। হাতের লেখা না দেখানো পর্যন্ত পড়া নেয়া হয় না কারো।

পেছন থেকে হাশিম বললো, আচ্ছা, আসি এখন, পণ্ডিত সাহেব। আপনি পড়ান।

অওয়াব দিলেন না জমীর পণ্ডিত, চূরে দেখলেন যদিও। অপস্থিতিগুলির পিঠ থেকে ভুলে নিসাড় দৃষ্টিটা পেতে দিলেন ঢেঙা-ভৱা দিগন্ত-বিজ্ঞত মাঠের ওপর।

ভেতরে বাইরে যাঠ। এবার কি ফসল ফলবে, কে জানে।

শুভ রাট্টেছে গায়ে, পুরোনো ইস্তুলটাই উঠে যাবে, থাকবে নতুন পাড়ারটা।

জমীর পণ্ডিত পাকড়াও করেন গিয়ে চৌধুরী স্বাহেবকে, এর একটা বিহিত করতে হবে। এতোদিনের পুরোনো ইস্তুল, গায়ের যতো শিক্ষিত ছেলে সব বেরিয়েছে এখান থেকে। পুঁচকে ছোড়ান্দেশ জালায় এখন উঠে যাবে নাকি আগনারা থাকতেই?

চৌধুরী বেশির ভাগ সময়ই শহরে পড়ে থাকেন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। গায়ের দিকে তাকানোর অবসর কম। বললেন, কি করতে বলেন?

বলবেন আর কি? করতে যা ইচ্ছে হয় জমীর পণ্ডিতই জানেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে ইস্তুল চালিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। নতুন ইস্তুলের পাঞ্জাব পড়ে এখন তাঁর ইস্তুলে ভাঙ্গ ধরেছে। তারই স্বর্যোগ নিয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে অপমান করে আসে হাশিমের মতো মাহুশ। চাপা গাগে গর্জে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, ছ্যাচড়াদের ধরে ‘চৌদো-পো’ করে দীড় করিয়ে ঝাখুন সতৰ দিন, ইস্তুল বাচাবার ব্যবস্থা করুন। আমার ছেলেমেয়ে পড়ে না শুধানে, পড়ে আপনাদেরই ছেলেমেয়ে।

চৌধুরী ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট—

: রিপোর্ট বেরোয়নি এখনো, কবে বেরবে খোদাই জানে। আপনি টাউনে থেঁজ নিন। দৱকার হ'লে আমি গায়ের লোককে দিয়ে দৱখাণ্ট করবো।

ওই এক ভরসা আছে জমীর পণ্ডিতের। গায়ের অনেক লোকই এখনো তাঁর পক্ষে। এমন কি, ইস্তুল দু'টিকে কেজ করে দ্বীতীয়তো ছাট হল গড়ে উঠেছে। পথে-ঘাটে তাদের বাগড়া শুনতে পান তিনি অহংক। জিনিসটা তাঁর ভালো লাগে না। লেখাপড়া পরিজ্ঞ কাজ। তাঁর অন্তে বাগড়া হবে; এ তাঁর কাছে অসহ মনে হয়। আর বাগড়া করবার আছেই বা কি? তিনি তো চান না যে, নতুন পাড়ার ইস্তুল উঠে যাক। ইস্তুল বড় বাড়ে, তড়োই ভালো।

নতুন পাড়ার লোকেরাও কি তা বোবে না ? বোবে, তবু আলগা ঝটোনি
করে ঠাকে ঠাট্টা করে এলো সেদিন হাশিম। সরকার শিক্ষক দিতে পারবে
না ? সাহায্য দিতে পারবে না অতো ? বয়ে গেছে তাতে, এতো দিনই বা
সরকার কি করেছিলো সাতটাকা করে সাহায্য দেওয়া ছাড়া ? ছয় মাস,
এক বছর পর সেই সাতটা টাকা পেয়েও যদি ইস্তুল চলতে পারে, তাহলে
এমনিতেও চলবে। শিক্ষক যদি উপরওয়ালারা দিতে পারে ভালোই। তিনি
সানন্দে ছেড়ে দেবেন ইস্তুল। না দিতে পারে, দোষ নেই তাতেও। সে-রকম
দুর্ঘটনা ঘটলে,—জমীর পণ্ডিত আজকাল প্রায়ই ভাবছেন,—নিজেই চালিয়ে
যাবেন ইস্তুল, যতদিন বাচেন। আজার ইচ্ছে থাকলে খরচের অঙ্গে কাজ
আটকে থাকবে না। ইস্তুলের ভবিষ্যত সবচেয়ে ধারা সদেহ প্রকাশ করেছে,
তাদের তিনি জানিয়েও দিয়েছেন সে কথা। এসব কি বোবে না হাশিম ?
বোবে, গাঁয়ের লোকেও বোবে। তবু ঝগড়া করে।

এসব ঝগড়া থারাপ লাগে জমীর পণ্ডিতের। কিন্তু আবার ভরসাও আসে
এরই মধ্যে থেকে। গাঁয়ের লোকের মতামতটা একেবারে থেলো নয়। ট্রেনিং
বা উচ্চশিক্ষা পাননি বলেই ঠার এতোদিনের অভিজ্ঞতাও সরকারী মাপকাঠিতে
আতারাতি কুঁচিয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। ইস্তুল যে ছেলেমেয়ে বেশি
আসতে পারে না, সেও তো ঠার দোষ নয়। উটা একেবারে আলাদা জিনিস।
ছেলেদের ইস্তুলে দেওয়ার মতো পেটের ভাত কয়জনের বাকি রয়েছে ? ছাজের
অভাব ঘটেছে বলে ধারা ইস্তুল তুলে রিতে চায়, তারাই-বা কয়জন খোজ
রাখে এসবের ? আশৰ্দ্য,—জমীর পণ্ডিত মনে মনে বলেন,—আশৰ্দ্য এই
মাহুষগুলো !

চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আমার সাধ্যে যতদূর কুলোম, তার ক্রটি হবে না।
আপনি ব্যস্ত হবেন না, পণ্ডিত মাহেব। চা খাবেন একটু ? দাঢ়ান। রাখ,
চা নিয়ে আঁঘতো মা, কাপ দুঃকে !

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন জমীর পণ্ডিত, একটা গোলমাল শনে থেমে
গেলেন। বাড়ির পাশেই কোথায় যেন একদল ছেলে চেঁচামেচি করছে।
কান পেতে উন্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছড়া,—

পুরোন পাড়ার পাঠশালা,—

পু-ই-মাচানে আটচালা !

বেঁকি গুলো সক সক,

ছাঞ্জলো আদত গুৰু !

সঙ্গে সঙ্গে টিটকারী-সহ আরেক ললেন উত্তর এবং,—

নতুন পাড়ার পাঠশালা,—

চালে খালি বারঝালা,

মাস্টারগুলো বকের ঠ্যাঃ

ছাজ ভাকে ঘ্যাঙ্গুর ঘ্যাঃ।

খোচা-খাওয়া বাবের মতো লাফিয়ে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, কি ! এতো
দূর আশ্চর্ধা ! শিক্ষার নামে এতো নোংরামি শিখছে সব ! এক্সনি দিছি
ঠাণ্ডা করে ।

চোখের পলকে উঠে দাঢ়ালেন হারেশ চৌধুরীও । তাঁর মোটা কোমরটা
জড়িয়ে ধরে বললেন, পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন ?

ঃ না, না, ছেড়ে দিন আপনি, শিগগির ছেড়ে দিন । এ নোংরামির শাস্তি
দিতেই হবে ।

বুড়ো মাঝবের গায়ে অসীম শক্তি । মোক্ষে প্রতাপ, চেহারা দেখেই
বাড়ির লোক থেকে শুরু করে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে উঠে, যা
কেটে আবার আকশ্মিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে স্বেচ্ছের ধারা,—অতএব যে চেহারা
ভয়কর ভাবে রহস্যময় সেই চেহারা থেকে আশন ছিকরে বেরকচে । দাঢ়ি-গোক
যেন সেই আঙুনের শিখা । ভয় পেয়ে গেলেন হারেশ চৌধুরী নিজেও । এ-
মাঝবকে ছেড়ে দেওয়া চলে না কক্ষনো । গোপন্থে কোমর টেনে ধরে বললেন,
জোড় হাত করছি, পণ্ডিত সাহেব, দোহাই আপনার—

বাগু এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই । কিছুই বুঝতে পারেনি সে । বাপের
দেখাদেখি শুধু চোতাতে লাগলো, যাবেন না, পণ্ডিত সাহেব । নতুন পাড়ার
ওনের ছড়া ওনেই তো এরা ছড়া বেঁধেছে । যাবেন না আপনি—

দোহাই ওনে খেয়ে গেলেন জমীর পণ্ডিত । বেগতিক কুঁকে পক্ষ-বিপক্ষের
সমন্ত ছেলেও ততক্ষণে সরে পড়েছে । চৌধুরীর দিকে কিরে তিনি বললেন,
কি জব্বত বেয়াদ্বাৰ ! আমি ওনের মুকুটী নই ? ওনেৰ বাপ চাচাকে
পড়াইনি ?

ঃ কাজটা ওনেৰ নিশ্চয়ই অগ্যায় হয়েছে । কিন্তু ছেলেমাঝুৰ স'ব । এতো
আনই যদি ধাকবে, তাহলে আৱ লেখাপড়াৰ কি প্ৰৱোজন হিল ? আপনি
ব্যস্ত হবেন না । ইস্কুলেও তো বলে দিতে পারবেন কিংবা বাপ-মাকে—

ঃ ইয়া, ইয়া তাই কৱিবো । বাপ-মাকে শুরু আমি আবাব টেনে আনব
ইস্কুলে । দেখে নেবেন আপনি ।

পেছন কিরে চৌধুরীর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রাগু। তখনি প্রচণ্ড ধমক লাগালেন তাকে, কি দেখছিস, হতভাগী যেমে? বা পড়গে যা!

হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন তারপরই। ইংগাতে ইংগাতে এসে উঠলেন বাড়িতে। পুত্রবধু উঠোনে ধানে পা দিছিল আস্তে আস্তে। নেহাতই নতুন বউ, বিয়ের পর এই প্রথম এসেছে খন্দুবাড়ি। তাকেও ধরকে উঠলেন, খেলা করা হচ্ছে?

চমকে উঠে বেচারী পা চালিয়ে দিল অসংযত জোরে। উঠোনময় ধান ছড়িয়ে পড়লো।

পড়ানোর শেষে বহুদিন পর আজ গল্প বলছিলেন অমীর পঙ্গিত। সেকেও পঙ্গিত আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। সমস্ত ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এসে বসেছে। শুনছিল উৎসাহ ভরে। কিন্তু গল্প শেষ করবার আগে হঠাত চোখে পড়ে গেল পেছনের বেঞ্চির দিকে। দেখলেন, রাগু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে—তখন ইস্কুল নতুন খোলা হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম অভ্যেস হয় পড়ানোর শেষে গল্প বলা, সহজ কথায় ছলে কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া। মন তখন তাঁর স্থপে বিভোর, আদর্শের উদ্বাদনায় মাতাল! কান পেতে শুনতে সবাই, তাঁর আভাবিক গান্ধীর্থ সহেও। ইস্কুলের প্রতি, পঙ্গিতের প্রতি তাঁতে টান বেড়েছিলো ছেলেমেয়েদের। কিন্তু বেশিদিন সেই গল্প বলা চলেনি। একদা আকস্মিক পরিদর্শনে এসে কোনো ইন্সপেক্টর তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন গল্প বলতে। ইস্কুলের তখন জোর স্ফনাম। তাঁরই মেহনতের ফলে। স্মরণীয় কারো কিছুই হল না, হল গল্প বৃক্ষ।

আজ আর এক কারণে ধরক দেওয়ার প্রয়োগ হল না অমীর পঙ্গিতের। সবাই শক্রতা করেছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে অধৈর্য হলে তো চলবে না। রাগুকে ইঞ্জিন করলেন শুধু।

রাগু চোখ ব্রগড়ে সোজা হয়ে বসতেই বললেন, তোদের বড় কষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেব ডাঁগুলি খেলার জন্ম।

সত্যিই নিরেট মাথা রাগুর। বিজ্ঞপ্তা বুঝলো না। পিট পিট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল ছুটি প'ন সা'ব?

হাল ছেড়ে দিলেন অমীর পঙ্গিত। ছুটি দেওয়ার শেষ আয়োজনে সারাদিনের জন্মানো মালিশ শুনতে চাইলেন এবার, ধাক ও সব, কার কি মালিশ বল দেখি এখন।

নালিশ নিয়ে এল রাতই প্রথম, প'ন সা'ব, কাল হাতে ফরিদ আমার
আখসের শিয় ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিলো !

নৈতিক ধারিষ্ঠে ঘরে বাইরে সমস্ত বিচারের অধিকার নিয়েছেন জমীর
পশ্চিম। বিশ্ব নালিশের ধারা হেথে শিউরে উঠলেন। ইয়ুল উঠে গেলে
এদের কি হবে? শক্তে জিজেস করলেন, কার শিয় রে, ফরিদ?

উভয়ও দিল রাতই, আমার সীম, প'ন সা'ব। বেচতে প্রিয়েছিলাম।

বাজার-দূর ধাচাই করে পশ্চিম ভরিযানা করলেন ফরিদকে, ছটে গয়সা
এনে দিবি কাল।

বিচার শেষ হতেই নজরে পড়লো, কে যেন দাঢ়িয়ে রয়েছে দরজার
ওপাশে। যিচিমিটি হাসছেও বুঝিবা। গজীর গলায় হাক দিলেন, কে?

এগিয়ে এলো ফরিদের বাপ। মাথা চুলকে বললো, একটা কথা ছিলো
প'ন সা'ব। ফরিদের—

: কি হয়েছে ফরিদের?

: জী গেরত ঘরের ছেলে,—কাজ-কর্ম বেড়ে গোছে এখন—

এক সুহৃত্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল জমীর পাঞ্জিতের কাছে। ডিঙ্ককঠে
বললেন, এ-গাঁয়ের আর কোনো গেরহর ছেলে সেখাপড়া শেখেনি?

ফরিদের বাপ আবার মাথা চুলকে শুধু বললো, জী—

নিজের কাজের কথায় এসে এবার জমীর পশ্চিম পাণ্টি আকৃষণ চালালেন।
হারেশ চৌধুরী তদবির করছে শহরে। গ্রাম থেকে এক লাখ দুর্বাস্তও সেখা
হয়েছে। সেখানা সকালবেলা ফরিদের বাপের হাতেই মেওয়া হয়েছিলো
সহ নেবার জন্মে। তারই ফলাফল জানতে চাইলেন এখন, সহ নেওয়া শেষ
হয়েছে?

ফরিদের বাপ তায়ে ভয়ে বললো, জী না। দিতে চায় না। বলে—

: দিতে চায় না! কি বলে?

তৌক্ত-মৃষ্টিতে চেয়ে বাইলেন জমীর পশ্চিম। ডয়ানক অস্থিতি বোধ করতে
লাগলো ফরিদের বাপ, ইত্তত করে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো।
তাৰপুর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে ঘেতে লাগলো, বলে যে, উনি আৱ
পঢ়াবেন কি করে? বুড়ো মাহুশ, মাথাৰ ঠিক নেই। তাৰ উপৰ বাতেৰ
ঝোঁঝি। মাৰাজ পঢ়াৰ সময় সেজদা দিয়ে উঠে সোজা হয়ে বলতেও পারেন
না। ইচ্ছুতে ভৱ দিয়ে দাঢ়িয়ে পড়েন। সারাজীবন ছাঁদের ‘নিল ভাইন’
করিবে এসে এখন প্রায়স্থিত কৰছেন—

: কি—কি বললে ?

ধৰক দিলেন বটে জমীৱ পঞ্জিত। কিন্তু পৱেই একেবাৰে স্ফৰ্পিত হয়ে বউলেন কথেক মুহূৰ্ত।

ফরিদেৱ বাপ কি যেন বলতে যাচ্ছিল আবাৰ। কিন্তু বাধা দিয়ে চিংকাৰ কৰে উঠলেন জমীৱ পঞ্জিত, থাক, থাক, আৰ বলতে হবে না। ভুল আমাৰই হয়েছে। হবে না ? ধস্তাৰ কাজ নকল দিয়ে হয় কখনো? কোথাৰ সে দৱখাণ্ট ? বাৰ কৰো, বাৰ কৰো শিগগিৰ।

ফরিদেৱ বাপ হাতেৰ মুঠো থেকে একখানা মোচড়ানো কাগজ বাৰ কৰে দিলো। হঠাৎ ইঙ্গুলেৰ ছুটি দিয়ে জমীৱ পঞ্জিত বেৰিয়ে পড়লেন।

ইঙ্গুলেৰ সিমেন্ট ওঠা বাবান্দায় পায়চাৰি কৰছেন জমীৱ পঞ্জিত। পায়চাৰি কৰছেন বেলা নয়টা থেকে। এখন হয়তো বারোটা বাজে। ভাবছেন, এতো বেলা হল, তবু ছেলেমেয়েৰা আসছে না কেন ? সময়-জ্ঞান আৰ এদেৱ কোনোদিন হবে না দেখছি। না কি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধৰে আনতে হবে সকলকে ?

ভাবতে ভাবতে চকিতে একটা সন্দেহ দেখা দিলো মনে। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি—গায়ে খবৱ রঢ়ে গেছে, এ ইঙ্গুল সত্ত্ব সত্ত্ব ইঠ যাবে। ইন্সপেক্টৱেৰ অফিস থেকে খোলাখুলি কোন চিঠি অবশ্য এখনো আসেনি। হাৰেশ চৌধুৱী শিঠি দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। তিনিও পৰিকাৰ কৰে কিছু জানাননি। কিন্তু যা আভাস দিয়েছেন, তাৰে ভৱসাজ্জনক নয়। এদিকে নতুন পাড়াৰ ইঙ্গুলে নাকি খবৱ এসে গেছে, তাদেৱ ইঙ্গুল থাকবে। তাৰ মানেই হল—

গায়েৰ পথে বেকনো এখন দায় হয়ে উঠেছে তাঁৰ পক্ষে। নতুন পাড়াৰ মল তো আছেই। তাৰপৰ, ধাৰা এতোদিন ছিলো তাঁৰ পক্ষে, বোধ হয় বিকল হওয়ায় তাৰাও সৱে পড়েছে। চক্ষুজ্জ্বার সই দিয়েছিলো বোধহয় তখন। কেউ কেউ আবাৰ নানান ছলে নতুন পাড়াৰ ইঙ্গুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে শুলু কৰেছে। যেমন ফরিদেৱ বাপ। কেউ কেউ বা মুখেৰ উপৰই পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে, তখনই তো বলেছিলাম, প'ন সা'ব, লাভ হবে না দৱখাণ্ট কৰে।

কিন্তু লাভ যে হবে না তাই বা কে জাবে ! সত্ত্ব খবৱ তো কেউই জানে না এখনো। যদি জানবেই, তাহলে এদিকে আট মশদিন ধৰে কেন কৰতক শুলো লোক ছেলেমেয়েকে আসতে দিছে তাঁৰ ইঙ্গুল ? ইছে কৰে তো কেউ নিজেৰ ছেলেমেয়েৰ মাথা খেতে চায় না।

তাহলে ? তাহলে ধৰটা সত্যি নয়। সিঙ্কাস্টায় পৌছতেই নতুন শক্তি 'পেলেন অমীর পঞ্জিত। নতুন আলোয় উঙ্গাসিত হয়ে উঠলো তাঁর ঘনটা। ঠিক হয়েছে, ইঙ্গুল তাঁকে চালাতেই হবে। ধারা তুলে দিতে চায় ইঙ্গুল তাদের মেখিয়ে দেবেন, ইচ্ছে করলেই এ ইঙ্গুল তুলে দিতে পারে না কেউ। গোমুখ' সব ! স্বাধীন হলে কি হবে ? শিক্ষার মর্ম এরা এখনো বোঝেনি। রহস্যলুঁজাহকে একবার কে ধেন জিজেস করছিলো, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কতো বছর বয়স থেকে ? হজরত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাদের জন্মের পঁচিশ বছর আগে থেকে। অর্ধাং তাদের বাপ-মাকে আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গোমুখ'রা কি আর কখনো এ হানীসের মর্ম বুঝেছে ? বোঝেনি। কিন্তু তিনি এবার বোঝাবেন।

অঙ্গুত একটা আঘাবিখাস জাগলো পঞ্জিতের মনে। আনন্দে বুকথানা ভৱে উঠলো। ভাবলেন, না, কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েরা আজ দেরি করছে, তাতে কি হয়েছে ? এমন দেরি তো ওরু বরাবরই করে। এই তো বছরখানেক আগে একদিন কেউই আসেনি মোটে। ছেলেমাহুব সব। হয়তো বা কোনো কাজে আটকেই পড়েছে। পড়া আর কাজের চাপে কতো পারে ওরা। আবার শুনতে পান, তাঁকে দেখে ওরা ভয়ও পায়। আহা, আশুক না আজ। আজ আর পড়াবেন না, গল্প শোনাবেন। আর, যদি হাসি ফুটে ওঠে পঞ্জিতের মুখে,—গোটাকভো ইটের কুচি ও হৃড়িয়ে রেখে দেওয়া যাক। ফাঁক পেলে একবার বাঘবন্দীও খেলে নেবে ওরা। প্রশ্নের চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো স্মেহভাজন শিশুর ছষ্টুমি দেখছেন যেন, এমনি ভাবে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আলতো হাতে কুচি হৃড়োতে থাকেন তিনি।

কুচি হৃড়োনো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সহস্রা পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, প'ন সা'ব।

পেছন কিরে সলজ্জ চাপা আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন অমীর পঞ্জিত, রাঙ্গ ? এসেছিস ? এতো দেরি কেন রে ?

রাঙ্গ বিষণ্ণ মুখে জওয়াব দিলো, আমাৰ আসাতো নঘ প'ন সা'ব। তাই, সময় কৱতে দেরি হয়ে গেল। কপালে নেই আমাৰ লেখাপড়া। খোদা মাথায় কিছু দেয়নি। নিজেৰ পড়াশোনা বক্ষ হলে দৃঢ় নেই। কিন্তু বাপজ্ঞান বলছিলো—

মড়াৰ মুখেৰ মতো বিবৰ্ণ হয়ে গেল অমীর পঞ্জিতেৰ মুখ। ধৰা গলায় বললেন, কি বলছিল রে ?

এক মুহূর্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মুখ নাখিয়ে লিলো রাণু, ওদের ইস্তলে: থবর এসে গেছে, প'ন সা'ব। আমাদের শেষ মলের কয়েক জনও গিয়ে ছুটেছে মেখলাম।

অর্থহীন চোখে চেয়ে পঙ্গিত শুধু বললেন, অঁয়া! কিন্তু রাণু, বিভু—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না জমীর পঙ্গিত। রাণুও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পর পঙ্গিত অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন, রাণু, বিভুরা কি আর পড়বে না।

: রাণু নাকি টাউনের ইস্তলে পড়তে থাবে।

: কই আমাকে তো কিছু বলেনি। একবার বলেও গেল না—ইস্তুলটা—
রাণু একবার ইতস্তত করে বললো, রাণুকে ডেকে নিয়ে আসবো,
প'ন সা'ব?

জমীর পঙ্গিত নীরবে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন।

বাড়ি কাছেই। অন্ধক্ষণের মধ্যে রাণু এসে পড়লো। মুখখানা কক্ষণ।
বললো, কাল টাউনে চলে যাবো, পঙ্গিত সাহেব। আশা বলেছে, ধালা-
মাদের বাড়িতে থেকে পড়তে হবে এবার।

জমীর পঙ্গিত বহুক্ষণ সাড়া দিলেন না। তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে
আর এক দুনিয়ায়। ইস্তুলটা একবারে চোখের সামনে ডেসে উঠলো যেন।
তিরিশ বছর আগের সেই চকচকে দেওয়ালটা। চাবীঘরের তাজা তাজা
শুলোবালি যাথা ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আভিনাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—
কিন্তু এবা যেন—এদের মেন পথ চলতে চলতে আজকেও দেখছেন, মনে হচ্ছে,
আর,—আর, ইস্তুলের আভিনাম যেন একটা নয়, দুটো, নাকি, আরো বেশি?
হয়তো। উহঁ, ঠিকই। সারা গায়েই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওরা, পঙ্গিত শুধু
চেরে চেয়ে দেখছেন।

দলগুলো ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় ছিলিয়ে গেল। (জমীর পঙ্গিত
দীর্ঘ নিখাস ফেললেন। শান্ত ঘাড়ি গৌফের ফাঁকে ভাঙ-পড়া মুখের
রেখাঙ্গলি কঠিন হয়ে উঠলো দৃষ্টি একবার। সংশয়ের দৃষ্টিতে ইস্তুল ঘরটাৰ
বিকে তাকালেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাঝ। ছবিটা আবার কিৱে আসতে
লাগলো তাৰপৰ। আৱ কিৱে এলো—স্পষ্ট হয়ে আৱ একটি জিনিস, বেঁচা
এতোদিন অস্পষ্টভাবে ঘোৱাকেৱা কৰছিলো তাঁৰ মলের মধ্যে। নিজেকে
সংযত কৰে এবাৰ আভাবিক গলায় বললেন, তোৱা কাল কখন থাবি মাঝ।)

বলতে বলতেই রাখুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন তিনি।

ঃ নটাৰ গাড়িতে।

ঃ চ, আমিও যাবো তোদেৱ সাধে।

রাখ, রাখ দুজনেই বিশ্বিত হয়ে বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

জয়ীৰ পণ্ডিত হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ কৰে থেকে বলে উঠলেন, বেটাৱা ভেবেছে কি? পুঁইশাকেৱ কতো ডগা কেটে থায় লোকে, তাই বলে কি গাছ মৰে? এক খোচা থেঁজেই আমি ইঙ্গুল তুলে দেব? দেখে আসি, দীড়া, একবাৱা ইন্সপেক্টৱেৱ অকিস্টা। আৱ, না হয় তো নিজেই মাইনে দিয়ে একটা মাস্টাৰ ধৰে আনি কোথাও থেকে।

জৈৎ উভেজিতভাৱে নিখাস ফেলতে ফেলতে একটুখানি থামলেন জয়ীৰ পণ্ডিত। তাৱপৰ আদেশেৱ স্বৰে রাখুকে বললেন, শোন, তোৱা বাপেৱ ওসৰ বাহানা। তুই পড়াশোনা নষ্ট কৱিসনে। নতুন ইঙ্গুলেই ভৱি হয়ে যা। আৱ, রাখ, তুই টাউনে যা, ইয়া টাউনেই—ঝুখন বাড়ি যা—তোৱা—

কিষ্ট আদেশেৱ স্বৰ ভেঁড়ে এলো, গলাৰ মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপৰ্যয় ঘটছে। রাখুৰ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জয়ীৰ পণ্ডিত আবাৱা বলতে চেঁষ্টা কৱলেন, ইয়া যা,—যা,—তোৱা—

হাতধানা এবাৱা রাখুৰ মাথা থেকে নেমে কাঁধেৰ পাশে ঝুকট। চেপে ধৰলো। পণ্ডিতেৱ মনে হল, এদেৱ যদি একেবাৱে বুকেৱ সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যেতো! নইলে যে শাদা গোফেৱ তলায় ঠোঁট দুটিকে এতোক্ষণ পৰ আৱা বাগ মানানো যায় না!

একটি তুলসৌগাছের কাহিনী সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ,

ধূমকের মত ধীকা ইট-সিমেন্টের চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়িটা। দোতলা, মন্ত ; রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাত নেই, তাই বাড়িটারও একটু জমি ছাড়বার ভঙ্গার বালাই নেই। তবে বাড়িটার পেছনে কিঞ্চ অনেক জায়গা। গোসলখানা—পাকবর পাইখানার মধ্যেকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো চের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঠালের দুর্ভেতপ্রাপ্ত জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাতসেতে মাটিতে ভ্যাপসা গচ্ছ, আর প্রথম স্রষ্টালোকেও স্রষ্টাস্তের ম্লান অঙ্ককার।

অত জায়গা যথন, সামনে থানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো ?—সে কথাই এরা ভাবে। যতিন ভাবে, বাগান না ধাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল, গুঁড়োজ-বকুল-হাঙ্গাহানা, ছ-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্ত না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরাম কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হঁকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালা স্বদৃশ শুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিআমবিলাসের জন্ত। গল্প-জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গলাটা কাহিনীময়, হাঙ্গাহানার গক্ষের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো ? মুখ বরাবর আন্ত চান্দটার পানে চেয়ে চুপচাপ কী বসে ধীকা যেতো না ?—আপিস থেকে ঝাস্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ঝঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙ্গে-ভাঙ্গে সে কথা আরো বার-বার মনে হয়।

এরা দখল করেছে বাড়িটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অহম্মান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভৱেন্দ্র ছজ্জগে এ শহরে আশা অবধি উদয়াস্ত তারা একটা যেমন-তেমন জেরার সকানে ঘূরছিলো। একদিন দেখলো ওই বাড়িটা, মন্ত

বড় বাড়ি অনমানবহীন অবস্থায় থা থা করছে। প্রথমে তারা বিশ্বিত হয়েছিলো। পরে সমলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমতুড়ানো কিপ্প উয়াদনায় এমন মত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনতপুরে ভাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। যখন কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভাব হয়ে নাববার প্রয়াস পেতো সে-ভাব তুলোধূনো হয়ে উঠে যেতো তীক্ষ্ণ সে-হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে যথন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাহিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু কখন দীড়ালো। জ্ঞাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে; জায়গা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অক্ষকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে কৌফি, ধান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এলে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিক বুঝতে পারছি। অম্যরা কী এ কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নীচে কোণের ঘরটা অ্যাকাউন্টস অক্সিসের মোটা মত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিবে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোকা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রাপ্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসে নি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিস এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ির উজ্জ্বারের জগ্নি সরকারের কাছে ধর্ম দিয়েছিলেন তা' নয়। দখলের কথা জানলে রিতেনও কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এতবড় একটা পরিবার দু'দিনের অন্ত শ্রেফ দেশ থেকে উৎসাহ করে দিতে পারেন, তার সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি! পুলিসে থবর দিয়েছিলো শো� ধারা শহরের অন্ত কোন প্রাপ্তে তখন ডাকাতির কিকিটে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে বা দু'ঘণ্টা আগেও এসে পৌছতে পারেন। নেহাত কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালেও মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফলে নিরীহ লোকেরাও আবার বীভিত্তি লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি

লাঠালাটি না করলেও তার অস্ত তৈরী হয়ে থেকে এবা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিসকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্সপেক্টর বিকলি না করে সদস্যবলে কিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন বোবালো করে রিপোর্ট দিলো যে মর্যাদা উজ্জ্বলের ভয়ে তার ওপরতামার কাছে সে রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেষ্ঠ মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কী। ধারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ির নিষ্কান্ত মালিক যদি এসে কিছু না করে তবে কেন অনর্থক মাথা ব্যথা করা। তাছাড়া, এবা কেবানী হলেও তঙ্গলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে আনলা দরজা ভেড়ে ফেলছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে তা' নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠলো বাড়িটা। এদের অনেককেই কলকাতায় ইক্যান লেন, ধালাসী পট্টিতে, বৈঠকখানায় দপ্তরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা কমক ধানমামা লেনের অক্ষ্য দুর্গং নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নৌকহৃষি দালানের ফ্যাশানে দেওয়ালে মন্ত মন্ত জানলা, পেছনে খোলামেলা উঠোন, আরো পেছনে বনঅঞ্চলের মত আম আম কাঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন বেলাটের মত এক-একধানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু ঘরে নির্বাঙ্গ হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছাঁচাড়ি দেখে অত্যন্ত খুশি। এবার মনে হয় বাঁচল, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু' হাজার-ওয়াণাদের মত মুখে জৌলুস আসবে, ম্যালেরিয়া কালাজরের জীবাশু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউহুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন স বালবেলা কান আবর্জনা-ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কচ্ছ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গুচ্ছ নাকি ভালো, যদ্বা জীবাশু ধৰ্ম করে। তাছাড়া সে উৎকর্ত গুচ্ছ ড্রেসের পচা ভোসকা গুচ্ছও বেমালুম ঝুঁড়িয়ে দিত। ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইহুর কিংবা বিড়াল মরে পচে ধাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউহুস ভাবত্তো মন কী। অস্তপক্ষে যদ্বা জীবাশু ধৰ্ম হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন ; রোগাপটকা ছৰ্বল মাঝুৰ। এখানে দোতলার দলিল

ଦିକେର ସବୁ ସରଟାର ଜାନଳାର ପାଶେ ଥରେ ଶ୍ରୀଲୋକେର ସୋନାଳୀ ଛଳକାଳି ଯ୍ୟାକଲିଓଡ ଟ୍ରୀଟେର ଆସ୍ତାନାର କଥା ମନେ କରେ ଶିଉରେ ଓଠେ । ଭାବେ, ଏତିରିଲେ କୀ ହରେ ଗେହେ କେ ଜାନେ ! ଟାକା ଧାକଳେ ବୁକ୍ଟା ଏକବାର ମେଘିରେ ଆସିଲେ ଡାଙ୍କାରକେ । ମାବଧାନେର ମାର ନେଇ ।

ଭେତ୍ରେ ରାଜୀବରେ ବୀ ଧାରେ ଏକଟା ଚୌକୋନୋ ଆଖ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଇଟେର ମଞ୍ଚେ ଉପର ଏକଟି ତୁଳସୀଗାଛ । ଏକଦିନ ସକାଳବେଳାଯି ନିମେର ଡାଳ ଦିଯେ ମେହୋଯାକ କରଣେ କରଣେ ମୋଦାବେର ଉଠୋନେ ପାଇଁଚାରି କରଛେ ହଠାତ ତାର ନଜରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁଳସୀଗାଛଟ । ମୋଦାବେର ହଜୁଗେ ମାହୁସ, ଏକଟୁ କିଛି ହଲେଇ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ କରାଇ ବୈ ବୈ ଆସ୍ତାନ୍ତର ଉଠିଯେ ଦେଇ । ଏରା ମବ ଉଠେ ଏଲୋ । ସତଟା ଆସ୍ତାନ୍ତ ତତଟା ଶୁଭତର ନା ହଲେ ଓ କିଛି ତୋ ଅନ୍ତତ ଘଟେଇ ।

ଏହି ତୁଳସୀଗାଛଟ । ଏଟାକେ ଉପରେ ଫେଲିବା କେବଳ କେବଳ ହବେ । ଆମରା ସଥି ଏସେହି ବାଢ଼ିତେ କୋନ ହିନ୍ଦୁମାନୀର ଚିହ୍ନ ଧାରେ ନା ।

ସବାଇ ତାକାଳୋ ଦେଦିକେ । ଥିଲେର ରଙ୍ଗେ ଭାଭାୟ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ପାତାଖଲୋ କେମନ ମାନ ହେ ଆଛେ । ନୀତେ କ'ଦିନେର ଅର୍ଥରେ ଘାସ ଗଜିଯେ ଉଠେଇ । ଆଶର୍ଦ୍ଦ, ଏଟା ଏତଦିନ ଚୋଥେଇ ପଡ଼େନି, କେମନ ଯେବେ ଲୁକିଯେ ଛିଲୋ ।

ଓରା କିନ୍ତୁ ହଠାତ ଶୁଭ ହେ ଗେଲ ! ସେ ବାଢ଼ି ଏତ ଶୁଭ ମନେ ହେବେ, ସିଁଡ଼ିର ସରେର ମେଘାଲେ କୀଟା ହାତେ ଲେଖା କଟା ନାମ ଧାକଣେଓ ଏମନ ବେ-ଓସାରିଶ ଠେକେଇ ସେ, ବାଢ଼ିର ଚେହାରା ହଠାତ ବଦଳେ ଗେଲୋ । ତୁଳସୀଗାଛଟ ଆଚମକା ଧରା ପଡ଼େ ଗିଯେ ଅନେକ କଥା ଯେବେ ବଲେ ଉଠିଲୋ ।

ଏଦେର ଶୁଭତା ଦେଖେ ମୋଦାବେର ଆରେକଟା ହକ୍କାର ଛାଡ଼ିଲୋ । ଭାବହୋ କୀ ? କଥା ନେଇ, ଉପରେ ଫେଲୋ ।

ହିନ୍ଦୁ ବୀତିନୀତି ଏଦେର ଭାଲୋ ଜାନା ନେଇ । ତବୁ କୋଥାଯ ଥିଲେଇ ହିନ୍ଦୁ ବାଢ଼ିତେ ପ୍ରତି ଦିନାଷ୍ଟେ ଗୃହକର୍ତ୍ତ୍ଵ ତୁଳସୀଗାଛେର ତଳେ ସଙ୍କ୍ୟା-ପ୍ରଦୀପ ଜାଳାୟ, ଗଲାୟ ଝାଟଳ ଦିଯେ ପ୍ରଣାମ କରେ । ଘାସ ଗଜିଯେ ଖଟ୍ଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚେହାରାର ଏ-ତୁଳସୀଗାଛେର ତଳେଓ ପ୍ରତି ସଙ୍କ୍ୟାୟ କେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଦିଲୋ । ଆକାଶେ ସଥି ସଙ୍କ୍ୟାତାରାଟି ବଲିଟ ଏକାକୀତେ ଉଚ୍ଚଲ ହେ ଉଠିଲୋ, ଠିକ ଦେଇ ସମୟ ସନାଇମାନ ଛାହାର ମଧ୍ୟେ ଆନନ୍ଦ ସିଁଦୁରେର ନୀରବ ରଙ୍ଗାକ୍ଷୁର ଶର୍ପେ ଏକଟି ଶାନ୍ତ ଧୀର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ ଉଠିଲୋ ପ୍ରତିଜିନି, ହୟତୋ ବହରେର ପର ବହର ଏମନି ଜଳେଇ । ସବେ ଦୁର୍ଦିନେର ବଢ଼ ଏସେଇ, ହୟତୋ କାହୋ ଜୀବନ-ପ୍ରଦୀପ ନିବେ ଗେହେ, ତବୁ ହୟତୋ ଏ ପ୍ରଦୀପ ଦେଉଥା ଅହୁଠାନ ଏକଦିନେର ଜଣ୍ଠା ସବୁ ଧାକେ ନି ।

ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ତ୍ଵ ବହରେର ପର ବହର ଏ ତୁଳସୀତଳେ ପ୍ରଦୀପ ଦିଯେଇ ଲେ ଆଜ

কোথায় ? কেন চলে গেছে ? মতিন এক সময় রেলওয়েতে আজ কোরতো। সে ভাবে, হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈষ্ণবাটি, হাওড়ায় কোন আঞ্চলীয়ের আস্তানায়। লিল্যাউ বা নয় কেন। বিশাল রেলইঞ্জারের পাশে মহণ একটি কালো চওড়া পাড়ের শাড়িটা ঝুলছে হয়তো। সেটা এ গৃহকর্ত্তারই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনাস্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সক্ষ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্তার চোখ ছলছল করে।

গতকাল খেকে ইউনিসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে কথা বললে,—ধাক না ওটা। আমরা তো আর পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঝ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালোই। সর্দি কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদারের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। উদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মাহুশ। মুখে দাঢ়ি, পাঁচ ঘণ্টাক নামাজ আছে, সকালে নাকি কোরাণ তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সক্ষ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্ত্তার চোখের কথা কী ওর মনে হলো ? অক্ষত দেহে তুলসীগাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়িটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতায় খিমিয়ে আসা নিষ্ঠেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড়াও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবরকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, মোদারের বলে।

বলে, হিন্দুদের নৌচতা ও গোড়ামির অঙ্গই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

তারপর তাদের অবিচার-অভ্যাচারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মক্ষুদ মিঞ্চ কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা কম কী। মোদারের দাত ধিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা আমরাও হলপ করে বলতে পারি দোষটা উদের, ওরাও শালা তেমনি হলপ করে বলতে পারে দোষটা আমদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোরা মুশকিল। ভাবে, হয়তো, আমরাই টিক। আমদের ভুল হবে কেন ? আমরা কি জানিন ? আমদের ?

କାଟା ସଂଶୟେ ହୁଲେ ହୃଦୀ ଡାନେ ହେଲେ ଗିଯେ ହିର ହୟେ ଗେଲୋ, କାଟାଟି କଥନୋ କଥନୋ ନା ବୁଝେ ବୁଝେ ହେଲେ ଆମେ ବଳେଇ ଓ ବାମପହିର ଅପଦାନ ।

ପାର୍ଯ୍ୟାନାର ଦିକେ ସେତେ ସେତେ ରାଜ୍ଞୀଦରେର ପାଶେ ତୁଳସୀଗାଛଟ ଚୋଥେ ପଡ଼େ । କେ ଆଗାହା ସାଫ୍ କରେ ଦିଲେଛେ । ପାତାଖଲୋ ଶୁକିଯେ ଉଠେ ଖରେରୀ ରଂ ଧରେଛିଲେ, ଆବାର ସେନ ଗାଁ ରଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟେ କେମନ ସତେଜ ହୟେ ଉଠେଛେ । କେ ତାର ଗୋଡ଼ାଯ ପାନି ଦିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଖୋଲାଖୁଲି ଭାବେ, ଲୋକ ଦେଖିଯେ ଦିଲେ ନା । ସମାଜେ ଚକ୍ରଲଙ୍ଘୀ ବଲେ ଏକଟା କଥା ତୋ ଆଛେ ।

ଇଉତ୍ସ ଭେବେଛିଲୋ ମ୍ୟାକ୍‌ଲିଯାଡ ସ୍ଟ୍ରୀଟେର ଚାମଡ଼ା-ବ୍ୟସନୀକେର ନୋଂରା ଆନ୍ତାନାୟ ଆର କଥନୋ କିମ୍ବରେ ସେତେ ହବେ ନା—ଏଥାନେ ଆଲୋବାତାସେର ଯାହେ ଜୀବନେର ଅନ୍ତ ସେ ସେଇ ଗେଲୋ । କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳ ଭେବେଛିଲ । ଶୁଦ୍ଧ ଇଉତ୍ସ କେନ, ସବାଇ—ଧାରା ଭେବେଛିଲ ଏ-ମନ୍ଦାର ଦିନେ ଭାଲୋ କରେ ସେତେ ନା ପାକ, ବାଡ଼ିତେ ପ୍ରମୋଜନ ମତ ଜୀବନେର ଦୁଷ୍ଟାପ୍ୟ ଆରାମଟ୍ଟକୁ କରିବେ—ତାରା ଅନ୍ୟୋକ ତୁଳ କରେଛିଲୋ । ତୁ ଯାହୋକ ସାମନେ ଜମି ନେଇ । ଥାକଲେ ଶ୍ରୀ ଆଜ ବାଗାନ କରତୋ ଏବଂ ଦେଇ ସମୟେ ଅନ୍ତ କିଛି ନା ହୋକ, ଗୀର୍ମାନ୍‌ଫୁଲେର ଗାହ ବଡ ହୟେ ଉଠେତୋ । ତାହଲେ କୌ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୁଳଇ ନା ହତୋ ।

ମୋଦାରେର ହନ୍ତଦନ୍ତ ହୟେ ଏସେ ବଲଲୋ, ପୁଲିଶ ଏସେଛେ । କେନ ? ଭାବଲୋ, ହୟତୋ ରାନ୍ତା ଥେକେ ପାଲିଯେ ଏକଟା ଛ୍ୟାଚଡ଼ା ଚୋର ବାଡ଼ିଟାଯ ଏସେ ତୁକେଛେ । କିନ୍ତୁ ଶେଟା ଖରଗୋଶେର ମତ କଥା ହଲୋ । ଶିକାରୀର ସାମନେ ପାଲାବାର ଆର ପଥ ନା ପେଯେ ହଠାତ ବସେ ପଡ଼େ ଚୋଥ ବୁଝେ ଖରଗୋଶ ଭାବେ, କହି ଆମାକେ କେଉ ଦେଖିତେ ପାଇଁ ନା । ତାରାଇ ତୋ ଚୋର, କେବଳ ଗା ଢାକା ଦିଯେ ନା ଥେକେ ଚୋଥ ବୁଝେ ଆଛେ ।

ପୁଲିଶେର ସାବ-ଇନ୍‌ସ୍ପେକ୍ଟର ସାବେକୀ ଆମଲେର ଛାଟ ବଗଲେ ରେଖେ ତଥନ ଦାଗ ପଡ଼ା କପାଲେର ଘାମ ମୁଛିଛେ । କେମନ ଏକଟା ନିରୀହ ଭାବ । ପିଛନେର ବନ୍ଦୁକଧାରୀ କନେଟବଳ ଦୁଟୀକେ ମନ୍ତ୍ର ଗୌଫ ଥାକା ସର୍ବେ ଆରୋ ନିରୀହ ଦେଖାଇଛେ । ଓରା ନିଷ୍ଠକ ଭାବେ କଢ଼ିକାଟ ଶୁନନ୍ତେ ଲାଗଲୋ । ଓପରେ ଘୁଲଘୁଲିର ଥୋପେ ଏକ ଜୋଡ଼ା କବୁତର ବାସା ବେଁଧେଛେ । ଏକଟା ଶାଦୀ ଆବେକଟା ଧୂର । ତାଓ ଦେଖିତେ ପାରେ ତାରା ତାକିମେ ତାକିମେ । ହାତେ ବନ୍ଦୁ ଆଛେ କିନା ।

ଯତିନ ସବିଲ୍ୟେ ବଲଲୋ,—

—ଆପନାର କାକେ ମରକାର ?

—ଆପନାଦେଇ ସବାଇକେ । ଆପନାରା ବେ-ଆଇନୀ ଭାବେ ଏ ବାଡ଼ି କବଜା

କରେଛେ । ଚରିଶ ସଟୀର ମଧ୍ୟେ ଆମନ୍ଦେର ଏ ବାଡ଼ି ଥାଳି କରେ ଦିତେ ହୁବେ—
ବ'ଲେ ଅର୍ଡାର ଦେଖାଲୋ ।

ବାଡ଼ିର କର୍ତ୍ତା ତାହଲେ ଫିରେ ଏମେହେ । ଟ୍ରେନ ଥେକେ ନେମେ ଏଥାମେ ଏମେ
କାଙ୍ଗଟା ମେଥେ ଶୋଜା ଥାନାୟ ଚଲେ ଗେଛେ । ଏଥିନ ମରେ ଏମେହେ କିନା ହେବାର
ଅନ୍ତ ଆଫଜ୍ଜଳ ଏକବାର ଗଲା ଉଚିଯେ ଦେଖାଲୋ । କେଉ ନେଇ । ପେହନେ କେବଳ
ଗୌଫଓୟାଳା ବନ୍ଦୁକଧାରୀ କନେସ୍ଟବଲ ହୁଟୋ ।

—କେନ ? ବାଡ଼ିଓୟାଳା କୀ ନାଲିଶ କରେଛେ ?

—ଗଭର୍ମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ି ରିକ୍ଵୁଇଜିନ କରେଛେ ।

ଅନେକକଷଣ ପ୍ରକ ହରେ ଥାକଲୋ ତାରା । ଅବଶେଷେ ମତିନ ବଳଲେ,—

—ଆମରା ତୋ ଗଭର୍ମେଣ୍ଟେରି ଲୋକ ।

ମାରେ ମାରେ ମାନ୍ୟରେ ନିବୁଜ୍ଞିତା ମେଥେ ଅବାକ ହତେ ହୁଏ । କଥା ଖନେ ନିଷ୍ଠକ
କନେସ୍ଟବଲ ହୁ'ଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ିକାଠ ଥେକେ ଚୋଥ ନାମିରେ ତାକାଲୋ ତାମେର ପାନେ,
ଭାବାଚନ୍ଦ୍ର ଚୋଥ ହଠାୟ କଥା କରେ ଉଠିଲୋ ।

ବାଡ଼ିତେ ଏରପର ଏକଟା ଛାଯା ନେମେ ଏଲୋ । ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନେଇ । କୋଥାମ୍ବ
ଯାଇ ଏହି ଚିନ୍ତା । କେଉ କେଉ ରେଗେ ଉଠେ ବଳେ, କୋଥାଓ ଯାବ ନା, ଏହିଥାନେଇ
ଥାବବୋ । ମେଧି କେ ଖଠାୟ । କେଉ ଯଦି ଏ ବାଡ଼ିର ଚୌକାଠ ପେରୋଯ ତବେ
ମେ ଆମନ୍ଦେର ଲାଶେର ଉପର ଦିଯେ ଆସବେ । (କୋଥାମ୍ବ ଛାତ୍ରରା ନାକି ଏମନି
ଏମନି ଗାୟର ଜୋରେ ଏକଟା ବାଡ଼ି ଦୂରି କରେ ଆଛେ । ତାମେର ଖଠାୟର ଚେଷ୍ଟା
କରେ ସରକାରେର ଉଚ୍ଚତମ କର୍ତ୍ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକି ନାତ୍ତନାବୁନ୍ଦ ହୁୟେ ଗେଛେ । ମେ କଥାଇ
ସ୍ମରଣ ହୁୟ ।) ଅବଶେଷେ ରଙ୍ଗ ତାମେର ଗରମ ହୁୟେ ଘଟେ । ବଳେ କଥିଥିନୋ ଛାଡ଼ବୋ
ନା । ସେ ଆସେ ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ମେ ଯେଣ ଏକଥା ଜେନେ ରାଖେ ସେ, ତାକେ ଆମନ୍ଦେର
ଲାଶେର ଉପର ଦିଯେ ଆସନ୍ତେ ହୁବେ ।

କ'ଦିନ ଗରମ ରଙ୍ଗ ଟଗବଗ କରଲୋ । କାଜେ ମନ ନେଇ, ଥାଓୟାଯ ମନ ନେଇ ।
କେବଳ କୃଧା, ତିକ୍ତରିଲେ ସିକିତ୍ତ ବାଁକାଲୋ କଥା । କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶ କଥା କମତେ
ଲାଗଲୋ । ଏବଂ ଏହେର କଥା ଥାମଲେ ରଙ୍ଗ ଠାଣ୍ଡା ହତେ କ'ଦିନ ।

ଏହା ତୋ ଆର ଛାତ୍ର ନୟ । ଏହା ସେ କୀ ସେ-କଥା ଦର୍ଶ କ'ରେ ଦେଦିନ ପୁଲିଶକେ
ନିଜେରାଇ ତୋ ବଲେଛିଲୋ । ବାଡ଼ି ରିକ୍ଵୁଇଜିନ ହେବାର କଥା ଖନେ କିଛିକଣ
ବିମୁଖ ଥେକେ ବଲେଛିଲ, କେନ, ଆମରା ତୋ ଗଭର୍ମେଣ୍ଟେରି ଲୋକ ।

ଏକଦିନ ତାରା ସମ୍ବଲପଲେ ଚଲେ ଗେଲୋ । ସେମନ ଝାଡ଼େର ଘତ ଚଲେ ଗେଲୋ,

দৰময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো থবৰ কাগজের টুকুৱো, কাপড় বোলাৰাৰ
দড়িৰ একটা দৰ্বল অংশ, বিড়ি-সিগাৰেটেৰ টুকুৱো, বা হেঁড়া জুতোৰ
গোড়ালিটা। নীলকৃষ্ণ-বাড়িৰ ফ্যাসানে তৈরী মৱজা-জানালা ঘুলো খা খা
কৱতে লাগলো। কিন্তু সে আৱ ক-ছিল। রঙ-বেৱেড়েৰ পৰ্বা ঝুলবে
সেখানে।

পেছনে রাম্ভাঘৰেৰ পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তাৰ
পাতায় আবাৰ খয়েৱী ৱড় ধৰেছে। যে দিন পুলিস এসে বাড়ি ছাড়বাৰ
কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তাৰ গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি।
তুলসীগাছেৰ কথা না হোক, গৃহকৰ্ত্তাৰ ছলছল চোখেৰ কথাও কী এদেৱ
আৱ মনে পড়েনি ?

কেন পড়েনি সেকথা কেবল তুলসীগাছ আনে, যে তুলসীগাছকে মাঝৰ
বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পাৱে, ধৰ্স কৱতে চাইলে এক মুহূৰ্তে ধৰ্স কৱতে
পাৱে অৰ্ধাৎ যাৱ বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া। আপন আঞ্চলিক-শক্তিৰ উপৰ নির্ভৰ
কৱে না।

জিবরাইলের ডানা

শাহেদ আলী

(আজিমপুর হয়ে যে-ব্রাহ্মাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে;
তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট কুটির।
ঘরের মেটে-দেওয়ালগুলোর উপরিভাগ ঢ'লে গেছে অনেক দিন, গোদ-বৃষ্টি
আর হাঁওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরোনো
ঠিনের স্বরাখ দিয়ে দেখা যায় নৌল আশমানের ছিটে-কেঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিন্নে।

সঙ্কেয়বেলা হালিমা খুবই যেরেছিলো নবীকে। ছ'বছর গিয়ে সাত বছরে
পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে।
কাজ না শিখলে দিন-শুভ্রান্তের উপায় ধাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা
রেখেই বাপ তার ইন্তেকাল করেছে। একা হালিমা কীই বা করতে পারে
তার জন্তে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ি যুরতে হয় তার; কাজ না
পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সঙ্কেয়বেলা গিয়ে ব'সে ধাকতে হয় গোরস্তানের
গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-থ্যুরাত করে,
তাঁদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা হালিমার বরাতেও ঝুঁটে যায় কখনে-
কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে,
দোকানী শুধু দুপুরবেলা একবার থেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা
হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে যাস-যাস
পাচ টাকা ক'রে পাবে দোকানীর কাছে। কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু
করেছে আজকাল, কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায়
চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সঙ্কে পর্যন্ত আর দেখাই যিলে না তার।
এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে, আজ
তাকে হ'শিয়ার করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর, এমন দুঃ
হেলেকে দিয়ে দুরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোদ্বার আগুন হয়ে
ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শিখে, তার কি কোন ভবিষ্যত
আছে আজকের ছনিয়ার? অথচ, এমন মগড়া যে, এলিকে যনই বলে না

তাৰ। মন বলবেই বা কেন? মা তো রঘেছে তাৰ জষ্ঠে ভিক্ষে কৰতে বাদিগিৰি কৰতে! সক্ষেষ্য নবী বাড়ি ফ্ৰেবাৰ সক্ষে সক্ষে হালিমা শুম-শুম কৰে কতক খলো কিল বসিয়ে দেয় নবীৰ পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী? —জানতে পীড়াগীড়ি কৰেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীৰ কাছ থেকে জওয়াব পাৰিব কঠিন, সে শুধু ঝুলে ঝুলে কেঁদেছে। কান্দতে কান্দতে না-থেয়েই ঘূমিষ্যে পড়ে নবী।

হালিমা থেতে বসেছিলো, কিন্তু দু'এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে— তাৰ পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অচুনন্দ-বিনন্দ কৰেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গল্পলো না অভিযানী শিশুৰ। শুধু দু'একবাৰ চোখ মেলে হালিমাৰ দিকে তাৰিয়েছিলো। তাৱপৰ মুখ গম্ভীৰ কৰে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমেৰ কোলে।

গলে হাওয়া দেয়ালেৰ ওপৰ দিয়ে হালিমা তাৰিয়ে আছে আস্মানেৰ দিকে। একটা হাত তাৰ নবীৰ ওপৰ রাখি নবীৰ পিঠে কঞ্চি ভেড়েও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায় না,—কিন্তু আজ এই মুহূৰ্তে, ঘূমিষ্যে পড়া ছেলেৰ ওপৰ হাত বেথে, তাৰ মনটা হ ছ ক'ৰে ওঠে ঢুকথে। সত্যি, এতোটুকু ছেলে কী-ই বা বুৰো? (বাপ তো মৰে গিয়ে বেহাই শেয়েছে চিৰদিনেৰ জগ্নি, বাপ-মাৰ যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা।) যখন তখন ওকে মাৰপিট কৱা সত্যি অস্থায়। কিন্তু আজ বদি কিছুই না শিখে, ও বাঁচবে কী কৰে সংসাৰে? হালিমা তো আৱ চিৰদিন বেঁচে থাকবে না যে, নিজেৰ দিন গুজৱানেৰ কথা নবীৰ না ভাবলো চলবে!

হালিমাৰ চোখ আঙুলতে ভ'ৰে আসে, আসমান থেকে নজৰ কিৰিষ্যে নিয়ে সে চুমো ধায় নবীৰ কপালে।

নবী আস্তে আস্তে চোখ মে'লে চাষ—আৱ হঠাত একবাৰ দৱজাৰ দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মা এইভাৱে কে?

—কইবৈ? বিশ্বিত হালিমা প্ৰশ্ন কৰে।

—উই যে গেলো, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপৰিচিতৰে বাওয়াৰ পথটি।

—কেউ না, নিঃসন্দিক্ষ উত্তৰ দেয় হালিমা।

—ভূমি লুকাইবাৰ চাও?—নবীৰ অভিযান যেন ঝুলে ওঠে—খুব স্মৰণ একটা মাহৰ গেছে না? বাড়া ধৰথবা আৱ পিল্লনে ছুন্দৰ কাপড়?

—ছুন্দৰ মাহৰ? হালিমাৰ বিশ্বাস এবাৰ আৱো বেড়ে বাবৰ।

—হ, চোখ ছটো বড়ো বড়ো করে নবী—মিঠাই নিয়া আইছিল—
তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা ?

—হ, দিয়া গেছে, একটা কল্প হাসিতে প্রায় আর্তনাম ক'রে উঠে হালিমা—
তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী, এখন তুই দুবা,—বিহানবেলা খাবিনে
মিঠাই ।

—গোকটা কোন্ধান খে আইছিল, মা ? নবী আবার প্রশ্ন করে—হইটা
পাখনা দেখছো পিঠে ?

—পাখনা ?—হালিমার আকেল সত্ত্ব হার মানে এবার । আধো-আলো
আধো-অঙ্ক কারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে,
কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা ।

নবী আবার বলে—হ, পাখনা !—মউরের পেখমের মতো ঝুঁদুর !

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিতে
দিতে বলে—ফিরিছতা আইছিল বে—ফিরিছতা । আজ ছবে-বরাত না !
ঘরে ঘরে আইয়া খোজ-খবর নিছে মানছেৰ । ফিরিছতার তো আজ ছুটি ।

কেরেশ্তা এসেছিলো ! নবীর সারা গা ঝোমাঞ্চিত হয়ে উঠে । এক
দাঙ্গ উভেজনাম সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে । সুন্দর আজকের রাতটা—
কপা-গলা জোছনায় ধূয়ে ঢল ঢল করছে সারা পৃথিবীর গা । সঙ্কেয় ঘরে
কেরবার সময় আজ সে দেখেছে মসজিদে মসজিদে কোরআন-তেলাওৎ-বৃত
ছেলেমেঘেদেৱ । রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ-নাড়ির মসজিদ থেকে
কোরআন তেলাওতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো—গোরস্তান
গমগম করছে মাঝুয়ে । আজ ধূমিয়ে নেই কেউই, কেরেশ্তার সঙ্গে, মৃতদেৱ
করছে সঙ্গে আজ মোলাকাত করবে সবাই ; নিজেদেৱ স্ব-স্ব-স্ব আশা-
আকাশের মারফত জানাবে আশাহৰ কাছে । শুধু নবী আব হালিমা-ই
ধূমিয়ে ধূমিয়ে নষ্ট কৰেছে এ স্থূলগটা । তাদেৱই দুবারের সমূখ দিয়ে জলে
গেছে আশাহৰ কেরেশ্তা, তাদেৱ চাওয়াৰ কথা—জীবনপিপাসার কথা কিছুই
জেনে যাবনি—কিছুই জানানো হলো না তাকে ।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলেৱ হাবভাব । একবার বলে—
কিৰে, তোৱ খিদে লাগছে খুব ? ভাত খাবি এখন ? নবী কেৌনো অবাক
দেছনা তাৰ, খিদেৱ কথা সে ভুলেই গেছে একদম । যন তাৰ আচ্ছন্ন হয়ে
আছে এক যন্ত্ৰ কঠিন ভাবনায় । কেরেশ্তাৱা খবৰ নিয়ে থাব আশাহৰ
কাছে । তাদেৱ ধৰণও কি লিয়ে গেছে কেরেশ্তা ? সে কি পিয়ে বলবে না,

বয়াতের বাতেও সে ঘূমে দেখে গেছে নবী আৰ হালিমাৰে—ফিরিছত্তাৰে কিছু
কইয়া দিছে। মা ? আবাৰ জিজ্ঞাস হয় নবী ।

কিছু বুৰাতে না পেৱে চুপ কৰে ধাকে হালিমা ।

—চুয়াৰেৰ কাছ দে' গেলো আৰ কিছু কইয়া দিলা না ? অত্যন্ত কফণ
হৰে ওঠে নবী, আমাৰে ডাকলা ক্যান তুমি ?

—আৱে পাগলা, হালিমা তাৰ জালা চেপে বাখতে পাৱে না, ফিরিছত্তাৰ
আমাগো কথা ছুনব' ক্যান ? বড় লোকগো খোজখৰ কৱবাৰ লাই না
আসছে ? আমাগো দুয়াৰেৰ কাছ দে' তাগো বাড়িই হে গেছে ।

নবী চুপ ক'ৰে ধাকে অনেকক্ষণ, তাৱগৱ হঠাত প্ৰশ্ন ক'ৰে বলে—তুমি
নামাজ পড়ে না ক্যান মা ? অসহ মুকুবিহানাৰ স্থৱ বেজে ওঠে তাৰ প্ৰশ্নে ।

—কী হইবো নামাজ পইড়া ? একটা পৱন বিতৰণ প্ৰকাশ পায় হালিমাৰ
কঠে ।

—কী, অইবো কি ? এতোটুকু নবী জলে ওঠে বিৱক্ষিতে, ধাৱা নামাজ
পড়ে, তাগো বাড়িতেই না ফিরিছত্তাৰা আল্লে আলা তো তাগো কৰাই
হোলে ।

—না-ৱে না, হালিমা একৱকম চিংকাৰ ক'ঠে ওঠে এবাৰ, আলা তো
সুমাইয়া রইছে কেতা গায় দিয়া । ছুনা-কপা দিলা ছেজ্জ্বা কৱলেই হে চায় ।
গৱীবেৰ সোনা নামাজে হেৱ মন ভিজে না ।

আলাহৰ এই মহৎ গুণেৰ কথা ভেবে একান্তভাবেই ধাৰড়ে ধায় নবী ।
কাঙাল ধাৱা, যিসকিন ধাৱা, তাদেৱ আৱ কোন ভৱসাই নেই তা'হলে ।
এতো সোনা-কপাও তাৱা পাবে না, তাদেৱ দিলেৱ আৱজুও গিয়ে পৌছবে
না খোদাৰ কাছে । আৱ তাই তো গৱীবেৰ ধাৱা নামাজ পড়ে তাদেৱ তো
শালদাৰ হতে দেখা যায় না ; ছঃখ তাদেৱ ঘুচছে কই ? সোনা-কপাৰ
শিৱীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঁড়ে খোদাৰ ! সেই জন্তেই বুৰি মালদাৰ
আৱো মালদাৰ হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্ত্ব গুণ !

কিছু খোদা তো পয়দা কৱেছেন স্বাকেই । তিনি কেন তাৰ বহুত
একত্বকা বিলিয়ে দেবেন শালদাৰদেৱ মধ্যে ? কোনো দিন কি ঘূমেৰ
ঘোৰেও দৱিত বাদাৰ ছঃখে অক্ষিঙ্গ হয়ে ওঠে না তাৰ চোখ ? সত্ত্ব কি
গৱীবেৱা' স্থু ভাঙাতে পাৱে না তাৰ ?

হত্তাশাৰ আধাৰে হাতড়ে ফিরতে ধাকে নবীৰ মন । দুয়াৰেৰ স্থুখ
দিয়ে গেছে কেৱেশত্তা, দৰদবে আঙুনেৰ মতো রঞ, মহুৰেৰ পেখমেৰ মতো

বিচির বর্ণের ছটো ভানা তার পিঠে, তার মাঝা গালে সে কী খোপসু !
শালা ধবধবে তাজী ঘোঁড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশ-তাকে বিজে।
নবী জেগে থাকলে আজ তরে পড়তো ফেরেশ-তার পথে, আর বিনতি
ক'রে বলে যেতো, তার রক্তের চেউ-ওষ্ঠা অঙ্গুরস্ত ছাঁথের কাহিনী। কথা না
শুলে সে ঝুঁকে পড়তো ভানা ধ'রে—ফেরেশ-তার সাথে সাথে উচ্চে সেও চলে
যেতো একেবারে আজাহুর কাছে। অমনি চোখ না মেললে নবী চিংকার
করতো গলা ফাটিয়ে খামচিয়ে রক্তাঙ্গ ক'রে ঘুম ভাঙাত্ত-আজাহুর।

কিংতু তা-তো আর হলো না। অথচ সব কিছুরই চাবি রয়েছে
খোদার হাতে। তার ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেইবা আর খুলে দেবে
ভাগ্যের মণিকোঠা ?

বিছানায় গিয়ে আবার তরে পড়ে নবী। রাজ্যের বড়ো চিষ্টা এসে
অটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিষে গা এলিয়ে দেয় নবীর
কাছে। ছেলে হ'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা
দেখেছে না, শুধু বুক দিয়ে অঙ্গুত্ব করছে নবীর বুকভরা অস্তি ! একবার
হিপিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী অনেক রাত অইছে—
তুই ঘুম !

নবী আস্থানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ ক'রে, আর একটা পথের
র্ধেজের কলনা তার হয়রান হ'য়ে থাম। আকাশ ভরে পৃথিবীতে এতো
জ্যোৎস্না—তবু মেন কতো অঙ্গুকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে থাম
সে-অঙ্গুকারে !

হঠাতে একবার বিজলি বিলিক দিয়ে থাম তার চোখে, অক্ল দঃস্থায়
মেন নারিকেল কুঞ্চ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। থুপিতে,
আবেগে রোমাক্ষিত হয়ে ওঠে তার সারা মেহ। হয়েছে, আর ভাবতে
হয়ে না ! আবশের পাস্থায় বশি লাগিয়ে টান দেবে সে। বশি তো হাজেই
রয়েছে তার। এবার খেকে বিবিকার ভাব ঘুচে থাবে খোদার !

পরদিন। আগের দিনকার পানি-ভাত ছটো খেয়ে শোকালে কাজ
করতে থাম নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমা-ই তাকে
পাঠিয়েছে অনেক শাবিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাজেই আজ গড়তে রয়ে
কপাল, আজার কাছে আরজি পেশ করবেই চলবে না।

করেকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাধছে, কিংতু তার মন পড়ে আছে
পিলখনার উপাশে ক্ষণিমনসায় দেবা নির্জন আশপাশুত্তে। হোকন পাখিয়ে

ବୋକ-ଚକ୍ର ଆଡାଳେ ଏଥାରେ ମେ ରୋଜଇ ସୁଡି ଓଡ଼ାର ଆପନ ମନେ । ଏଥରର ବେ ଛାଡ଼ି ଆର କେଉ ଜାନେ ନା ଦଂସାରେ । ପୃଥିବୀକେ ଲୁକିଯେ ଶିଖ ତାର କଟି ହାତ ଛଟା ବାଢ଼ିରେ ଦେଇ ଆସମାନେର ଦିକେ । କିନ୍ତୁ ହାତ ଆର କହୁଇ ବା ଓଠେ ? ନବୀକେ ତାଇ ନିତେ ହସେହେ ସୁଡି—ଶୁଡି ଉଡ଼ିଯେ ଉଡ଼ିଯେ ମେ ତାର ବାସୀକେ ଏତୋଦିନ ଅଜାଣେ ଓପର ହତେ ଆରୋ ଓପରେ ଆରଶେର ଦିକେଇ ପାଠିରେହେ !

ପେଟ ବ୍ୟଥାର ଅଜ୍ଞାତ ଭୁଲେ ନବୀ ବେରିଯେ ପଡ଼େ ଦୋକାନ ଥେକେ । ଶୁଭୁରେ ଭଙ୍ଗେ ମେ ହିର ଥାକତେ ପାରଛେ ନା । ଆଜ ଅତି ଶୃଷ୍ଟିପଣେ ବାଡ଼ି ପୌଛେ ନବୀ । ମା ବାଡ଼ି ନେଇ । ଆନନ୍ଦେର ସୀମା ଥାକେ ନା ନବୀର । ତିଳଟା ପାତିଲ ତଚ୍ଚନ୍ତ, କରେ ମେ ବାର କରେ ହ'ଆନା ପରସା—ଓହ ! ହୁଇ ଆନା ପରସା ତୋ ନର, ମାତ ରାଜାର ଧନ ! ପରସାଙ୍ଗେ ମୁଠୋର ପୁରେ ନବୀ ଛୁଟେ ଯାଏ ନବାବଗଙ୍ଗେ । ଶୁତୋ କିନେ ଆବାର ମେ ଦୌଡ଼ିତେ ଶକ୍ତ କରେ ଦେଇ । ଏକ ନତୁନ ଅଭିଭାବେର ମେଶୀଯ ବୁକ ତାର କାପଛେ । ଜଳେର ଭେତ୍ରକାର ଏକ ପରିଯକ୍ତ ଡାଙ୍ଗ ମସ୍ତଜିଦେର ଅକ୍ଷକାର ଗୁହା ଥେକେ ନବୀ ବାର କରି ଆନେ ଏକଟା ସୁଡି ଆର ଲାଟାଇ । ଏହି ସୁଡିଇ ତାକେ ରୋଜ ଦୋକାନ ଥେକେ ବେର କରେ ଆନେ କାଜ ଭୁଲିଯେ, ଏହି ସୁଡିଇ ତାକେ ପୃଥିବୀର ସୌମ୍ଯନା ଛାଡ଼ିଯେ ଆସମାନେର ପଥେ ନିଯେ ଯାଏ । ଆର ମର ବ୍ୟାପାରେଇ ଥିଇ କୋଟେ ନବୀର ମୁଖେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଡିର କଥା କାରୋ କାହେ ମେ ବଲେ ନା । ଏ ଯେନ ତାର ନେହାତ ପୁଣିଦା ଥେଲା, ଏକାନ୍ତଭାବେଇ ନିଜକୁ ।

ଏକ ମମର ନବୀ ଚଲେ ଯାଏ ପିଲଖାନାର ଓପାଶେ ମେହି ଫଣିମନସାଯ ସେରା ନିର୍ଜନ ଆରଗାଟୁକୁତେ । ପୁରୋନୋ ଶୁତୋଟାର ମଳେ ନତୁନ ଶୁତୋଟା ଗେରୋ ଦିଯେ ମେ ସୁଡି ଉଡ଼ିଯେ ଦେଇ ଆସମାନେ । ସୁଡି ଶୁତୋଇ ଓପରେ ଉଠିତେ ଥାକେ ଉଜାଲେ ଅଧୀରତାଯ ତତୋଇ ବିଚନିତ ହସେ ଓଠେ ନବୀ, ଏକଟା ଶିତହାଙ୍କେ ତାର ମୁଖ ଥେକେ ଚୋଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲିକ ଦିଯେ ଓଠେ ବାରବାର । ଆରଶେର ପାରେ ରଣ ଲାଗିଯେ ଆଜ ସଜ୍ଜୋରେ ଟାନ ଦେବେ ନବୀ ।

କୁମେଇ ଛୋଟ ହସେ ଆସେ ସୁଡିଟା । ଏକ ମମରେ ସଥନ ହାତେର ଶୁତୋ ଶେ ହସେ ଗେଲ, ନବୀର ଦୁଃଖେର ସୀମା ଥାକେ ନା । ଶୁତୋ ଶେ ହସେ ହସେ ଗେଛେ, କିନ୍ତୁ ସୁଡି ସେ ଦେଖା ଯାଛେ ଏଥିନେ । ଖୋଦା କି ଏତୋ କାହେ ତାତୋ ନର, ମାହୁବେର ଦୃଷ୍ଟିସୀମାର ବାହିରେ ଅନେକ ଦୂରେ ଆରଶେର ଓପର ସୁମିଯେ ଆହେନ ତିନି । ଏତୋ କାହେ ହଲେ ତୋ ଥାଲି ଚୋଥେଇ ଦେଖା ସେତୋ ଆଜାହକେ । ଶୁତୋ ଚାହି ତାର, ଆରୋ ଅନେକ ଶୁତୋ,—ସେ ତାର ସୁଡିକେ ନିଯେ ସାବେ ମେଦେର ଓପାରେ, ଆରଶେର

একেবারে কাছিটিতে। কিন্তু এখানেও দরকার পয়সাৱ। সে বেং হতো
কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীৰ? তাদেৱ হৰ্ষশা তাহলে আৱ ঘূচবেনা!
নবী আসমানেৱ দিকে চেয়ে লিঙ্গেৱ ব্যৰ্থতাৱ আৰ্তনাম কৱে ওঠে। শুড়ি
ওড়ানো হতোদিন একটা শখ ছিলো, মেশা ছিলো, ততোদিন শুধু শুড়ি
উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন ওই শুড়ি একটা গভীৱ অৰ্থ নিহে
তাৱ কাছে ধৰা দিয়েছে, সহ্য বেদনায় সম্ভাবনাৱ পথও অবাৰিত হয়ে গেছে
তাৱ জন্মে।

কিছুক্ষণ শুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই হতোয় হবে না,
আৱো অনেক হতো চাই। বামনেৱ হাত বাড়িয়ে আৱশ্বেৱ পায়া ধৰা
অসম্ভব। পৰম যত্নে 'সে শুড়িটা' লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদেৱ নির্জন
অক্ষকাৱে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘৰেও পয়সা নেই। মাৱ কাছে পয়সা চাইতে গেলে
হালিমা কঞ্চি দিয়ে তাৱ পিটেৱ ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা
পয়সা আজ সে চুৱি কৱেছে তাৱ জগ্নেই তাৱ বৱাতে কী আছে কে
জানে? তবু লোভ সামলাতে পাৱে না নবী। আজকালেৱ লিখা পালটাতে
হলে কিছু ধৰচ—কিছু ক্ষতি দ্বীকাৱ কৱতে হবে বইকি। মাৱ অৰ্বৰ্তমানে
নবী উটেপাটে দেখে ঘৰেৱ সব কটা হাড়ি-গাতিল—হেঁড়া কাপড়েৱ
খাজে তন্তুল কৱে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা ধাকবেই বা কী
কৱে? ভিক্ষে কৱে পৱেৱ? বাড়িতে কাজ কৱে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে
কৱে মা ছেলেৱ আধপেটা ধাৰাবাই হয় না কোনদিন, তাৱা আবাৱ জমাবে
পয়সা।

হঠাৎ নবীৱ ঘনে পড়ে ধাৰঃ ইষ্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া
বেতে পাৱে। তাৱ বহুলী ছেলেদেৱ সে কুলিগিৰি কৱতে দেখেছে অনেকদিন।
নবী আৱ ভাবতে পাৱে না, একপেট কিধে নিয়েই—সে দুটে ধাৰ ইষ্টিশনেৱ
দিকে। অনেকক্ষণ বলে ধাকতে হয় তাকে। তাৱপৰ গাড়ি যখন এলো,
ভাজ্জব বনে ধাৰ নবী, কতো বিচিত্ৰ বকমেৱ মাঝৰ, আৱ কতো বঙবেৱতেৱ
পোশাক!—বাক্স, বিছানা, পেটৱা, প্ৰতিতিতে আৰুৰুত হয়ে ওঠে লাইনেৱ
কাছটুকু।—'মুটে চাই' 'কুলি চাই' চিংকাৰে হারিয়ে ধাৰ আৱ সব
আওয়াজ।

সবাৱ বৱাতেই একটা না একটা কিছু কুটে ধাৰ; কিন্তু নবীৱ কপাল
অড়ো ধাৰাপ। 'মুটে চাই' বলে চিংকাৰ কৱতে গিৰে আওয়াজ এলো না ভাক

গলায়—হাত ছটা চাওয়ার ভৱিতে ওপর দিকে উচ্চের মেল ছুটে থার এক কামরার স্থমথ খেকে আরেক কামরার স্থমথে। চোখ তার কঙ্গ, ঝাহতে টলোমলো। ভিজ্বক মনে করে কেউ কেউ তাকে নিশ্চিত করলে অমের মর্ধান্ব সহজে, আর অতি আধুনিক কেউ দিলে গলাধাকা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইস্টিশনে বসে বসে নিজের বদ্বীবের অঙ্গে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। যায় বেটাঘ কোনদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! তার বাপ সেই যে হেঁড়া, শতভালি দেয়া কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেইগুলোই আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দৃঢ়নে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি হলেই টিঙ্গের স্ফুরণ দিয়ে পানি পড়ে ঘর ফেলে যায়। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আলাহ্‌র কাছে তাদের দিলের আরজু পৌছাতে পারলেই অবসান ঘটতো দুঃখরাত্রি। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরতুরী স্ফুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার স্থযোগ পায়নি কখনো। আলাহ্‌কেনই বা জনবেন তাদের কথা।

বন্ধুধানেক পরে আরেকটা ট্রেন থখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে ! ট্রেন ধামবার আগেই ‘মুটে চাই’ কুলি চাই’ বলে সে চিকার শুরু করে দেয় আগপনে। ট্রেন ধামলে একটা ঘড়ি-পড়া বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঢ়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার স্থমথে। ভজলোক একটা এটাচি ও হোক্সেল দেখিয়ে দিয়ে বলেন—ওয়েটিং রুমে নিয়ে যেতে পারবি ?

—ক্যান পাঞ্চম না ? তাছিল্যের সাথে অবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা। আমার বছত পইছার দরকার—চোখ ছটা বড়ো বড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আমনে কতো দিতে পারবেন ?

ভজলোক এবার দৃষ্টি প্রথরত করে নবীর মুখের দিকে তাকান ; অস্তুত ছেলে তো ! বলেন—অতো পয়সা দিয়ে কি করবি ?

—বাবে, পইছার বুঝি কাজ নাই। নবী বীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘূড়ির বুছি কিমু বে—অনেক রহি।

ভজলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোক্সেলটা নবীর শাখার দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাঢ়ি থেকে। ওয়েটিং রুমে এসে চার পয়সার জাহাগার চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক স্ফুরো হবে।

নবী সিকিটা ছাঁড়ে আরে শয়েটিং করে মেরেৰ—না, আমি নিম্নো।
চার আনার আমি কি বক্ষম ? . আমার অনেক রহি লাগবো। আমার শুভ্র
আছথান ছইবো গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভজলোক সিকিটা হাতে
নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—শুভ্রি আসমান ছাঁলে ডোৰু কি হবে ?

—ক্যান, আৱছেৰ পায়ায় বাজাইয়া টান দিয়ু। এক শপ্তিল নেশা আৰ
শক্তিৰ শুভ্রিতে নবী মুহূৰ্তে যেন বিৱাট কিছু হয়ে ওঠে—আজা ধালি
আপনাগো কথাই ছুনবো, আমাগো কথা বুৰি ছুনোন লাগবো না হৈব ?

এবাব সকলে এ ওৱ মুখ চাওয়া চাওয়ি কৱতে থাকে। পৱিবেশটা মুহূৰ্তে
যেন কেমন খুখ্যমে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কামো মুখে টু শক্তি নেই। রাজ্ঞিদেৱ
সামনে যেন রাজ্ঞোহৈৰ বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুৰ মুখে। ভজলোক পকেট
হতে একটা আধুলি বেৰ কৱে বলেন—এই নে, এখন হবে তো ?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আধি ছলছল কৱে ওঠে নবীৰ।
আস্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যথন অনেক পইছা অইবো, আমাগো
বাড়ি তখন আইয়েন—আপনেৰ জেড ভইয়া দিয়া দিয়ু হেদিন।

নবীৰ কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন, তিনিও
উচ্ছুসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁৰ আজকেৰ এই মেহেৱবাণীৰ কথা ভুলতে
পাৱবে না নবী—দিন যথন ফিৱবে, নবী ছই জেব ভৰ্তি কৱে পঘসা দিয়ে
শোধ কৱবে তাঁৰ খণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হা হা নিশ্চয়ই আসবো,
আমৱা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবাৰ জন্ম অপেক্ষা কৱে না। সে সোজা চলে যায় চকেৰ
দিকে। অনেকটা স্বতো কিমে যথন বাড়ি ফিৱলো তখন সক্ষা মিলিয়ে
গেছে। স্বতোটা লুকিয়ে রেখে আসে মসজিদে—তাৰ শুভ্রিৰ পাশে।

হালিমা ভিক্ষা-কৱে আনা চালঞ্চলো জাল দিচ্ছে। গাছতলা খেকে
ভিজে বন কুড়িয়ে এনেছে আণন ধৰাবাৰ অঙ্গে। নবীকে দেখেই চোখ
কচলাতে কচলাতে বলে, কিৱে,—অতোক্ষণে কোন্ধে আইলি ?

মাৰ দৱদভৱা প্ৰশ্নে অত্যন্ত খুশি হৱ নবী ; তাৰ মেজাজ তাহলে বিগড়ে
যায়নি আজ। হয়তো পাতিল তচ্চন্ত কৱে পঘসা নেবাৰ খৰাটি সে জানতেই
পাৱেনি এখনো। যেনে যেনে আজাহকে সে শুক্ৰিয়া আনায়।—দোকান
তে বাৰ অইয়া একটু শুইয়া আইলাম যা,—মাৰ দিকে চেয়ে সে বলে
সহজভাৱে।

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমাৰ কষ্টে দৱল ভেড়ে পড়ে— দোকান
তে পালাস নে দেন ! কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইবো ঘৰে ।
তাজ না জানলে কি আৱ ভাত-কাপড় ছুটে ? আমাগো মা-পুত্ৰৰ কি
এ ছাড়া আৱ উপাৰ আছে ?—এবাৱ ছেলেৰ মুখেৰ দিকে চেয়ে হালিমা প্ৰশ্ন
কৰে— হাৰে নবী, তোৱ খিলা লাগছে, না ?

মায়েৰ আনন্দিকতায় নবী একৱকম ভুলেই ধায় তাৱ খিদেৱ কথা ।
তাছাড়া, একদিকে বশি কেনাৰ আনন্দ, অন্দিকে মাৰ স্বেহ—ভুট্টোতে মিলে
আজকেৰ দিনটি অপূৰ্ব হয়ে উঠেছে নবীৰ কাছে । হেলে সে বলে—না মা,
আমাৰ খিদে লাগছে না । দোকানে আমাগোৱে ধাওয়ায় কিনা ছপুৱবেলা ।

— তাই ভালো— হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষাৰ ভাত যতো কম পেটে দেয় ?
ধায় ততোই ভালো । এ ভাতে ছেলেমাইয়া গো ‘বাইড়’ থাকে না ।

রাঙ্গা হলে নবী ও হালিমা, হৃজনেই কিমু ভিক্ষেৰ ভাত পেটে ঢেলে
স্বত্বোধ কৰে কিছুটা ।

পৰদিন দোকানেৰ কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বে়িয়ে পড়ে দৱল
থকে । আজ আবহাওয়া খুবই অচুক্কলে— এবং নবীৰ হাতে অনেক স্বতো ।
পৃথিবীতে দাঢ়িয়ে অনায়াসে আজ সে তাৱ হাত পৌছিয়ে দিতে পাৰে
আসমানে ।

নবী শুড়িটাকে বুকেৰ কাছে চেপে ধৰে— বুক তাৱ ঢিপ ঢিপ কৰছে ।
কিছুক্ষণ পৱেই শুড়ি উড়লো আসমানে,— হাওয়াৰ ভৱে নেচে নেচে ।
হংসাহসেৰ দোলায় কেঁপে কেঁপে শুড়ি উঠে ধায় ওপৰ হতে ওপৱে— আৱো
ওপৱে ! স্বতো আজকে ফুৱোতে চায় না,— শুড়ি কৰেই ছোট হয়ে আসছে—
অই বুৰি শুড়ি হাৰিয়ে ধায় দৃষ্টিৰ ওপাৱে অসীম শৃঙ্খলায় । আবেগে, ঔৎসুক্যে
বড়ো হয়ে এলো নবীৰ চোখ ছুটো । তাৱ বুকেৰ খাস দীৰ্ঘ হতে দীৰ্ঘতৰ হয়ে
আসে, ঠোটেৰ বীধন খুলে গিয়ে একটা অন্তু হাসিৰ আমেজ লাগে তাৱ সাৱা
মুখে । শুড়িৰ নাচেৰ সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূৰ্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে তাৱ
বড়ো-হয়ে-আসা চোখেৰ চকচকে তাৱা ছুটো ।

এক সময় টেৱে পায় নবী— লাটাই আৱ দুৱছে না । স্বতো শেব হজে
গেছে । সেই নিৰ্জন ফণিমনসাৱ ঘেৱা ভায়গাটুকুতে নবীৰ চোখ পানিতে
ভৱে আসে । শুড়ি এখনো দৃষ্টিশীমাৰ ভেড়োৱে ।

নবী শুড়ি নাখিয়ে আনলো । আৱো বেশি বশি চাই তাৱ, অনেক বশি ।
খোদা ঝাৱ আসল এজো দূৰে পেজেছেন কেন, দূৰতে পাৱে নবী । কিন্তু

আসন ঘৰে পাতলেই কি আৱশ্যে বসে যুৰোনো এতো নিয়াপদ ? সংসাৰে কি
বশি নেই যে, তাৰ আৱশ্য হৌওয়া থাবে না, টলিয়ে দেষা থাবে না পাখাৰ বশি
লাগিয়ে ? নবীৰ আকাঙ্ক্ষা আৱো প্ৰবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিৰদিনকাৰ মতো মসজিদে ঘৃড়ি আৱ লাটাই লুকিয়ে রেখে আজ সে
চলে যায় ইস্টশনে। পয়সা চাই তাৰ, বশি কেৱায় পয়সা—যে বশি সে
আৱশ্যেৰ পাইয়া বেঁধে খোদাকে বেঁধে খোদাকে নাহিয়ে আনবে মাটিৰ
মাছবেৰ মধ্যে !

শ্ৰেষ্ঠ হ'আনাৰ বেশি আৱ জুটে না। কতোটুকু স্থতোই বা আৱ
কেনা যায় এ দিয়ে !

এমনি কৰে রোজ কিছু কিছু পয়সা আঘ কৰে নবী—আৱ তাই দিয়ে
স্থতো কিনে পুৱোনো স্থতোটাৰ সাথে জুড়ে দিয়ে ঘৃড়ি উড়িয়ে দেৱ
আসমানে !

পিলখানাৰ উপাশেৰ ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন কৰে নিয়েছে
অনেকদিন। অমন নিৰ্জন নৌৰূব পৱিবেশে আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীৰ ছৰ্জন
সাহস। কিন্তু হাতেৰ স্থতো যথন শ্ৰেষ্ঠ হয়ে যায়, এবং ছোট হতে হতেও ঘৃড়ি
তখন থেকে যায় দৃষ্টিৰ ভেতৱেই। নবীৰ তখনকাৰ হৃথ আৱ আকোশ দেখে
কে ? তবু মন তাৰ ভেঙে পড়ে না—স্নাফল্যেৰ নিকট সম্ভাবনা তাকে কৰে
তোলে আৱো সাহসী, আৱো জৈবী।

রোজ নবী দোকানেৰ কথা ব'লে বাড়ি থেকে বেৱিয়ে যায়—কিন্তু কোথায়
বা দোকান আৱ কোথায় বা নবী ? ইস্টশনে, বাজাৰে মুটেগিৰি ক'ৰে যা
হ'চাৰ পয়সা পায় সবই ধৰচ কৰে স্থতো কেনায়। দিনে দিনে স্থতো বীৰ্য হতে
দীৰ্ঘত হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যই ঘৃড়ি ছোট হতে হতে একটা কালো বিশুৰ মতো হয়ে
আসমানেৰ অসীম শৃঙ্খলায় হাৰিয়ে গেলো। ডোৰ ধৰে রেখে আসমানেৰ দিকে
চেৱে আছে নবী। আৱ প্ৰচণ্ড কাপুনিতে ধৰথৰ ক'ৰে উঠছে তাৰ শৰীৰ।
উত্তেজনায় কগাল দিয়ে ঘাম বেৱিয়ে এলো তাৰ, বিস্বে-আশক্ষাৰ দম দেন
বছ হয়ে আসে—একটা কল্প হাসিতে মধুৰ হয়ে ওঠে শিতৰ মুখ। আজ বেন
টানাটানি পড়ে গেছে আসমান আৱ পৃথিবীৰ মধ্যে—কে হাৰে, কে জেতে—
এবং ভাৱি আকৰ্ষণ সে অহুভু কৰছে হাতেৰ বশিতে। শুধু একটা বশি
টন্টনু কৰছে আসমানেৰ আকৰ্ষণে। হয়তো দৃষ্টিৰ আড়াল থেকে কে টানছে
বশিকে ধৰে—আৱ সেই টানে হুলে হুলে উঠছে নবীৰ হাতেৰ শিৱা উপশিৱা।

ରଖି ବେବେ ବେବେ ନବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ହାରିଯେ ସାର ଆମଥାନେ । ଆଜକେ
ଆର ଘୁଡ଼ିର ରଖି ଶ୍ରୋତୋବେ ନା ନବୀ ; ଲୋକଚକ୍ର ଓପାରେ ଘୁଡ଼ି ଉପେ ବେଡ଼ାକ
ଆପନ ଇଚ୍ଛାସ—ଆପନ ଧର୍ମେ । ଏକ ସମୟ ହୁତୋ ଆଜୁକେ ସାବେ ଆରଶେର
ପାଯାୟ—ଆର ଶକ୍ତ ଟାନ ପଡ଼ିବେ ହାତେ, ରଖିତେ ଟାନ ଦିଯେ ନବୀ ଟଳିଯେ ଦେବେ
ଆଜାର ଆରଶ । ଭୟ-ଚକିତ ଝାଁଖି ମେଲେ ଆଜ ତିନି ତାକାବେନ ମାଟିର
ମାହସେର ଦିକେ, ଅନିଚ୍ଛାୟା ଶନତେ ହବେ ଛଂଖୀ ବାନ୍ଦାର କାହିନୀ—ତାହେର
ଇତିହାସ !

ନବୀ ଚେଯେ ଆହେ ଓପର ଦିକେ, ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ଶ୍ରୋତୋ—ସେ-ବାତେର ପୁଲେର ମତୋ
ଶ୍ରେ ଏକଟା ସିଂଡି ବେହେଶ୍ତ, ଆର ଚନିଯାର ମାରଧାନେ । ଯାବେ ଯାବେ ଶାନ୍ତ,
କାଳୋ ନାନା ରଙ୍ଗେର ମେଘ ଆନାଗୋନା କରଇଛେ, ଆର ଝାଁକା ଟାନ' ପଡ଼େ ପଡ଼େ
ବନ୍ ବନ୍ କରେ ଉଠିଛେ ଶ୍ରୋତୁକୁ—ମେଘ ଛ' ଟୁକରୋ ହେଁ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶ୍ରୋତର ଧାରେ !
ନବୀର ଚୋଥ ହଟୋ ପାନିତେ ଡ'ରେ ଆମେ । ଆଜାହର ଆରଶ ଟିକ କୋନଥାନାଟିତେ
ତା' ସେ ଜାନେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜ ତାର ମନେ ହଣୋ—ସେ ମେନ ତାର ବିଜ୍ଞୋହେର
ନିଶାନ ଆରଶେର କାହାକାହି କୋଥାଓ ପାଠିଯେ ଦିଯେଛେ । ଆର ଯେନ ଦୂର ନୟ
ବେଶି !

ପେଟେର କିଣିଥେ, ମା ଓ ସମ୍ମତ ସଂସାର—ସବ କିଛୁ ଭୁଲେ ଯାଏ ନବୀ । ସଙ୍କ୍ଷେତ୍ର
ପରା ଅନେକଙ୍କଣ 'ଡୋର' ଧରେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଥାକେ ଥେ । କଇ, କୋଥାଓ ତୋ ଆଟକେ
ଗେଲୋ ନା ଘୁଡ଼ି ! ଏକ ସମୟେ ସେ ଶ୍ରୋତୋ ଶୁଦ୍ଧି ନାମିଯେ ଆନେ ନୀଚେ
ଏବଂ ଜମିନ ଛୋବାର ଆଗେଇ ଘୁଡ଼ିଟାକେ ଚେପେ ଧରେ ତାର ବୁକେର ଯାବେ,
ଘାଡ଼ ନୀଚୁ କରେ ସେ ପରଶ ନେଇ ଘୁଡ଼ିର, କେମନ ଯେନ ଏକଟା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା
ଗର୍ଜ ପାଇଁ ନାକେ, ଆର ଘୁଡ଼ିଟାକେ ମନେ ହେଁ ଡେଜା ଡେଜା । ଆହ— ନବୀର ବୁକେ
ଖୁଲି ଆର ଧାର୍ମାଇ ପାଇଁ ନା ଯେନ । ବହଦିନ ପର ଖୋନା ତାର ଗୁରୀର
ବାନ୍ଦାର ଛଂଖେ କେନ୍ଦ୍ରେଛେନ, ଆର ତାରଇ ଆହର ଧାରାଯ ସିଙ୍କ ହେଁ ଉଠିଛେ
ନବୀର ଘୁଡ଼ି ।

ଆରଶେର ପାଯା ଧରେ ଟାନ ଦିଲେ ହଜ ନା ଆର ; ଏବଂ ଆଗେଇ ଖୋନା କେନ୍ଦ୍ରେ
କେନ୍ଦ୍ରେଛେ ତାର ବାନ୍ଦାର ଛଂଖେ । ନବୀ ଆଜ ସତି ବିଜୟ—ଲେ ମାର୍ଦକ ହେବେ
ତାର ଅଭିଧାନେ ; ଆଜ ଖେକେ କୋନ ଛଂଖ ଧାରବେ ନା ତାହେର ।

ବାଢ଼ି କିରେଦେଖେ, ହାଲିମା ବିଜାନାର ପଡ଼େ କୋକାହେ—ଜର ଏଲେହେ
ତାର । ଜୋହରେର ନମ୍ରେଇ ଚଲେ ଏଲେହିଲ ଧରେ—ଆଜ ଆର କିଛୁଇ ଜୋଟେନି
କପାଳେ । ଏକଟା ଶାରାପ ହେଁ ସାର ନବୀର—ଖୋନା ସମି ତାର ବାନ୍ଦାର ଛଂଖେ
କୀଳବେନ ତୋ ତାର ମାର ଅର ହେଁ କେନ ଆଜ ? ତାହେର ଧରେ ଆଜ ଭାତ

জুট্টে না কেন? এ তা'হলে আমার আঙ্গ নয়—শয়তানের পেশাৰ।
শয়তান চাইনা যে মাঝৰেৱ দিলেৱ আৱজু শৌচুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পাৰে, আৱো অনেক হৃতোৱ দৱকাৰ হবে তাৰ। সাতঃ
তক আসমান পেৱিয়ে গিয়ে তবেই না আজহুৱ আৱশ! সকালবেলা জৱ
নিয়েই উঠে পড়ে হালিয়া। কয়েক বাড়ি ঘুৰে কিছুটা ধাৰাৰ ঘোগাঢ় ক'ৰে
নিয়ে আসে নবীৰ জন্ত। নবী বলে—তুমি খাইবা না, মা?

না—হালিয়া ধীৰে ধীৰে বলে—তুই খাইয়া দোকানে থা। নবী পিয়ে
পিয়ে ফেন্টা গিলে নেয়। তাৰপৰ মাকে সাজনা দিয়ে বলে—তুমি চিঞ্চা
কইৱোনা মা—আমা আশাগো উপৰে মুখ তুইলা চাইবো। এ হাল আমাগো
বেছি দিন থাকবো না।

হালিয়া ছেলেৰ দিকে চেয়ে একটু কল্পণ হাসি হালে—কিছু বলে না।
টলতে টলতে এক সময় লে বেৱিয়ে যায় ঘৰ খেকে। সে জানে না বে নবী
দোকানে যায় না একদিনও—বাজাৰে ইষ্টিশনে যুটেগিৰি কৰে, আৱ
পিলখানার ওপাশে ঘূড়ি ওড়ায়।

নবী যুটেগিৰি ক'ৰে ক'ৰে রোঁজ কিছুটা হৃতো কেনে। উৰ্ব'হতে
আৱো উৰ্ব'লোকে পাঠিয়ে দেৱ তাৰ বিশ্বোহেৰ নিশান। কিছুভেই ধামতে
পাৰে না নবী; তাৰ নূৰেৰ জেলিতে সিনাই পাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।
তাৰ দিকে হাত বাড়িয়ে দৃঃশ্যাসী শিত!

কিষ্ট হৃতো জুড়ে দিছে—ঘূড়ি হৃতোই ওপৰ হতে আৱো ওপৰে
উঠছে—কোন কুল কিনাৰাই পায় না নবী। অতোদূৰে—মাঝৰেৱ নাগালেৱ
বাইৰে এ-তাৰে আচ্ছাগোপন কৰাৰ কী মানে থাকতে পাৰে, কিছুই সে
বুৰু উঠতে পাৰে না।

একদিন নবী সক্কোৰ সময় ঘূড়ি উড়িয়ে কিৱে এসে দেখে—মা আজ
বড়ো খুশি। পৰনে তাৰ নতুন শাড়ি—সান্কি আৱ বাটিতে ভাত-সালুন
বেড়ে বলে আছে নবীৰ অপেক্ষায়।

বহুদিন পৰ সান্কি-ভৱা ভাত দেখে পেট আলা ক'ৰে উঠে নবীৰ। সে
সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিয়াৰ কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা,
অতো ছবি পাইলা কই আইজ?

আজো অৱ ছিলো হালিয়াৰ। কিষ্ট এই যুৰ্কে নবীৰ ধীওৱা আৱ ঘূশি
দেখে লে বেৱ হুহু হয়ে উঠে হঠাতে। ধীৰে ধীৰে বলেলৈ—কাহাৰ চূলিৰ অধিবাসৰ
বাড়িৰ বক্ত মহলিল না, তাৰি কাতিহা আইছে আইজ, বহুত কাপড় ছেলেকু

আৱ টানা পঞ্চাং দান-ধৰয়াৎ কৱছে তাৰা। দেখ না—তোৱ লাইগা একটা
লুড়িও আনহি চাইগা। হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট নতুন পুড়ি
এনে দেৱ নবীৰ হাতে।

বিশ্বে অবাক হয়ে থাই নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদেৱ দিকে যুখ
তুলে চেয়েছেন আজাহ, ঘূম তাহলে ভেঙেছে তাৱ আজ! শুক্ৰিয়াৰ বান
ভেকে থাই তাৱ বুকে। ছলোছলো চোখে থার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম
না মা—এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা নবীৰ এ-কথায় শাৰ দিতে পাৱতো না কোনোদিনই। কিন্তু এই
মৃহুর্তে সে শাৰ না দিয়ে পাৱে না। নবীৰ চোখে বেন সে পৰিচয় পেয়েছে
তাদেৱ উজ্জ্বল ভবিষ্যতে।

অমিদাৰ বাড়িৰ দেৱা পঞ্চা আৱ চালে ছুদিন ভালোই থাই তাদেৱ
আবাৱ শুক হয় আধ-পেটা থাওয়া আৱ উপোসেৱ পালা। নবীৰ মন ভেঙে
পড়ে—ৱাগে আলা ধৰে থাই তাৱ সমস্ত শৰ্মায়। একি ছলনা—একি
ছিনিমি'ন খেলা বান্দাৰ জীবন নিয়ে? তাদেৱ আৱজু তা হলে এখনো গিয়ে
পৌছায়নি খোদাৰ কাছে।

নবী রোজ ঘূড়ি উঢ়ায় আৱ মনে মনে বলে—আজাহৰ আৱশ পৰ্যন্ত
পৌছতে পাৱে এতো স্বতো যদি সে কিনতে লা-ই পাৱে এতো ফেৰেশতা
য়য়েছে কী জন্মে? তাৱাই তো মাঝুৰেৱ দিলেৱ আৱজু পৌছয় গিয়ে খোদাৰ
কাছে। আজাহৰ কাছ হতে তাৱাই পঞ্চাম নিয়ে আসে যাহুৰেৱ কাছে।
আজকাল এতো নিঞ্জিয় কেন এই ফেৰেশতাৱা? কেন তাৱা নবীৰ ঘূড়িকে;
নিয়ে থাই না আজাহৰ কাছে।

সেদিন সোমবাৰ। নবী না খেয়েই ঘূড়ি আৱ লাটাই নিয়ে বেৱিয়ে পড়ে
চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় দেৱা নিৰ্জন জাগৰাটুকু! নবী দুৰ্বাৰ ওপৰ
বসে নতুন স্বতোটাকে জুড়ে দেৱ পুৱোনো স্বতোটাৰ সঙ্গে। আসমান
কেঘন যেন মেঘলা মেঘলা। স্বৰেৱ আলো পড়ে মেঘঙ্গলো শান্তা হয়ে গেছে
আৱ ঝাকে ঝাকে চকচক কৱছে গাঢ় নীল আসমান। এই সময় নবী
ঘূড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে,—তাতে তাৱ লাটাই আৱ ঘূড়ি শনশুন
ক'রে ধাওয়া কৱছে উধৰণিকে। নবী অপলক চোখে চেয়ে আছে ঘূড়ি পানে—
আৱ বশিতে টান পড়ে পড়ে বিনু বিনু ক'রে উঠছে তাৱ শাৱা শৱীৱ।
অকাৰণ উজালে ভৱে উঠছে নবীৰ মন। নবী বিহুই বুবে উঠতে পাৱে না।
মন তাৱ আবেগ-উৎসাহে ধৰখন কৱে কেপে উঠছে, কলনা দৰ্শ দেগলেৱ যতে
তানা মেলেছে আসমানে।

যুড়ি কমেই ছোট হয়ে এলো। একসময় নবী বিশ্বিত হয়ে দেখতে গেলো, তার কৃত্ত যুড়িটাৰ চারপাশে একটা বহু পাখি উড়ছে আৱ ঘূৰছে। যাবে মাবে পাখিটা হায়িয়ে থাক্কে মেঘের আড়ালে, আবাৱ দেখা থাক্কে ভানা মেলে যুড়িটাকে কেজু ক'ৰে। আচৰ্ষণ, একবাৱ যুড়িৰ বশি আটকে থাৱ পাখিৰ পায়। নবীৰ হাতে টান পড়ে আৱ তাতেই সাৱা দেহ অজানা আশকাৰ ছলে উঠে—পাখিটা যুড়ি নিয়েই ঘূৰতে থাকে আৱো অন্তব্যে। বশি আৱো প্যাচ খেয়ে লাগে পাখিৰ ডানায় আৱ পায়ে। হঠাৎ এক সময় নবী টেৱ পায়, ছতো তিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে, আৱ যুড়ি ঘূৰছে পাখিৰ পিছে পিছে। নবীৰ এতোদিনেৰ অহংকাৰ মাটি হয়ে থাক আজ। আৱশেৱ পায়ায় বশি লাগিয়ে আৱশকে টলিয়ে দেৱা আৱ সম্ভব হলনা জীবনে।

একাৰী শৃঙ্খলাটুকৰে কেনে উঠে নবী। ছচোখে-ভৱা অঞ্চল নিয়েই সে একবাৱ তাকাৰ যুড়িৰ দিকে। একটা কালো বিদ্ধুৰ মতো পাখিৰ পিছে পিছে ঘূৰছে যুড়ি আৱ পাখিটা শুধু ঘূৰে ঘূৰে উপৰেৰ দিকেই উঠছে। আচমকা নবীৰ মনে হলো—এতে পাখি নয়—এ যে ফেৰেশ্তা,—জিবগাইল এসেছে পাখিৰ স্বৱত্ত্ব ধ'ৰে তাৱ যুড়িকে আলাহ্ৰ কাছে নিয়ে থাবাৰ জন্মে। ছচোখ কেটে এবাৱ কৃতজ্ঞতাৰ অঞ্চল গড়িয়ে পড়ছে নবীৰ গাল বেয়ে; তাৱ অঞ্চল ধোয়া শুধু উঠে উঠে একটা অপূৰ্ব হাসি—বেদনায় আৱ আনন্দে ঝল্মল কৰা। ।

নিজেৰ বোকায়িৰ কথা ভেবে শৰম হয় নবীৰ। এতোদিন পৰ ফেৰেশ্তা এসেছে তাৱ দিলোৰ আৱজু আলাহ্ৰ কাছে নিয়ে থাবাৰ জন্মে। আৱ সে কি না কাঁদছে, পাখি তাৱ যুড়ি নিয়ে গেল বলে! চোখ মুছে সে তাকাৰ আসমানেৰ দিকে—পাখি ত নেই—যুড়িও নেই, শুধু শাদা মেঘ, আৱ তাৱি ফাকে চৰ্চক-কৰা গাঢ় নৌল আসমান। অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আসমানেৰ দিকে, আবাৱ তাৱ চোখ কেটে দৱাদৱ কৰে বেৰিয়ে আসে কৃতজ্ঞতাৰ অঞ্চল। আজকে সে সাৰ্থক—আজকে সে জয়ী! আৱ কোনো ভাৱনা নেই তাৱ, জিবগাইল এসে নিয়ে গেছে তাৱ যুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবাৱ জীবনেৰ।

আবাৱ আসমানেৰ দিকে চেয়ে, এক পলক হেলে নবী বাড়ি কিৰে আসে। খুশিতে তাৱ সাৱা শৱীৰ আজ নেচে নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে বলে শাৰু বাছ ছিলো—‘মা-মা—হনছো’—বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমাৰ কোলে।

হালিমা হঠাৎ গভীৰ হয়ে পড়ে—তাৱপৰ লাগে ঠোঁট কাৰড়ে, টিপে থয়ে নবীৰ ধাক—গুৰগুৰ ক'ৰে যলে—কোখে আইলিয়ে হাৱামজানা? আইজ তোৱ বড় আৰি না বাইৱ কইৱা ছাঁকুয় না!

নবী তার মার বাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার শুধির খবরটুকু
সে না দিয়ে পারছে না তার থাকে;—মা, আইজ জিবরাইলের দেখছি—
আমাগো ধ্বনি...

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধূম ধূম করে হালিমার শক্ত হাতের কিছি
পড়তে থাকে তার পিঠে। কিলোতে কিলোভেই বলে—ওরা দিবো আজ
আমরা থামু বইয়া বইয়া—বাঁটা মারু জিবরাইলের মুখে শতবার।

—মা, মা—তুমি গাল দিয়ো না, চিংকার ক'রে উঠে নবী—গুণ। আইবো
মা, আম্মা বাগ ক'রবো।

হালিমার বাগ আরো বেড়ে যায়, গালের ক্ষেত্রান্ত ধামতে চায় না তার।
নিঙ্গাম নবী কামড়ে ধূরে তার মার হাত।

এবার যেন আশুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির মোকাবের মালিক
আজকে ব'লে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; স্তরাং কাজ
তার ছাড়িয়ে দেওয়া হলো আজ থেকে। দোকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—
নবী নাকি কোথায় শুড়ি উড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায়
বাজারে, ইস্টশনে। খবরটা গেয়ে অবধি গোস্বামী আশুন হয়েছিলো হালিমা।
এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কি? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে
নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়।—হারামজানা,
তোর ভালার লাইগাই না আমার মাথা বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ
আমারে। আমি যরলে জিবরাইল খাখা খাখা ভাত লইয়া আইবো না
তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ। চিংকার করে সে
কাঁধে এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয় হালিমাকে। এক সময় গ্রাম
বেহেশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

বাতের বেলা হালিমার গার্বে জর এসে যায়। নবী তার মার দিকে
একবার চায়, এবং কিছু না বলেই ঘরের এক কোণে শুরে পড়ে মাটির শুপর।
কিছুই পেটে পড়লো না তার। শৰে শৰে কপাল কঁচকে, টেট শুলিয়ে সে
কঁচমঁচ করে তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে শুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না।

শুমিয়ে শুমিয়ে নবী শপ দেখলো: জিবরাইল তার শুড়ি নিয়ে দেখের
কাঁকে কাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করেছে। এক সময় নীল আসমান
ছবিকে শরে পিয়ে পথ করে দিল জিবরাইলের জঙ্গে। কাঁকে কাঁকে আবার

যাগী শুক হলো—আবার একটা আসমান কাক হয়ে গেছে। আবার
আরেকটা আসমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের
ভানায়, জিবরাইল তবু এঙচে নবীর ঘূড়ি নিয়ে। তারপর এক সময় খুলে
গেলো সপ্তম আসমানের মুরজা আৱ তাৰি ফাঁক দিয়ে একটা তীব্ৰ
আলোকচ্ছৃষ্টা এসে বলমে দিলো নবীৰ চোখ ছুটোকে। আৱ চাইতে
পাৱলো না নবী—তু চোখে হাত দিয়ে চিৎকাৰ ক'ৰে উঠে ঘূমেৰ ঘোৱে—
মাগো, আমাৰ চোখ ছুইটা পুইড়া গেলো।

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বলে নবী—গলে-ধাওয়া দেওয়ানেৰ উপৰ
দিয়ে শূর্ধেৰ আলো তাৰ নাকে মুখে এসে লাগছে।

ତୃତୀୟ ରାତ୍ରି ଶାକତ ଆଳୀ

(ଶୀତେର ଦୁଃଖ ତଥୁ ମନେ ହଜେ ଚୋଖେର ମାଘନେ ଛନିଆଟା ଧେନ ସପ୍ରମାଣ କରେ ଅଲଛେ ।) ଧୋଇାଟ ଆକାଶ ଏକାଣ ରାତ୍ରି ବାଂଡ଼େର ଗାସେର ମତ ହୁଲେ ହୁଲେ ଉଠିଛେ । ଦୁଚୋଖେର ଭେତରେ ଯଣିର ମଧ୍ୟେ ତୀର୍ତ୍ତ ଆର ହିନ୍ଦ ଏକଟା ଆଳା ଶୁଚୀମୁଖ ହୟେ ଅଲଛେ । ମନେ ହଜେ କେଉଁ ଚୋଖେର ଯଣି ଛଟୋର ଠିକ ସଧିଖାନେ ଏକଟା କରେ ଯିହି ଆର ହାଲକା ଶୁଚ ଚୁକିଯେ ଦିଜେ ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ । ଅରେର ଘୋଷ ଗାସେର ବ୍ୟଥା ଏଥି ଆର ବୋକା ଯାଇନା । ଗୁଟି ଓଟାର ଆଗେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଲୋ । ଏଥି ଆର ନେଇ । ଏଥି ରୁଯେଛେ ଆଳାଟା । ଶରୀରେର କୋନ ଭାଙ୍ଗିଗା ବଲମେ ଧାରାର ପର ଦ୍ୱାରା ହୁଲେ ସେ ବକମ ଆଳା ଧାକେ—ଠିକ ସେଇ ବକଟମର ଆଳା । ଆଳାଟା ଏକେକ ସମସ୍ତ ସବକିଛୁ ଭୁଲିଯେ ଦିଜେ ।

ମାବେ ମାବେ ଆବାର ଧୋଲ ଫିରେ ଆମଛେ । ବୁକେର ଭେତରକାର ତବନୋ ପିପାସାଟା ହା ହା କରେ ଉଠିଛେ, ଚାରପାଶେ ଜୀବିଯେ ଦେଖିଛେ ମେ ଯେଷେଟା ଏଲୋ କିନା । ହାତେ ଏକଟା ଘଟି ଅଥବା ମାଟିର ଭାଂଡେ ଟଳଟଳେ ଠାଣୀ ପାନି ନିଯେ ଆସେ କି ନା । ଅଦୂରେ ନଦୀ ଆର କାଶବନ ଧୁ ଧୁ କରଛେ । ସଦି ଉଠିତେ ପାରତୋ, ମାରାଟା ଗାସେ ସଦି ଏମନି ସଞ୍ଚଗା ନା ଧାକତୋ ତାହଲେ ହୁଯତୋ ବାରାନ୍ଦା ଧେକେ ନେମେ ଚଲେ ସେତୋ । କୁଡ଼ି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାର ଧେକେ ନୀଚେ ବାଂପିଯେ ପଡ଼େ ଆକର୍ଷ ପାନି ଧେତୋ ମୁଖ ଡୁରିଯେ । କିନ୍ତୁ ଗାସେର ଗୁଟିଙ୍ଗେ ଏମନ ଆଳା କରଛେ ଏଥି ସେ ତାର ହେଟେ ଚଲେ ବେଙ୍ଗାବାର କ୍ରମତୀଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହେ କି ନେଇ ବୁବତେ ପାରଛେ ନା ।

ଆକାଶେ ନିକେ ମୁଖ ମେଲେ ପଡ଼େ ଆହେ ସାଜାହାନ ଉତ୍ତାଦ । ବହ ଦିନେର ପୂରନୋ ଅବ୍ୟବଜ୍ଞତ ବାରାନ୍ଦାଟା ପରିଷକାର କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲୋ କାନନଦାଳା । ସେଇ ସମ୍ମ ପରିଷକାର ଖୋଯା-ଗୁଟା ବାରାନ୍ଦାର ଏକପାଶେ ଲାଟ କରେ ରାଖା କାଗଢ଼-ଆମା ଆର ବିଛାନା-ଚାମର-ଲେପେର ମୁକ୍ତ ଏକାକାର ହସେ ଶରେ ରୁଯେଛେ । ଘରେର ଛାନ୍ଦାଟା ଭେତରେ ଦିକେ ଭାଙ୍ଗା । ଗୋଟା ଆକାଶଟା ମେଇ ସରେର ଭେତରେ ହମକି ଧେରେ ପଡ଼େ ରୁଯେଛେ । ତାହି ବାରାନ୍ଦାଯ ଆଖର ।

କଲିନ ହଲୋ ? ମନେ ମନେ ହିସେର କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସାଜାହାନ ଉତ୍ତାଦ ।

তারপর অদ্বৰে নিষ্পত্তি শিয়ুল গাছটাৰ দিকে চাইলো। সেখানে ক'টা ফ্যাকাসে শকুন ঘাড় ওঁজে বলে বৱেছে। সারাব্বাত ঐ শিয়ুল গাছটা থেকে শকুনেৰ বাক্তাৰ কাতৰ কাজা শনেছে। ক'টা শেয়াল এসে মূৰে কিবে গিয়েছে বাবান্দাৰ চারপাশে।

শীতেৰ শূর্ঘ ব'ঁকি মেৰে মেৰে ওগৱেৰ দিকে উঠেছে। বাবান্দাৰ অৰ্ধেকটা জুড়ে রোদ পড়েছিলো। এখন সৱে যাজ্জে। উভৱেৰ হাওয়া বৱে আসছে মাৰে যাৰে।

আমি মৱে যাচ্ছি, বিড়বিড় কৱে বললো সাজাহান শক্তাদ। কাননবালা গিয়েছে গুৰু গাড়িৰ থোজে। সেই সবে খাল্লবল্ল যদি কিছু পায়। কিছ আমি জানি এমনি একদিন ও বেৱিলৈ যাবে আৱ ফিৱবে না। গায়েৰ গুটিঙ্গলো সব পাকতে আৱল্ল কৱেছে। এক সময় ওঙ্গলো গলতে আৱল্ল কৱবে—পচা চামড়াৰ আৱ পুঁজেৰ শুকনো দুৰ্গন্ধ বেকতে থাকবে। শশানেৰ বড় বড় মাছি ইতিমধ্যে বাবান্দায় এসে বসতে আৱল্ল কৱেছে। এক সময় ওঙ্গলো ব'ঁকে ব'ঁকে আসবে; সৰ্বাঙ্গ ছেঘে যাবে। একটা গুটিৰ মুখ দিয়ে চুকে আৱেক গুটিৰ মুখ দিয়ে বেকবে। বাতে হয়তো কোন হঃসাহসী শেয়াল এসে তাৰ জ্যাস্ত শৰীৰে কামড় দেবে—অদ্বৰে শকুনেৰ দল ভানা গুটিয়ে নেমে আসবে। আৱ সবাই অপেক্ষা কৱবে। একটু একটু কৱে গলা বাড়িয়ে মাথা নীচু কৱে ঠোটেৰ বাঁকানো ভগা দিয়ে চামড়া টেনে ছিঁড়বে।

আমি তাহলে মৱছি। অনেক মৱণেৰ খেলা দেখিলৈ, অনেক হঃসাহসী মৱণেৰ খেলা খেলে শেষটা আমাকে মৱতে হচ্ছে। একবাৱ ত্ৰিফলা বৰ্ণাৱ। একটা ফলা উৱতে গেঁথে গিয়েছিলো, একবাৱ অনেক উচু থেকে শৰীৰে আওন লাগিয়ে ব'ঁপিয়ে পড়তে গিয়ে শৰীৰ বলসে গিয়েছিলো, একবাৱ রিং-এৰ খেলা দেখাতে গিয়ে দোলনাৰ দড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়েছিলো। অনেক খেলা খেলে—মৱণেৰ উৰেগটাকে অসংখ্য লোকৰ চোখে তাৰায় তাৰায় নাটিয়ে আমি বৈচে গিয়েছি—কিছ এবাৱ আৱ বীচোৱা নেই।

হঁ, আমি খালা ভাহলে মৱলাম। এই শশানেৰ ভাড়া ঘৰে, আমি মৱলাম। কলেৱাৰ 'ভয়ে মেলা শুল্ল লোক পালিয়ে গোঁজো, আমি গেলায় না—কিছ কলেৱায় আমাৰ মৱণ' হলো না, হলো বসন্তে।

সুর্টা এখনো চোখে লাগছে। বারান্দাটা আলোকিত। আহা কত আলো! চারপাশে প্যালারিতে থাক থাক মাঝুষ একসঙ্গে জোড়া জোড়া চোখে কৌতুহল আৰ উৰেগেৱ জোনাকি জালিয়ে বসে রয়েছে। সাজাহান ওস্তাদ মাৰবধুনে এসে দাঢ়ালো। গায়ে আটো সিলেৱ গেজি, জাঙ্গিয়া মোজা, বুকেৱ উপৱ সাৱ সাৱ মেডাল বোলানো। আৱ তাৱ সম্মথে এসে দাঢ়ালো মিস হীৱাৰ। আহা হীৱাৰ কি স্থাম শৱীৱ, কী প্ৰমত জোয়াৰেৱ কলকল বাজলো দৰ্শকেৱ রক্ষেৱ গতিতে। বাজনা বাজছিলো ধীৱ যুচ্ছ লয়ে। কুন্নেট আৱ সাইডড্রাম শুধু। এবাৱ বিউগ্ল আৱ ড্রাম বাজতে শুক্র কুন্নলো। ব্যাণ্ডমাস্টাৰ সাধু থাঁ নজৰ রাখছিলো মিস ভায়মণ্ডেৱ উপৱ। এক একবাৱ বাহু বিক্ষেপে, শৱীৱেৱ বাঁহুনিক্তে দম দম কৰে সে ড্রামে ঘা দিছিলো।

কতো আলো, কত আলো! ব্যাণ্ডমাস্টাৰ বাজাও, বাজাও— ম্যানেজাৰ কুটুম্বাবাও বিপুল দৰ্শক সমাগমে উত্তোলনায় অহিৱ হয়ে কথা বলছিলো।

ত্ৰিফলা বৰ্ষা এলো, তীক্ষ্ণধাৰ ফলা তিনজিৰ মাথায় কালো ভেলভেট জড়ানো—আৱ সেই ভেলভেটেৱ মাথাৰ উপৱ একটা ছোবলাতে উচ্চত কপোৱ সাপ; তাৱ মণি দুটো ঘটৰ দানাৰ মত বড় লাল চুনি পাথৰেৱ তৈৱী। সাপটা দুলছিলো, মণি দুটো হিলহিল কৰে কাপছিলো আৱ সামনে একে একে সিঁড়ি বেয়ে উপৱে উঠছিলো মিস ভায়মণ্ড। একেবাকে উপৱে উঠে একটা বাঁশেৱ মাথায় ব্যালাস কৰে সে একে একে কাপড় খুললো। ভেতৱেৱ লাল জাঙ্গিয়া আৱ কাঁচুলি শৱীৱে নিয়ে সে দু পা বাঁশেৱ উপৱে রেখে পাশে দুহাত ছড়িয়ে দাঢ়ালো। এবং তাৱপৱই সে পিকল্ক কুন্নলো এক হাতেৱ উপৱ ভৱ কৰে। সেই দৃশ্য ঘটছে সাজাহানেৱ সম্মথে, সে বাঁশেৱ নিচে ত্ৰিফলা বৰ্ষাটা নিয়ে উচুতে তুললো। বিন্বিন্ ঘৰে বাজনাটা বাজতে বাজতে চলেছে তখন।

এইবাৱ, এইবাৱ। মিস ভায়মণ্ড, ঘৰ্মা দাস তুমি কত খেলা দেখাৰে। যতকিনি শৱীৱটাৰ জৰুয়ানী ততদিনই তো। যতদিন ঐ উক বিশাল থাকবে, যতদিন স্নন্যুগ স্বপুষ্ট আৱ উক্তত থাকবে ততদিনই তো। কিন্তু তাৱপৱ। আজ ম্যানেজাৰেৱ তাবুতে শোবে কিন্তু মোহৰত জমাৰে আমাৰ সহে—কাল থখন আমি পুৱনো হৰে যাবো তখন থাকবে অস্ত কেউ। মিস হীৱাৰ, তাখো আখো তোমাৰ ঘৰ পোশাক ধেকে কী বৰকত

‘আগুন জলছে ঢাখো। সাপের চোখের মণি ছুটোতে কি কুটিল লাল জলছে ঢাখো।

বাজ্রাটা একসঙ্গে বেজে উঠেই বয় করে বক হয়ে গেলো এবং সাজাহান ওস্তাদ মাটিতে শুয়ে শুয়ে অহুভব করল তার উপরে তীব্র ব্যঙ্গ। ত্রিকলা বর্ণার ফলা বৈধা উকুল তীব্র ব্যঙ্গাটা এতোদিন পর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গিয়েছে। সেই ব্যঙ্গ—কিন্তু আলাটা কোথায়? সেই তীব্র আর ক্ষিপ্ত আলাটা কোথায় গেলো?

সাজাহান ওস্তাদ পাশ ফিরলো। চোখে সামনের অগঁটা হলদে হয়ে আসছে। ক'টা কাক ভারতীয়ে চেচেছে ছাতের উপর। কাছেই দেখলো কাননবালা মাটির ভাঙ্ডে করে পানি নিয়ে আসছে।

‘খুব কষ্ট হচ্ছে!

না। খুব কি আর এমন।

গাড়ির ব্যবস্থা হলো না। আজ অনেকদূর গিয়েছিলাম। পঁচিশ টাকা দিয়ে চাইলাম তবু এলো না।

একটু পর শুকনো টোস্ট এনে দাখলো সামনে—খাও।

মুখের ভেতরে গুটি উঠেছে। সাজাহান ওস্তাদ পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখে দিলো একটু একটু করে। চিনি নেই। কবেকার তৈরী টোস্ট কে জানে। এখন টকে উঠেছে। চা হলে হতো। হঠাৎ চা খাওয়ার ইচ্ছে অহুভব করলো সাজাহান।

কেমন লাগছে এখন? ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো কাননবালা। মেঘেটাকে ঝাস্ত দেখলো সাজাহান। হাসলো একটুখানি। বললো, ভালো লাগচে, ইয়া ভালোই আছি।

নতুন গুটি উঠেছে!

না, বোধ হয় ওঠেনি।

হায় ভগবান, এ কি কাণ। চোখটা লাল কেন ওস্তাদ?

ও, সাজাহানের খেয়াল হলো একটা চোখে সে বাপসা দেখেছে। বললো, আটি উঠেছে হয়তো।

উবেগে আর সহাহকৃতিতে মেঘেটা ক্রেয়ন ধেন হয়ে গেলো। দেখলো সাজাহান ওস্তাদ। মেঘেটার অস্ত তার ছুঁধে হলো। বললো, তুই চলে ধা। অদের পেরে ধাবি কাস্তনগরের মেলায়। ওখানে মিন কদেক ওরা ধাকবে।

ଶୋଜା ରାତା, କୋନ ଭୁଲ ହବେ ନା । ଆଖାନଗରେ ଗିଯେ ରେଲଗାଡ଼ିତେ ଉଠିବି
ତାରପର ଠାକୁରଗୀରେ ନେମେ ସାମେ ଚଢ଼େ ଶୋଜା ମେଳା ।

ସାଂ, କି ସବ ଭାବଛୋ ଆଜେବାଜେ । ଏଥାନେ କେଉ ନା ଧାକଲେ ତୋ
ଶେଯାଲେ ଥେବେ ଫେଲବେ ତୋମାକେ ।

ଆରେ ନା, ନା, ଅତ ଶୋଜା ନୟ । ଆଖି ମରବୋ ନା । ଜିନ୍ଦଗୀତେ ଶୁଣୁ
ତୋ ବେଚେଇ ଗେଲାମ । ଏତୋ ମରଣେର ଖେଳା ଖେଲାମ କିନ୍ତୁ ମରାମ କହି ।
ଦେଖିଲ ଏବାରଏ ଠିକ ବେଚେ ଥାବୋ ।

ଏକୁଟୁ ଥେମେ ବଲଲୋ, ଏ ବରଙ୍ଗ ଭାଲଇ ହଲୋ । ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲେ ପାରଛିଲାମ
ନା । କେମନ ଯେନ ମାଯା ପଡ଼େ ଗିଯେଛିଲୋ । ଏହି ଚାଲେ ଏକଟା ଶୁବିଧେ
ହୟେ ଗେଲୋ । ଏବାର ନତୁନ ପାର୍ଟି ଖୁଲବୋ ।

ଧାକ ଧାକ ଶୁମ୍ଭୋଓ ତୁମି । କାନନବାଲା ଓର ମାଥାଯେ ହାତ ବୁଲୋତେ
ବୁଲୋତେ ବଲତେ ଲାଗଲୋ, ଶାଲାରା ଆମାର ଛେଡ଼େ ପାଲିଯେ ଗେଲୋ । ନା ହୟ
ମରେଇ ସେତାମ କଲେରାଥ—ତାଇ ବଲେ ଫେଲେ ପାଲାବେ ।

ଅମନ ହୟ କାନନବାଲା । ଜିନ୍ଦଗୀଟା ମହା ଶୁଲ୍ଯବାନ ବଞ୍ଚ ମାହୁମେର କାଛେ,
ତାଇ ଆନେର ଭାର୍ଟା ସବ ଚାଇତେ ବଡ ଭୟ ।

କିନ୍ତୁ ତୁମି ଭୟ କରିଲେ ନା କେନ ?

ଆମାର ଆବାର ଭୟ କି । ଶାଲା ବେଯାର୍କି ଚିଠିର ମତ ଦିନ କାଟିଛି ।
ତୁହି ମରତେ ବସେଛିଲି, ଭାବାମ ତୋର ଏଥିନେ ବସି ଆହେ, ମରବି କେନ ତୁହି ।
ଦେଖି ସମ୍ବି ବେଚେ ଥାମ । ତୁହି ବେଚେ ଗେଲି । ଏଥିନ ବେଚେ ଧାକ ଆରୋ କିଛୁଦିନ ।
ଦତଦିନ ବୀଚବି ଶାଖ ଜିନ୍ଦଗୀଟା ପ୍ରାଗ ଭରେ । ବଡ ମଞ୍ଜାର ଆସଗା ଛନିଯାଟା ।

ବିଂ-ଏର ଖେଳା ଦେଖାତୋ କାନନବାଲା । ଭାଟୁ ରାଜା ତାର ମଳେ ଭୁଟିଯେଛିଲୋ ।
ବଲେଛିଲୋ, ଏ ଯେମେର ବନନେ ଆସି ସାର୍କାରେର ରଙ୍ଗ ଆହେ । ହାତୁମାର ମତ
ଉଡ଼ିତେ ପାରବେ । ମନେର ଝୋର ଆହେ ଲେଡ଼କିର । ବେଟ ଜିଭା ବହ । ପିଠି
ତାପଡ଼େ ବଲାତୋ ସେ । ଟ୍ରୀପିଙ୍ଗେର ଖେଳା ଶେଖାତେ ଚେରେଛିଲୋ ଭାଟୁ ରାଜା । ଭାଟୁ
ଟ୍ରୀପିଙ୍ଗେର ଖେଳା ଦେଖାତେ ଦେଖାତେ ହାତ ଫସକେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ ନିଚେ, ଘାଡ଼େ ଚୋଟ
ଲାଗଲୋ ଆର ଘାଡ଼ ଭେଡେ ଲୋକଟା ମରେ ଗେଲୋ । କାନନବାଲା ଘୋଡ଼ାର ଓପର
ନାଚଲୋ କିଛୁଦିନ, କିଛୁଦିନ ସାଇକେଳ ଚାଲାଲୋ, ଚୋଥ ବୀଧୀ ଖେଳୋଯାଡ଼େର
ଧାରାଲୋ ଛୋରାର ଫ୍ଳାର ସାମନେ ଦୀଡାଲୋ । କାନନବାଲା ଫଳତୁ ଖେଳୋରା କୃ
ହୟ ଥେବେ ଗେଲୋ । କିନ୍ତୁ ମରିଲୋ ନା ।

ଏଃ ସାଲି ଏକମଧ୍ୟ ବନବିଜୀ ହାର ! ଚନ୍ଦନ ପାଲ ଏକଦିନ କାନନେର ଭାବୁତେ
ଛୁକତେ ଗିଯେ ଚୋଟ ଥେବେ ଏସେ ବଲେଛିଲୋ ।

ଆହା କେଇ ମେଯେମାହୁଷଙ୍ଗଲୋ ! ଫାଇନ ଫାଇନ ଶରୀରଙ୍ଗଲୋ । ନିଟୋଳ
ଆର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର ଶକ୍ତିମତ୍ତୀ ଶରୀରଙ୍ଗଲୋ । ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଭାବତେ ପାରଛେ ଏଥିମ
ଶାଜାହାନ ଓତ୍ତାମ ।

କମଳା ଶାର୍କାସେର ଭରୋଷୀ ଆର କ୍ଲାଉନ ମଦନ ମାଲହୋତ୍ରା । କୀ କେଳେକାରିଟାଇ
ନା ହଲୋ । ଭରୋଷୀ ଘୁରିଯେଛିଲୋ ସବାଇକେ । ଅଧ୍ୟାଂଗଲୋ ମେଯେ ଭରୋଷୀ ଜାନ
ଧାରାପ କରେ ଦିଯେଛିଲୋ ସବାର । ମ୍ୟାନେଭାରେର ପର୍ବତ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରୋଷୀ ମହେ
ଗେଲୋ ସିଂହେର ଧାଚାୟ ନୟ, ଖୋଲା ଜାଯଗାୟ ପ୍ରୋକଟିଶେର ସମୟ ସୋଡ଼ାର ଚାଟ
ଧେରେ । ମେଯେଟା ମରେ ଗେଲୋ କିନ୍ତୁ ତାର ପେଛନେ ଲେଗେ ଧାକା ମାହୁଷଙ୍ଗଲୋ କେଉ
ତାର ଚିକିଂସାର ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହଲୋ ନା । ବେତୋ ମ୍ୟାନେଭାର ମାଧ୍ୟ କୁଟେ ମରଲୋ ।
କିନ୍ତୁ ଏକଟା ଲୋକକେ ପାଠାତେ ପାରଲୋ ନା ଭରୋଷୀର ସଜେ । ମେଯେଟା
ହାସପାତାଲେ ମରେ ଗେଲୋ ଦୁଦିନ ପର ।

କାନନବାଲା ମରାର ଚାକ ପାଯନି । ଅମନ ଖେଲା ତାକେ କେଉ ଶେଖାୟ ନି ।

କତ ବହୁ ଧାକଳି ତୁଇ ଗୋଲେନ ଶାର୍କାସେ ?

ମଧ୍ୟ ବହର ।

ଅନେକଦିନ ହେଁ ଗେଲୋ । ଏବାର ଫିରେ ଯା, ଅନ୍ତ ପାର୍ଟିତେ ଢୋକ ଗିଯେ ।
ଏଥିନୋ ବଯସ ଆଛେ ଏଥିନୋ ଦେଖତେ ଭାଲୋ ଲାଗବେ ତୋକେ । ନତୁନ ଖେଲା
ଶିଖେ ନାମ କରିବି ।

ଆୟି ନା ହସ ଯାବୋ ଓତ୍ତାମ, କିନ୍ତୁ ତୁମି !

ଆୟିଓ କିଛୁ ଏକଟା କରବୋ ନିଶ୍ଚଯିଇ ।

ଆକାଶଟା ଏଥିନ ଧୂର । ଶୀତେର କୁମ୍ଭାଶା କାଟେନି । କାନନବାଲା ଛାତ୍ର
ଭେଜାଲୋ । ମେଘ କରେଛେ ଆକାଶେ, ହୃଦୀତୋ ବୃଣ୍ଟି ହେଁ । ଏହି ଶୀତେ ବୃଣ୍ଟି !

ସହି ତଥିନ ଚଲେ ନା ଆସତାମ ତାହଲେଇ ଭାଲୋ ହତୋ ! ମେଲାର କୋଳ
ଘରେ ଥେକେ ଯେତେ ପାରତାମ ।

ତା ପାରତାମ !

କିଛୁଟା ବୋକାୟ ହେଁଛିଲୋ ବହିକି । ମେଲାତେ କଲେରା ଲାଗଲୋ—
ଜନାନ୍ଦନ ଲୋକ ମରତେ ଲାଗଲୋ । ମୟାଇ ପାଲାଲୋ । ସାତଦିନ ପଡ଼େ ଧାକଲୋ
ଶାଜାହାନ ଓତ୍ତାମ ମେଯେଟାର ପାଶେ । ମେଲାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତାରେର ଓୟୁଦେଇ
ବୈଚେ ଗେଲୋ । ମେଯେଟାର ରକ୍ତର ଜୋର ଲଭିଯାଇ ଛିଲୋ । ତାରପର ପାର୍ଟିର
ଧୋଜେ ରାତ୍ରା ଧରା । ହାରାମଭାଦାରା ପାଞ୍ଜାନ ଟୀକା ପରମା ପର୍ବତ ଦିଯେ ଯାଇନି ।
ଓହେର ଧୋଜେ ରାତ୍ରାର ଲେମେଇ ଏହି ବିପର । ସବାଳ ବେଳାତେଇ ଓହ ଜର ଜର
ଭାବ ଛିଲୋ, ବିକେଳ ନାଗାମ ଇଟିତେ ଇଟିତେଇ ଦେଖିଲୋ ଖଟି ଉଠିତେ ଆରାମ

করেছে, গাঁথের ভেতরে জায়গা ঢাইতে কেউ থাকতে দিলো না। গতবারের
মড়কে গোটা গী উজ্জাড় হয়ে গিয়েছিলো। তাই এই শুশানবাস। গাছতলায়
বসে থাকতে সক্ষ্যার অস্পষ্ট আলোয় সাজাহান ওস্তান নিজেই
দেখেছিলো ঘৰখানা। যনে হয়েছিলো হোক শুশান, তবু পাকা ঘৰতো।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হিজিবিজি অসংখ্য মাগ কাটা।
কোথাও কোথাও লোকের নাম, সাল, তারিখ। সন্তুষ্ট শুশানে আসা
শবদেহের নাম, হৃত্যুদিন। বড় বড় করে লেখা—নৱনারায়ণ সাহা, ১৪ই
অগ্রহায়ণ, সন ১৩২। এক জায়গায় লেখা—৮শ্রীরাধাকৃষ্ণ, হয়ে কৃষ্ণ
হয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ে হয়ে।

একটা চোখ দিয়ে দেখা। তান চোখটা বেদনায় টাটাচ্ছে না এখন
আর।

ছাতু খেলো কাননবালা। তার আগে নালীতে তুব দিয়ে এসেছে।

তুমিও কিছুটা খেয়ে ফেলো।

ইয়া, থাবো। একটু পরে থাবো।

বিকেল হতেই আবার উঠলো কাননবালা।

যাই ওস্তান, মেখে আসি যদি কোন গঙ্গৰ ঘাড়ি পাই।

সাজাহান হাসতে চেষ্টা করলো।

কাননবালা আকাশের পুব দিকে তাকিয়ে বললো, বিষ্টি আসতে পারে।
তাহলে তুমি তো তুমি, আমি ওক্তু নিমোনিয়ায় যাবো।

সাজাহান ঘাড় কাত করে দেখতে চেষ্টা করলো মেঘাচ্ছম
পুবদিকটা। কেমন একটা স্তুতা ধমকে আছে। সাজাহান এবার হেলে
উঠলো। এতোক্ষণ চেষ্টার পর। তারপর বললো, চোখটা বোধ হয় গেলো।
কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাননবালার ক্রত চলে যাওয়ার শব্দ উন্নলো শুধু। কোন কথা না বলে
চলে গেলো মেঘেটা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো সাজাহান ওস্তান। দেখতে পেলো
না। একটা চোখের ওপর ভারী আর ঝাপসা পর্দা আর অঙ্গটার দৃষ্টি শিমূল
গাছটার আড়াল অবধি পৌছায় না—শুধু বুরলো কাননবালা পালালো।

এ শালাৰ জ্ঞালোই হলো। নিজের ভবিষ্যতটা বোবা গেলো। এবার
আর কি, ঠিক এখানে না হোক এই এলাকাৰই কোথাও মনে পড়ে থাকবো।
এখনো হৃত্যুৰ আতঙ্কটা তাৰ ঘনেৰ ভেতৰে আসছে না। আমাৰ বুজিটা

এখনও কাজ করছে। বুরতে পারছি। রোগের তরালে বৃক্ষ-বিবেচনার
ঘোষ লাগলেও স্পষ্ট বুরতে পারছি। আমাৰ ভবিষ্যতটা ফুল।

কাননবালা তুই গেলি তাহলে। যা যা জিনগীটা এখনো তোৱ কাছে
তাজী ঘোড়াৰ মত টগবগে। তোৱ জওয়ানীতে গৱম রক্তেৰ টগবগানি
এখনো থামে নি। এবাৰ যাবি জোয়ান মৱদেৱ কাছে যে তোৱ আসল
তাৰিক বুৰবে।

এই হয়। বৃক্ষই হলো আসল। যতদিন রক্তেৰ তেজ থাকে ততদিনই
তো জিনগী। আৱ জওয়ানীই হলো জিনগীৰ আসল আসোয়াৰ। মোটা
শৰীৰ মাও লুন ব্যালাঙ্গেৰ খেলা দেশাতো। হাৰামজাদা পাখিৰ মত
উড়তো। হাতেৰ কাজতো নয় যেন জাদু। তাক লেগে যেতো ওৱ খেলা
দেখে। সেই মাও লুন টাকা জমাচ্ছিলো লুকিয়ে লুকিয়ে। অহৰত বাই
এৱ সক্ষে চুটিয়ে মুহৰত কৱতো। আৱ সেই সময় জহৰত বাই-ৰ ঠাবুৰ
দৱজায় অক্ষকাৰে ওৱ বুকে ছুৱি চালিয়ে দিলো কে যেন। খোজ খোজ
ৱৰ পড়লো আৱ তাৱ পঞ্চাঙ্গটা গিনি নিয়ে জহৰত বাই উধাও হলো।

সেই বৃক্ষগুলো কী লাল ছিলো। হাজাকেৰ উজ্জল আলোয় সেই লাল
বৃক্ষ ফিনিক দিয়ে বেঞ্চছিলো। ধড়ফড় কৱছিলো পাখিৰ মতো হালকা
মাছুষটা। তাৱপৰ আস্তে আস্তে তাৱ আতঙ্কিত চোখ মূখ ফ্যাকাসে হয়ে
গেলো। লোকটাৰ বৃক্ষ শেষে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে এক সময় সে হিৱ পাথৰেৰ
মত ভাৰী হয়ে গেলো।

সেই রক্তেৰই তেজ তো হল আসল। সেই বৃক্ষ উভাল হয়, টালমাটাল
কৱে তোলে জিনগীকে—দৱিয়াৰ জোয়াৱেৰ মতন। আৱ এই জোয়াৱটাই
হলো জওয়ানী। সেই জওয়ানী নিয়ে আজ চলে গেলো কাননবালা। না
গেলেও যাবে একদিন।

সাজাহান, ওৱে কালু শেখ তুই এবাৰে মৱলি। শুধু দুঃখ, মৱবাৰ
সময় খেলা দেখিয়ে মৱলি না। তোৱ শেষ খেলাটি কি হবে তাতো জানি।
এক সময় তোৱ বৃক্ষতঙ্কি লোপ পাবে, বাঁচবাৰ অন্তে পাগল হয়ে উঠবি।
মৱতে ভয় পেয়ে এক সময় তুই ছুটে যেতে চাইবি। গোড়িয়ে গোড়িয়ে
চেোবি—কিন্তু মৱণ থেকে পার পাবি না। হঁচোট থেয়ে দিলা হাৰিয়ে
আন হাৰিয়ে পড়ে যাবি কোথাও। তাৱপৰ সেখানে মৱে যাবি।

শৰুনেৰ আঁক পড়বে তোৱ লাশ্বেৰ ওপৱ। আজ হোক কি ক্যাল
হোক। এমনই তো হয়।

আকাশের মেঘটা এখন ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্য হলে পড়েছে। গোটা বারান্দায় রোদ। ঘরের ভেতরের স্ন্যানগাঁওতে দেয়ালে ঝাওলা ধরেছে। একটা পাথি উঠে এসে বসলো। মনে হলো পাখিটা কতকগুলো খড়হুটা খেড়ে ফেললো ওপর থেকে। মেঝেতে নীল রঙের ডিমের খোসা পড়ে রয়েছে।

শীত শীত লাগছে এখন। পায়ের কাছ থেকে চাদরটা টেনে নিলো সাজাহান উষ্ণাদ।

‘আমি তাহলে যবছি! আবার বিড়বিড় করে বললো সে নিজেকে। যববো আজই রাতে অথবা কালকে। ভাঁবনাটা ওকে ক্রমশই একটা ধূসর থেকে ধূসরতার এবং বির্বৎ চিন্তার লিকে টেলে নিয়ে যেতে লাগলো।

আমি মরে যাচ্ছি। আমি মরে যাচ্ছি।

উভরের ধূসর পাহাড়ী দিগন্ত সে দেখতে জাইলো একবার। একবার ইচ্ছে করলো, দক্ষিণের খোলা মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। উভরে হিমালয়ের পঞ্চচূড়া কাঞ্চনজঙ্গলা দেখা যেতো আকাশ পরিষ্কার থাকলো। তাবু থেকে সে বেরিয়ে প্রায় রোজই দেখতে যেতো। এখন থেকেও দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে না। কিষণগঙ্গের খাগড়ার মেলা থেকে দেখা যেতো। হরিহরচন্দ্রের মেলা থেকে দেখা যেতো, আলোয়া খাঁর মেলা থেকে দেখা গিয়েছে। পাহাড় আৱ প্রান্তৰ আৱ ঠাণ্ডা মণ্ডুম—এ না হলে যেন সার্কাস হয় না। হিমালয়ের উচু চূড়োৱ লিকে তাকিয়ে মালাবাৰ হিল্সের গঞ্জ কৱতো বিশ্বনাথন। দিনেৱ পৰ দিন এক মেলা থেকে আৱেক মেলায় গিয়েছে। দেশ ভাগভাগিৰ আগে পৰ্যন্ত অমজ্জয়াট মেলা বসতো। হরিহরচন্দ্রের মেলা আৱ খাগড়ার মেলাৰ নাম ছিলো। তিক্কত থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ব্যবসায়ীৱা আসতো। শাড়ীমাথা লাল কথলেৱ আলখাজী পৱা তিক্কতীৱা কোমৰে শুঁজে নিয়ে আনতো যুগ-কস্তুৰি, বৰ্মীৱা বিচ্ছি কাঠেৰ বাজে বোৰাই কৰে নিয়ে আসতো মূল্যমান পাথৰ আৱ আসতো ইন্দোনেশিয়াৰ মূল্যমান ব্যবসায়ীৱা।

কিন্তু সেই দিন থাকলো না। ‘কমলা’ ভেড়ে গেলো। ‘জুবিলি’ আধমৰা হৰে কোনৱকমে বৈচে বইলো। আৱ যাৱা নতুন বাজাৰেৰ অঞ্জে চলে এলো এপাৰে ত্যাৱা মৱলো।

গোড়েন সার্কাসও ভাঙছে। তাকে বাঁচানোৰ চেষ্টা বৃথা। আজকাল আৱ সুন্দৰী আশ্চৰ্যভী যেমেৱা সার্কালে আসতে চায় না। কোশ্চানীতে

পয়সা বেশি। বাড়ি মেশে মাসের পর মাস ধরে হাঁটি পড়ে—তেজা মাটির উপর ক্ষয়াশ্চ খাটে শুয়ে থাকতে হব। নীচে ব্যাঙের পিছু পিছু সার্প চুকে পড়ে, ব্যাঙে আর সাপের লুটোপুট শব্দ হয়।

ভয়ে, অস্থথে, বিনি রোজগারে গোড়েন সার্কাস ভাঙছে। হৃষুদ্বারাও চলে গিয়েছে সেই কবে। যিস ডারমণ পালিয়ে চলে গেলো কমলা সার্কাসে, গোড়েন জুবিলিতে গিয়ে জুটলো ঘনোহু কাউর। থেকে গেলো শুধু বুড়ো আশিক আজাদ। বলমলে পোশাক পরে সে গোড়েন সার্কাসের বাষের খাচায় চুকতো। আশিক আজাদ বুড়ো গেলো না কোথাও, কিন্তু একে একে তিনটে বাষই মরে গেলো। হৃদরী মরলো বাঢ়া হবার সময় আর লাল বাহাদুর মরলো ঠাণ্ডা লেগে।

গোড়েন জুবিলি তারপর থেকে ভাবছে আবার ক্রিয়ে যাবে কি না। আবার ক্রিয়ে যাবে কি না বিশাল কুক্ষ উন্মুক্তিতে। এই শামল শোভা সবুজ মাটি বহুত খতরনাখু।

বেলা আর নেই। অঙ্ককার দিগন্তের কাছ থেকে এখনি তেড়ে আসবে। আর সেই অঙ্ককারের সঙ্গে সঙ্গে আসবে শান্তের শেয়ালগুলো। অঙ্ককারের উপারে তাদের চোখ গুলো জল জল করে জলবে। বারবার করে আসবে। তাড়িয়ে দিলেও আবার ক্রিয়ে আসবে। আর চেষ্টা করবে তার গায়ের ম্যাংসে দীত বসাতে।

জলজল করে জলছিলো অমনি লোভী পাশব আর ধূর্ত চোখগুলো। কাওসারবাহু, তুঃ এসেছিলে গোড়েন সার্কাসকে দীঘিয়ে ভুলতে। নাচ আর গান আর শরীরের লোভ দেখিয়ে ভাঙা আসর জয়তে চেষ্টা করেছিলে। গোড়েন সার্কাসের কাউট্টারে আবার ঝঘাবমু পয়সা পড়তে আরম্ভ করলো। সব ভালো হলো, সব ঠিক হলো—কিন্তু গোড়েন সার্কাস খাকলো না। যেখানে হৃঃসাহসী ঝাঁটুরাজা—রাজার মত অধীক্ষ ছিলো। সেখানে এখন কাওসারবাহু হলো মক্ষীরানী। য্যানেজার থেকে আরম্ভ করে সবাই সমীহ করে কথা বলতো কাওসারবাহুকে। কাওসারবাহু বসে থাকতো। নাইলনের গোলাপী কামিজ তার উপর শিকনের মোপাট্টা। পাঞ্জাবের যেয়ে এক লোকের হাত ধরে ভাগ্য-ভৱনা করে জেসে পড়েছিলো। ঢাকায় এসে সে লোক একদা উধাও হয়ে গেলো। আর কাওসারবাহু তখন পথে এসে নামলো। ওকে জুটিয়ে, নিয়ে এল কাননবালা। দেনে আলাপ, এসেই থেকে সহি পাতালো এবং সেখান থেকে সার্কাসের ঝাঁটুতে।

କାଓସାରବାହୁର ଶରୀରେ ଆଣ୍ଟନ ଛିଲୋ । ଏକଟା ଦାମୀ ହୀରେ ଦେଯନ ଏପାଥ
ଶ୍ଵପାଶ ଫେରାଳେ ଝଲକାୟ—ତେମନି ଝଲକାତ୍ତୋ କାଓସାରବାହୁ । ଚୋଲି ଆର
ଘାଗଡ଼ା ପରେ ସେ ଆସରେ ନାଚତୋ । ଚଟକଦାର ଦିନମାର ଗାନେର ତାଳେ
ତାଳେ । କେ ଜାନେ ଲେ କି ନାଚ । ତାର ଘାଗଡ଼ା ଥିସେ ଖୁଲେ ପଡ଼େ ଥେବେଳେ ।
ଚୋଲିର ପେଛନେର ଫିତେର ବୀଧନଙ୍ଗଲୋ ଛାପିଯେ ତାର ଚାମଡ଼ାର ଆର ଘୋବନେର
ଜୋଲୁଶ ଉପରେ ପଡ଼ତୋ, ବୁକେର ଦୋଲନେ ଲେ ବୀଧନ ଏକ ସମୟ ପାଟ ପାଟ କରେ
ଛିନ୍ତତୋ । ଆର ବାଜନାର ତାଳେ ତାଳେ ଶେଷ ବୀଧନଟି ଖୁଲେ ପଡ଼ାର ମୁହଁ
ପରସ୍ତ ଲେ ନାଚତୋ । ଏବଂ ସେଇ ଶେଷ ବୀଧନଟି ଖୁଲେ ପଡ଼ାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବ
ବାଜନା ଏକସଙ୍ଗେ ଥେମେ ପଡ଼ତୋ ଆର କାଓସାରବାହୁ, ଗୋଲାବ କି ରାନୀ, ହହାତେ
ଉତ୍ତୁଳ ତନ ଆଡ଼ାଳ କରେ ବସେ ପଡ଼ତୋ ।

କାଓସାରବାହୁ ଅନେକଦୂରେ ଏଗିଯେ ଗେଲୋ । ଇହା ଅନେକଦୂର । ତାର
ନିଜେର ଅଞ୍ଚଳ ଆଲାଦା ଠାୟୁ ହୁଲୋ । ତାର ଅଞ୍ଚଳେ ଲୟା ଲୟା ଆୟନା ଏଲୋ ।
ଲେ ଘୁରିଯେ ଫିରିଯେ ଦେଖତୋ ନିଜେକେ । ଆର ହାସତୋ । ଆର ଆଡ଼ାଳେ
ଅଞ୍ଚକାରେର ସଙ୍ଗେ ମିଶେ କୁନ୍ଦବାସେ ଅପେକ୍ଷା କରତୋ ସାର୍କାରେର ଛୋକରା କଜନା ।
ଦେଖତୋ ଠାୟୁ ଝୁଟୋ କରେ କେମନଭାବେ ଗୋଲାବ କି ରାନୀ ଶୁଦ୍ଧ ଘାଗଡ଼ା ଆର
ବ୍ରେସିଯାର ପରେ ଯାନେଆରେର ଗଳା ଜଡ଼ିଯେ ହାସେ । କଥନୋ ବା ସାର୍କାରେର
ଛୋକରା ହାସାନ ଆଗୀର ସଙ୍ଗେ କି ରକମ ଠାଟା ଶଳ୍କରାର ନାମେ ବିଛାନାର ଓପର
ଛଟୋପାଟି କରେ । ଛଲକାତୋ କାଓସାରବାହୁର ଘୋବନ । ତାଇ ରାତରେ ଅଞ୍ଚକାରେ
ଯିଶେ ଆସତୋ ସେଇ ଲୋଭି ଶୟତାନେର ଚୋଥ । ଏକେ ଏକେ ନିଃସାଡେ ଆସତୋ
ଲୋଭି ଜୋଡ଼ା ଜୋଡ଼ା ଚୋଥ । ଅଞ୍ଚକାରେ ସେଇ ସବ ଚୋଥେ ଧିକି ଧିକି ଶୁଭ
ଆଣ୍ଟନ ଜଳତୋ । କାଓସାରବାହୁ ଦେଖେବେ ଦେଖତୋ ନା ।

ଆହା ! କି ଫାଇନ 'ସତି' ଛିଲୋ କାଓସାରବାହୁର । ପୁରୁଷ ମାନୁଷେର ଡିଯାଳ
ଦେଖେ ମେମେହୁଷ ପେଲେ । ଏକବାର ପେଲେ ତାର ତୃପ୍ତି ଆଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି
ମେଯେଟାର ଶରୀର ଯେବେ ଅଗ୍ରକମ । ଏକବାର ପେଲେବେ ଓର ଡିଯାଳ ଶାଙ୍କ ହତୋ ନା ।
ଥାମତୋ ନା । ବୁକେର ଡେତରେ ରକ୍ତର ଗୋପନ ଜୋଟାଟା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବାଡ଼ତେହି
ଥାକତୋ । ତାଇ ସାଜାହାନ ଓଡ଼ାନ ଏକ ଘଟାର ଅଞ୍ଚ ଗିଯେ ସାରାହାତ ଥେବେ ଏଲେହେ
ମେଯେଟାର କାହେ । କିନ୍ତୁ ତାର ସଙ୍ଗେ ଉରେ ରାତ ଭୋର କରେ ଦେହାର ପରାଣ ମନେ
ହୁରେହେ—ମେଯେଟାର କିଛିଇ ପାଞ୍ଚା ଧାଇନି । କି ପିଯାଳ ମେଯେଟାର ଶରୀରେ ।

ଆର ତାଇ କମେକ ଜୋଡ଼ା ପାଶବଚ୍ଛ ଜୀବ ଅଞ୍ଚକାରେର ମଧ୍ୟେ କାଓସାରବାହୁକେ
ନିଯେ ଚଲେ ଗେଲୋ । ନବାଇ ଚିକାରଟା ତନେଛିଲୋ । ନବାଇ ଛୁଟେ ଗିରେଛିଲୋ
କିନ୍ତୁ କିଛିଇ କରା ଧାର ନି ।

সেই পাশব চঙ্ক জীবের দল আসছে ।

পালাও সাজাহান ওন্তান, ক্ষালুয়া শেখ ভাগো । নহিলে আজ রাত্তি
শেয়াল কামড়ে কামড়ে ধাবে তোমাকে । পালাও এখনো দিনের আলোঃ
আছে আকাশের গায়ে ।

কেমন আছো এখন ?

বুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করছে কেউ ।

না, গোলাব কি রানৌ কাওসারবাছু নয় । কাননবালা আবার ফিরে
এসেছে ।

আবার সক্ষ্যার ধূসর আকাশ, মুছে যাওয়া দিগন্ত, আর সারা শরীরের
জালা ।

আমি মরছি কাননবালা । তুমি এবার চলে যাও ।

না, না, কিছু ভাব নেই । কাল সকালের দিকে গাড়ি নিয়ে আসবে ।
তিরিশ টাকা ভাড়া টিক হয়েছে । আখনগুর স্টেশনে পৌছে দেবে ।

সাজাহান ওন্তান চুপ করে শুনলো । একের পর এক কথা বলে যেতে
লাগলো কাননবালা । কিন্তু সে কথায় যেন ঝোর নেই । যদের ভেতর থেকে
যেনো কথাওঁজা আসছে না । বললো, এবার চলো আমরা আলাদা সার্কাস খুলি ।

তার কথার উভয় দিলো না সাজাহান ওন্তান । শুধু অক্ষকারে হাসলো ।
আকাশে তখন তারা ফুটছিলো, যে মেঘটা একটু একটু করে অমছিলো তখন
আর সেটা নেই । শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ।

রাত বাড়লো । পায়ের কাছে উটিস্টি হয়ে উয়ে পড়লো একসময়
মেঘেটি । অগ্নিদিন শুমোবার আগে অনেক কথা বলতো, আজ কিছু বললো
না । উয়ে পড়ার আগে চান্দর থেকে মুখ বার করে একবার বললো শুধু
আমার ভীষণ ঘূম পাচ্ছে । সবকাৰ হলে ভেকো ।

চোখের টাটানিটা এখন একেবাবে নেই । কাৰণ শরীরের জালাটাও
কমেছে বলে মনে হচ্ছে । কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে গলার যথে কি ব্রহ্ম বিচিক্ষা
একটা কাশি আগে উঠছে । কীত লাগছে বেশি করে ।

অদূরের শিমুল গাছ থেকে শুনুন ছানার কফণ কাজা ভেসে এলো ।
কটা পেঁচা শশান ঘরের ভাড়া দেয়ালের ফোকুর থেকে হগহগ শব্দ করে উড়ে
চলে গেলো । কটা শেয়াল ডাকলো । তারা হটো ফুট করছে নদীৰ ধারে ।
হঘতো কোন যতা লাশের অবশিষ্ট ফুঁজে পেঁয়েছে ।

আৰি তাহলে মৰলাম। মিথ্যে কথা বলছে আজ কাননবালা। এবাৰ
ও পীলাবে। তাৱই অস্তে এমনি ছলনা। বিবেকটা ওকে জালাছে।
বিবেকটা জেগে রঘেছে বলেই ও বাঁৰুৰ কৰে কিৰে আসছে। নহিলে
কবেই পালাতো। যাক, চলে যাক। আমি বোধ হয় সেৱে উঠছি। ইয়া
সেৱে উঠছি। বুক ভৱে নিঃখাস নিতে গিৰে বুকেৰ বী-দিকে একটা টানধৰা
ব্যথা অসুস্থি কৰলো। ও কিছু না—ওৱকম মাৰে মাৰে সবাৱই হয়।
বুকেৰ ব্যথাটাকে সে অস্বীকাৰ কৰতে চাইলো।

আমি মৱবো কেন! এতো মৱণেৰ ওপৰ দিয়ে খেলা দেখিয়ে এভাৱে
কৃষুৱেৰ মত মৱে পড়ে থাকবো কেন?

তাৱ চিষ্টাটা এখন বিপৰীতমূখী চলতে আৱস্ত কৰেছে। একবাৰ সে
উঠে বসতে চেষ্টা কৰলো। উঠে বসেই দেখলো কয়েক জোড়া সাৱ সাৱ
সবুজ আলোৱা বিল্লু সমূখ্যে খোলা জায়গাটাতে।

শালারা আমাকে খেতে এসেছে। হাতেৰ কাছে একটা কিছু পাওয়াৰ
অস্ত হাতড়ালো সাজাহান ওস্তাদ। না কিছু নেই। একপাটি জুতো হাতে
ঠেকলো একসময়। ঝুতোটা ছুঁড়ে মাৰলো সমূখ্যে। কয়েকজোড়া সবুজ
আলোৱা বিল্লু সৱে গেলো আশে পাশে, কিষ্ট গেলো না। কিৱকম ক্যাচ
ফ্যাচ শব্দ কৰলো কয়েকবাৰ।

এসেছিল শালারা। এতো তাড়াতাড়ি চলে এলি কেন! মেঘেটা
যাক। জওয়ানীৰ কাছে, রক্তেৰ তেজেৰ মুখে এসে দীড়াছিল কোন্
সাহসে। শোন, আমাৰ কথা শোন। এখন চলে যা! কাল আসিস।
এখন গোলমাল কৰলৈ মেঘেটি জেগে উঠে কেলেকোৱি বাধাৰে। যা ভেগে
যা।

তবু পাশবচক্ষু জীবগুলো গেলো না। হিৱ দীড়িয়ে জল জল কৰে জলতে
লাগলো।

নাঃ আমাৱই মনেৰ ভুল। আমি ভুল বকতে আৱস্ত কৰেছি তাহলে।
আমাৰ শুয়ে থাকা উচিত এখন।

সাজাহান ওস্তাদ আবাৰ শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে একসময় অসুস্থি
কৰলো বাৱাঙ্গায় তাৱ শ্ৰীৱেৱ চাৱপাশে কাৱা যেনো হৈটে বেড়াছে।

নাঃ আমাৱই মনেৰ ভুল। সে আবাৰ বিড় বিড় কৰে চললো। আৰি
কাল নাগার অনেকটা ভালো হয়ে থাৰ্বো। বসতে অসমি এ দাজায় আৱ
মৱছি না। মৱলৈ আজ জিনিস মৱে যেতাম। আমি লৈৱে উঠছি।

কালই জর্টা ছেড়ে যাবে। তারপর আমি চলে যাবো। শাশানে শাহুর বাস
করতে পারে; শালা একদম রটন্ জায়গা !

সাজাহান ওস্তাদ ঘূর্ণতে লাগলো। বোজা চোখের উপর সে লাল
যৈশানো একটা ধূসর জালায় আলো মেখতে লাগলো। আর একসময়
হঠাতে মনে হলো, তখন কতোরাত কে জানে, কাননবালা উঠে তাকে একলা
কেলে পালিয়ে যাচ্ছে ! তার দম বক্ষ হয়ে গিয়েছে যেন। কথা বলতে বক্ষ
হচ্ছে—তবু প্রাণপণে, জীবনের সমস্ত শক্তি একজীবিত করে সে টেচিষ্যে উঠলো,
কাননবালা যাস না ।

আর সেই চিংকারের উত্তর শুনলো সে পাশের শিমুল গাছ থেকে। কটা
শকুনের ছানা এক সঙ্গে চিংকার করে শিশুর মতো কেঁদে উঠলো ।

কি হলো, এরকম করছো কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে ?

অনেকগুলো উদ্বেগাকৃত শব্দ ঝুঁকে পড়া মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ।

সাজাহান ওস্তাদ, হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলো মেঘেটার হাত ।

তুই পালিয়ে যাচ্ছিলি ?

কে বললো, কোথায় ? এতো রাতে কোথায় পালাবো। সাজাহানের
কপালে হাত বেরে বললো, তোমার তো জ্বর এসে গেছে !

কে জানে জ্বর এসেছে কি না। আমি ভালো হয়ে যাবো কাল। তারপর
এখান থেকে চলে যাবো। তুই চলে যাচ্ছিলি, চলে যা ।

কাননবালা সাজাহান ওস্তাদের অস্থু মাথাটা কোলে তুলে নিলো।
সাজাহানের গাঁথেকে একটা দুর্গম্ব বেঙ্গতে আরম্ভ করেছে। তার নিঃখাসের
সঙ্গে সঙ্গে একটা সাঁই সাঁই শব্দ শুনতে পেলো সে। বুকে হয়তো ঠাণ্ডা
লেগেছে। সাজাহান ওস্তাদের পাশে শয়ে পড়লো কানবালা, তারপর দুহাতে
লোকটাকে বুকের কাছে টেনে আনলো ।

কে জানে ভোর হতে কতোক্ষণ বাকি। বারান্দার বাইরে শাশানের উপর
শীতের দীর্ঘরাত আর কুয়াশা-ঢাকা বিশাল আকাশ থেকে আরো ঠাণ্ডা বয়ে
আসছে তখন। পঞ্চচূড়া কাঞ্জনজজ্বা আবার উত্তরের দিগন্তে বলমল করে
উঠবে—যদি কাল আকাশ পরিষ্কার থাকে ॥

ଅବେଦ୍ୟ ଆହମଦ ମୌର

ବୁଟିର ସେନ ବିଡ଼ ନେଇ । ସାରାଦିନ ପଡ଼େଇ ଚଲେଛେ । ଝୁପ-ଝୁପ, ରିମ୍ ବିଷ । ଧାରବାର ନାହିଁ ନେଇ । ଏ ବୁଟି-ଧରବାର କୋନ ଲଙ୍ଘଇ ଦେଖା ଯାଏ ନା । ତିନ ଦିନ ଧରେ ଏମନି ଚଲେଛେ । ଆକାଶେର ଅବଶ୍ଵା ଦେଖେ ମନେ ହୟ ଆରୋ କତ ଦିନିହି ବୋଧ ହୟ ଏମନି ଚଲେ ଯାବେ । ନିମେର ଡାଳେ ଏକଟା କାକ ବସେ ଭିଜଛେ ଅରୋରେ । ଠୋଟଟା ଆକାଶେର, ଦିକେ ଉଚ୍ଚିୟେ ଝୁକଢ଼େ ବସେ ବସେ ଭିଜଛେ । ଜାନଲାର ପାଶେ କାଠାଳ ଗାଛେର ଆଁଧାର ବୋପେର ମଧ୍ୟେ ନାମ ନା-ଆନା ଏକଟା ପାର୍ଥି ଅନ୍ତୁତ ଏକ ଧରନେର ଏକଟା ଶବ୍ଦ କରଛେ । ଯାବେ ଏକଟୁ କରେ ଚୂପ ଥେକେ ଆବାର ଡାକେ, ପୁକ୍ ପୁକ୍ ପୁକ୍ । ବୁଟିର ମତୋହି ଏକଟିଷ୍ଟେ । ତିନ ଦିନ ଧରେ ଏହି ଏକଟି ଦୃଶ୍ୟ, ଏକଟି ହୁର ଆର ମନେର ଏକଟି ଏକଥେମେ ବିରକ୍ତିକର ଏକଟା ଉତ୍ସାହହୀନତା । କିଛୁଇ ଡାଳେ ଲାଗେ ନା । ଡାକିୟେ ଥାକତେ ଧାରାପ ଲାଗେ । ଚୋଥ ବୁଜେ ବସେ ଥାକଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଗେ ।

ଜାନଲା ଦିରେ ରାତ୍ରାର ଦିକେ ଚେଯେ ବସେ ଆଛି । ରାତ୍ରାଯ କେଉ ନେଇ । ଯାରେ-ମଧ୍ୟେ ହ'ଏକଟା ଘୋଟିର ସେନ ନିଃଶ୍ଵେତ ଚଲେ ଯାଚେ । ଆଣ୍ଟେ କରେ ଛାକ୍କଡ଼ା ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ି ଏକଟା ଠିକ ଆମାର ଜାନଲାର ସ୍ମୂର୍ଥେ ଏସେ ଥେମେ ଗେଲ । ଆମାଦେର ବାଗାନେର କାଠାଳ ଗାଛେର କଟା ବଡ଼ୋ ବଡ଼ୋ ଝାକଡ଼ା ଡାଳ ରାତ୍ରାଯ ଝୁଁକେ ପଡ଼େଛେ । ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ ପାତାର ବୋପେର ନିଚେ ଗିରେ ଥାଡାଲୋ । ବୋଧହ୍ୟ ସାରାଦିନ ଭିଜେ ବେଚାରୀ କୋଚଓୟାନେର ଶୀତ ଧରେ ଗେଛେ । କୋଚବାରେ ବସେଇ ଲୋକଟା ଭିଜେ ସପ୍ତଶଶେ ଲୁଜିର ନିଚେର ଅଂଖଟା ହ'ହାତେ ନିଂଡେ ନିତେ ଲାଗଲୋ । ଗେଞ୍ଜଟା ଖୁଲେ କାହିଁ ବେଥେଛେ । ଏବାର ସେନ ବୁଟିଟା ଆବାର ଜୋର ଏଲୋ । ଲୋକଟା ଏବାର କିମ୍ବଗତିତେ ହ'ତିନ ଧାପେ ଗାଡ଼ିର ଉପର ଥେକେ ନିଚେ ନେବେ ଏଲୋ । ଦରୋଜା ଖୁଲେ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ ବଗଲୋ । ଝୁଁକେ ପଡ଼େ ଗଦିର ନିଚେ ଥେକେ ତିନେଇ ଏକଟା ଭିବେ ବେର କରେ ତା ଥେକେ ବିଡ଼ି ନିଲୋ ଏକଟା । ତାରପର ହାତ ହଟୋର ଏକଟା ପରିତ୍ରଣ ଭଜି କରେ ବିଡ଼ିଟା ଧରିଯେ ହୃଦୀର୍ଥ ଟାନ ଦିଲୋ ।

ଘୋଡ଼ା ହ'ଟୋ ଯାର୍ଥା ନିଚୁ କରେ ବୁଟିର ସଜେ ସେନ ନୌରବେ ଝୁବେ ଚଲେଛେ । ଯାରେ ମାକେ ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରଟା ଏକେକବାର ଝାକାନି ଦିରେ ହାଶକ୍

এক টুকরো চি হিং শব্দ করে উঠছে। বিরতির কি খুশির ডাক কে জানে।
বোধহীন খুশির, কেন না সে ডাক তনে গাড়ির ডেতের ওদের ঘালিকের মুখে
এক টুকরো হাসি ঝুটে উঠে। মনে মনে বিড় বিড় করে লোকটা যেন কি
বলে। বোধহীন ঘোড়া ছটোকেই উদ্দেশ করে কিছু বলে থাকবে। হঠাত
গাড়ির আনালা দিয়ে মাথা গলিয়ে লোকটা আমাদের বাগানের দেয়ালের দিকে
মুখ করে খুখু কেলে। আশ্র্ম তো! এতো আমার চেনা মুখ। ভালো
করে ঠাহৰ করে দেখলুম। ঠিকই, ভুল হবার কি যো আছেক সেই খক্ক-
খকে আঙনের ডাঁটার মতো একটা চোথ। আরেকটা আশকলের মতো
শাদা। শাদা কানা চোখটার মণি নেই। এ চেহারা ভুল হতে পারে না।
লোকটাও বোধ হয় আমাকে চিনেছে। দরোজা খুলে নেবে আশছে।
পরক্ষণেই আমার আনালা বরাবর পাঁচিলের পাশে এসে দাঢ়ালো। কথা
বলবার অবকাশ না দিয়ে আমিই বললুম—কি খবর পেয়ার আলী মির্জা?
এতদিন কোথায় ছিলে?

অথব কয়েক মুহূর্ত পেয়ার আলী একটু ইতস্তত করছিলো। এখন ওর
নাম ধরে ডাকায় যেন পরম নিশ্চিন্ত হলো। আকর্ণ হেসে বললো—আর
বলুন ফরিদুনি ছায়েব। শালার জলাঞ্জলি হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি আছে। ওর সঙ্গে শেষ দেখা বোধ হয় বছৰ ডিনেক আগে।
পঞ্চাশের দাঙায় সর্বস্ব খুইয়ে পেয়ার আলী ঢাকায় এসে পৌছৰ। হাওড়ায়
ওকে যে দেখেছে সে আজকের পেয়ার আলীকে বোধ হয় চিনতেই পারবে না।
আমিও পারিনি তিনি বছৰ আগে। এখানে পৌছনোর পর তিনি চার বছৰ
ধরে এমনি কোন কাজ নেই যা পেয়ার আলী করেনি। স্টেশনে মোট বগয়া,
ছুটোবের কাজ, উষ্টাগরের জোগাড় দেয়া এমনি কত কাজ। কক্ষালসার
শ্রীরাটা শুকোতে শুকোতে এমন এক পর্যায়ে এসেছিল যখন নার্কি হাড় ক'ধানা
ছাড়া শুকোবার মতো বোধ হয় আর কিছুই খাকে নি। এমনি অবস্থাতেই
ওর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। আমি না চিনতে পারলেও পেয়ার
আলী আমাকে দেখেই চিনেছে। আমার হাত ছটো ধরে আবেগকল্পিত
বয়ে বলেছে—কি ফরিদুনি ছায়েব, চিনতে পারলে না? আপনাকে তো
দেখেই চিনিচি।

সত্যিই চিনতে পারিনি। হাওড়ায় পেয়ার আলীর তিনটে ছ্যাকড়া
গাড়ি ছিলো। নিজে একটা চালাতো। আর ছটো ঠিকের দিয়েছিলো।
আর্দ্ধিক দ্বিতীয় সাথে পেয়ার আলীর চেহারা আর পোশাকের ভাবন ছিলো।

একাঞ্চ সম্পর্ক। ইয়া একজোড়া পুকুর গৌক। সদাই মৃচ্ছে তা দিয়ে
উচ্ছব করে রাখতো। বার্নিশ পাঞ্জহ। চেক কাটা মাঝাজী লুকির ওপরে
আছির পাঞ্জাবী। তাৰ ওপৰ আবাৰ জৱিদাৰ লাল ডেলভেটেৰ ওৱেস্ট
কোট। পেয়াৰ আলী বড়ো শৈথিল মাহুষ। স'ব সময়েই ওৱেস্ট কোটেৰ
বুক পকেটে স্বৰ্গ সার্টিনেৰ একটা ক্ষমাল রাখাটা পেয়াৰ আলীৰ ছিলো
অভিজ্ঞাত্য। হাবভাব আৰ সমব্যবসায়ীদেৱ প্ৰতি ওৱ ব্যবহাৰও ছিলো
ৱীতিমতো অভিজ্ঞাত শ্ৰেণীৰ। থুব কম লোকেৰ সকলৈ ও হেসে কথা
বলতো। অন্য কোচওয়ানয়া এতে কুশল না হৰে বৱং থুশিই হতো।
ভাৱাৰও চাইতো বোধহস্ত, তাদেৱ সৰ্দাৱ, একটু অসাধাৰণই হওয়া
উচিত।

পেয়াৰ আলী কিন্তু আমাৰ কাছে এলে সম্পূৰ্ণ আলাদা মাহুষ হৰে যেতো।
পাড়াৰ লোক হিসেবেই যে শুধু আমাকে সমীহ কৰতো তা নহ। ওৱ
জৌবনেৱ সব কিছু সবিষ্ঠাৱে পেয়াৰ আলী যৰ্কন বলতে বসতো তখন আমাৰ
চেয়ে ধৈৰ্যলীল শ্ৰোতা বোধ হয় ও আৱ কাউকে দেখেনি। প্ৰায়ই সকলৈ
বেলা আমাৰ ছোট বাৰান্দাটাৰ এসে বসতো। তিনিৰ কোটোঁ খেকে গোল্ড
জেক সিগাৱেট বেৱ কৰে আমাৰ দিকে বাঢ়িয়ে দিতো। তাৰপৰ নিজে না
ধৰিয়ে কোটোঁ পকেটে রেখে দিয়ে নিজেৰ বিচিত্ৰ জৌবনেৱ কতো কথাই না
অনৰ্গল বলে যেতো। আমাৰ হ্ৰমুখে ওকে কোনদিন সিগাৱেট ধৰাতে
দেখিনি। কতো কথাই বলে যেতো। কিছু উন্তুম, কিছু অন্তমনক ঘনে
শোনাই হতো না। এমনি কৰে অনেক বাত হলে এক সময়ে পেয়াৰ আলী
নিঃশব্দে উঠে যেতো! যাবাৰ আগে মাথা ছলিয়ে বলে যেতো—আচা, চলি
ফৱিছুদি ছায়েব। ছপা এগিয়ে তখুনি আবাৰ কিৰে এসে পেয়াৰ আলী হাত
ছুটোৱ একটা অঙ্গুত ভঙ্গি কৰে আৱ ব্ৰিত একটু জিভ কেটে বলতো—
খেোৱ কচমু ফৱিছুদি ছায়েব, আপনাৰ সাতে ছুটো কতা বলে বড় আৱাম
পাই। হ'লস্বৰ পৱিবাৰটা বড়ো খিটখিটে, নইলে রোজ আসতুম। শালাৰ
মাগীৰ গেলে জলাজলি হয়ে গেল।

বছৱ দুয়েক আগে পেয়াৰ আলীৰ সাথে শেষবাৰেৱ মতো দেখা হয়
তখন দেখেছি পেয়াৰ আলী আবাৰ আস্তে আস্তে নিজেৰ হৱবস্থা কাটিয়ে
উঠেছে। নিঃশ্ব অবস্থায় এখানে এসে তিনি চাৰ বছৱ বছৱে আবাৰ নিজেৰ
একটা ছ্যাকড়া ঘোড়াৰ গাঢ়ি কৰেছে। হাওড়াৰ সেই জোলুশ না থাকলেও
হাওড়ানো চাকচিক্ক যেন বেশ কিছুটা কিয়ে এসেছে। দেখে বেশ ভালো

লেগেছিল। বলেছিলুম—ধাক এখানে এসে প্রথম দিকে তোমার বে অবহাস হয়েছিল এখন অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। আরো চেষ্টা করো।

আমার কথায় পেয়ার আলী সেদিন জিভ কেটে বলেছিল—খোদার কচম ফরিদুনি ছায়েব। আপনি তো সবই জানো, খোদার ইচ্ছেয় থাট্টিকে তুম করি মা। শালার রাষ্ট্রটের সময়ে এক কাপড়ে, শুধু পরিবার ছুটোর হাত ধরে এখানে এসে দাঢ়িয়েচি। তারপর তিনি চারটে বচর কি না করিচি ছুটো পয়সার লেগে। আপনাদের দোয়ায় খোদা শুক তুলে চেয়েচে। তবে কি জানো?

কথা অসমাপ্ত রেখেই পেয়ার আলী আমার আরো কাছে সরে এসে প্রান্ত কিস কিস করে বলেছে—তবে কি জানো? তোমাকে ধৰেরটা দেয়া হয়নি। তিনি সহর পরিবারটা বড়ো বেহেট। জলাঞ্জলি করে দিচ্ছে। মাগীর বাপের অবস্থা খুব ভালো। সার্টার রেশ্কো চলে। মাগীর দেমাক একটু বেশি। তবে অল্পমিও কম নয়। আপনি তো দেকেচ আমার কি বাড়বাড়স্ত অবস্থা ছালো।

সাস্কার স্বরে বলেছি—তা তো নিশ্চয়ই।

পেয়ার আলী আর্কণ হেসেছে, তারপর বলেছে—আবার সব হবে। আপনাদের মা-বাপের দোয়ায় সব টিক হয়ে যাবে। কিঞ্জিন ও মাগীর ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি না, এটুকু আপনাকে বলে রাকলুম। আপনি দেকে লিও, আমার কথার লড়চড় হবেনি। ছ্যাকড় বেচে রেশ্কো আমি কুমুদিন করবুনি। শুটা আবার ব্যবসা, শালা ছোটলোকের কারবার। মাগী ঘতো জলাঞ্জলি করুক ওর ফাঁদে পা দিচ্ছিনি বাবা। বিশেস না হয় আপনি নিজে পুচ করে দেকো, মাগীকে ক্যামন কড়া শাসনে রেকিচি।

এক মুহূর্ত ও আমার দিকে কটমট করে চেয়ে ধাকে। বোধ হয় ওক কড়া শালনের আভাস দেয়।

পেয়ার আলী যে শেষ পর্যন্ত তার জিহু বজায় রেখেছে তা এতোদিন পরেও দেখা গেলো। ওর তৃতীয় পক্ষের দ্বী যে পেয়ার আলীকে তার আভিজ্ঞাত্ব বিসর্জনে রাজি করাতে পারেনি স্পষ্ট তা বোঝা যাচ্ছে।

হাত ইশারা করে গেট দিয়ে ওকে ভেতরে আসতে বললুম। ঘরে চুকে পেয়ারী আলী যেবেতে উবু হয়ে বসলো। তারপর মুখে অক্ষুট একটা আগ্নাজ করে বললো—শালার পানি লেগিয়েচে বটে। তিনি দিন ধূরে রোজগারপাঞ্জি একক্ষে যান।

কথা শেব করে উচাস চোখে খানিক বাইরে তাকিয়ে রইলো। তারপর
বললো—অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা হলো। জাকেন কাও,
ছ'বেলা একান লিয়েই তো যাই। চোখের সামনে থাকো অথচ কতো বচু
শালার দেকা হয়নি।

হলে বল্লুম—বেশতো এবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। কি বলো?

পেয়ার আলী ওর কাচাপাকা গোক জোড়া হাতের উল্টো পিঠ লিয়ে ভালো
করে মুছে নিয়ে বললো—জাও কতা, দেখা তো হবেই। আজি আপনাকে
একবার আমার ওকানে লিয়ে যাবো। বিশেষ জুলি কতা আচে।

এক মুহূর্তে নিজেকে বিড়বিত্ত মনে হলো। এই বৃষ্টি-বাহলে আবার টানা-
হ্যাচড়া। আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন পেয়ার আলী বলে—আচা আজ না
হয় কাল পরস্ত এসে লিয়ে যাবো। ততু মাগীর তেজটা আপনাকে দেকাবো।
এই তিনি বচরেও ওর তেজ কমেনি। খালি এক কতা মুখে লেগে জ্বালে,
ছ্যাকড়া বেচে রেশকো করো। আরে যলো, ওটা কি ভদ্র নোকের
ব্যবসা। শালা বাপদামার ব্যবসা, বনেদি কারবার ছেড়ে ছোটলোকের
কারবাসে লাক গলিয়ে মরি আর কি।

কথার শেষে পেয়ার আলী খানিকক্ষণ খৌবার যতো এক দৃষ্টে আমার
দিকে চেয়ে থাকে। লাল টিকটকে ভালো চোখটাৰ পাশে ওৱা গলা শান্দা চোখটা
এক মুহূর্ত বীভৎস মনে হয়। পেয়ার আলী এবার হাসে। ছ্যাঙ্গলা পড়া
হলেন ছ'পাটি দিন। হাসতে হাসতে বলে—শালার এক লহর পরিবার হচ্ছে
এতদিনে কবে লেতিয়ে বিছুই করে দিতুম। কিন্তু যাই বলো তিনি সহজে
বড়ো চালাক মেয়েমাহুব। বয়েসটা একটু ভারী, তবে হ্যাঁ কুপ বটে। খোদাই
কচু বলাচি ফরিদুদি ছায়েব আপনি বিশেষ করবে না। যকন ভালো
কাপড়টা বেগিয়ে পিনে যাতার চুলে চুঁটি গেতে আমার আশেপাশে চুরুচুর
করে, ত্যাকন দেখতে লাগে ঠিক আপনাদের ঘরের ইঞ্জেলের মতন।
ত্যাকন শালার কাম-কাজ আৱ কিছুই ভালো লাগে না। তবে শালীৰ মনজা
তাৰী শক্ত, জলাদেৱ মতন।

পেয়ার আলী কথার ফাঁকে একটা দীর্ঘ নিখাস ছেড়ে বলতে থাকে—খোদাই
কচু ফরিদুদি ছায়েব, একেক সময়ে মনে হয় ওই শালীৰ কথাই ঠিক।
ৰোড়াৰ গাড়িতে আজকাল আৱ পয়সা নেই। সবাই আজকাল রেশকোই
চাক্ষে চায়। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কতা কি জানো? শালার ৰোড়া হুটোৱা

আয়া ছাড়তে পারিনি। তার বছর ধরে নিজের হাতে খাওয়াতি, গা মলে দিচ্ছি।

পেয়ার আলীর ঘোড়া শ্রীতিকে আরো একটু প্রশংসন দিয়ে বললুম—তোমার এই ঘোড়া ছটো সেই হাওড়ায় তোমার নিজের হাতের গাঢ়িটায় বেঁঘোড়া ছটো ছিলো ঠিক সেই রকম দেখতে।

আমার কথায় পেয়ার আলী হঠাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে ধানিকঙ্কণ হাঁগুর মতো বসে রইলো। বেশ ধানিকঙ্কণ পর মুখ তুলে আমার দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলো। ছ' চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় পানি পড়িয়ে পড়ছে। কার্যাভাঙ্গ স্বরে পেয়ার আলী বললো—মোহাই ফরিদুনি ছায়েব, উ কতা আর মুখে এনোনি। মনে পড়লে বুক ফেঁটে দেবে তাও। ঠিক, ঠিক বলেচ। এর লেগেই তো শালার মতো বাগড়া-বাঁটি। মন ঠিক করতে পারিনি।

এর মধ্যে পেয়ার আলীর সঙ্গে বোধহয় মাস কয়েক আর দেখা হয়নি। কিন্তু একটা কাজে উয়ারীর ওয়িকে গিছলুম। বিকেল। রেল লাইনের ধারে দিয়ে হৈটে চলেছি। পেছন থেকে নাম ধরে কে যেন ডাকছে। মুখ ঘূরিয়ে দেখি হাসি মুখে পেয়ার আলী দাঙিয়ে আছে। হাত তুলে লাইনের ধারে করিদ্বা বাশের একটা ঘর দেখিয়ে পেয়ার আলী বললো—ওই যে ফরিদুনি ছায়েব, চলো না একবার দেখে আসবে।

অগত্যা রাজি হতে হলো। লাইনের ধারেই বাশ আর দরমার কুড়ে ঘৰ একটা। তার পাশেই লম্বা একটা একচালার নিচে ছটো ঘোড়া বাধা রয়েছে। হাড় জিবজিবে অসহায় দৃষ্টি। একটা ঘোড়া দাঙিয়ে আছে। আর একটা উমে আছে পেছনের পা লম্বা করে। বোধহয় অস্থি। পেয়ার আলী নিজেই ব্যাখ্যা করলো—শালার ইস্টশন^{*} থেকে আসবার সময়ে কাল জ্বেলের মধ্যে পা হড়কে ঘোড়াটা জকম হয়ে গেল। বোধহয় পাটা ভেজেই গেচে। বড় ঝামেলার কাজ। ক'লিন গাঢ়ি বসে থাকে খোদাই যালুম।

কথা বলতে বলতে পেয়ার আলী আমাকে একেবারে ওৱ দৰেৱ ভেজেৱে নিয়ে গেল। ঘৰ বলতে একটি মাজ খুপৰি। একপাশে বেড়া দিয়ে আৱেকটা ছেঁট খুপৰি বানিলৈছে। ওখানেই বোধহয় রাঙা-বাঙা হয়। অস্তত কাথাটিনের বাসন আৱ কাটেৱ চুড়িৰ আওয়াজে তাই মনে হলো।। শ্যাতস্তে দেৰেৱ এক কোণে কটা হেঁড়া মাহৰ আৱ ছৌৰ্ম কাথাৱ টুকৰো। কিংবা হাতে ওঙ্গলি দহিয়ে পেয়ার আলী আঘাৱ বসবাৱ জাহগা কৱে দিলো। তাৱপৰ

হাত কচলে পরম বিনৌত কষ্টে বললো—আপনি একটু বসো, অঙ্গলি কষা আচে।

বলেই ও বেড়ার ওপারে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা টিনের মগে খানিকটা কালচে চা আর অ্যালুমিনিয়মের একটা ঢাকনিতে দুটো খিন আঘাতে বিস্তৃত এনে সামনে রাখলো। তারপর আমার মুখের কাছে মুখ এনে পেয়ার আলী বললো—আপনি তো সবই জানো, শালার এই পরিবারকে লিয়ে জলাঞ্জলি হয়ে গেল।

আবাক হলুম। আবার নতুন কিছু গোশধোগ বেধেছে নাকি। জিজাম্ব চোখে ওর দিকে তাকাতেই পেয়ার আলী নিজেই বিস্তারিত হলো—শালার ঘোড়াটা বেয়াড়া রুকম জকম হয়েছে। আমি ভাবছি কি গাড়ি ঘোড়ার কারবার তুলেই দিই। দরকার নেই ওসব বামেলায়। রেকশোর কারবার দের ভালো। আপনি কি বলো?

পেয়ার আলী ওর ভালো চোখটা আমার মুক্ষে ওপর হিঁর করে রাখলো। ভালমন্দ কোন জবাব আমার মাথায় এলে না। পরিজাণ পাবার আশায় রললুম—চলো তোমার ঘোড়াটা দেখি।

সত্ত্বেই ঘোড়াটা সাংঘাতিক জর্খর হয়েছে। উঠতে পারেনা। তবে চিকিৎসা করালে হয়তো ভালো হলেও হতে পারে। সেই কথাই বললুম ওকে। পেয়ার আলী মুখে এক হতাশার ভঙ্গি করে বললো—আর বলুনি, যা আম করি শালার ঘোড়ার পেটেই সব যায়, তার আবার চিকিৎসে। আমি বলি কি ও আপনি বিহুই করাই ভালো। খোদার কচম ফরিহুন্দি ছায়েব, কাল খেকে এক বেলা চুলোয় আশুন পড়েনি।

চালাটার পাশেই চুড়ির আওয়াজ হলো। পেয়ার আলী মুখ তুলে তাকালো একটু। এক মুহূর্ত হাসিতে উভাসিত হয়ে উঠলো ওর মুখ। অস্তরালবর্তনীর উদ্দেশে একটু জোরে বললো—লাও—না গো তোমার পীরই সিরি খেলো, শালার গাড়ি-ঘোড়ার পাট চুকিয়েই দিলুম, আর—

আরো কি বলতে গিয়ে পেয়ার আলী কি ধৈন দেখে বিস্তারিত চোখে খানিকক্ষণ স্কুল হয়ে গেল। একহাতে একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটি আর অপর হাতে খানিকটা ছেঁড়া ঝাকড়া নিয়ে পেয়ার আলীর ডিন নহর বউ জুত গতিতে আমাদের ছাড়িয়ে একেবারে জর্খর ঘোড়াটার পাদের কাছে পিয়ে বললো। বাটি থেকে চুন আর হলুম নিয়ে ঝাকড়ায় মাথাতে লাগলো। আমরা দুঃঝনেই মুগপৎ স্তুতি বসে আছি। বেশ কিপ্প হাতে ঘোড়ার

ଖୋଡା ପାଇଁ ଏକଟା ପାତି ବୈଧେ ମେଘେଟ ମାର୍ଗ ନିଚୁ କରେ ଆବାର ଆୟମଦେର ହୃଦୟ ଦିଯି ତେମନି ଜ୍ଞାତ ପାଇଁ ଚଲେ ଗେଲ । ଓ ଚଲେ ଧାଉସାର ଶକେ ସଜେଇ ପେଯାର ଆଲୀଓ ବିହ୍ୟ୍ୟ ବେଗେ ଓର ପେଛନେ ପେଛନେ ପାଶେର ଘରେ ଚଲେ ଗେଲ । ଯାକେ କରେକଟା ବୋଧହୟ ବିଶ୍ଵିତ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ।

ପେଯାର ଆଲୀ ଆବାର ଏଲୋ । ବଜ୍ରାହତ ଚେହାରା, ମୂର୍ଖ କଥା ଶରେ ନା । କିଛୁ ଡିଜେସ କରତେও ଆମାର ଭୟ ହତେ ଲାଗଲୋ । ଅଗତ୍ୟା କିଛୁ ନା ବଲେଇ ଉଠେ ବେରିଯେ ଆସତେ ଯାଇଛି, ଓ ଥପ କରେ ଆମାର ହାତ ଦୁଟୋ ଧରେ ଫେଲଲୋ, ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦୋ କାନ୍ଦୋ ହସେ ବଲଲୋ—ଶାଲୀ ବଲେ କି ଜାନୋ ? ବଲେ ଖୋଡାର ଗାଡ଼ିର କାରବାରଇ ଆୟମଦେର ଭାଲୋ, କାଜ ନେଇ ରେଖିକୋୟ ।

ହାତେର ଚେଟୋଯ ଚୋଥ ମୁହଁ ପେଯାର ଆଲୀ ଏକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତାସିତ ହସେ ଉଠିଲୋ, ବଲଲୋ—ଶାଲୀର ରେଖିକୋର କାରବାର କି ଭାଲୋ ଯାହୁଷେ କରେ । ଆର ଇୟ, ଆପନାକେ ତୋ ବଲହୁ ଗୋ, ଶାଲୀର ଜଳାଙ୍ଗଲି ହସେ ଗେଲ ।

ପେଯାର ଆଲୀ ଓର ଭାଲୋ ଚୋଥଟା ଆମାର ଦିକେ ତୁଲେ ଧରଲୋ । ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆଖିନେଇ ଶାଦୀ ଟାନେର ଜିନ୍ଦଗି ଆଲୋ ସେ ଚୋଥେ । ନିଃଶ୍ଵରେ ଆରୋ ଏକଟୁ କାହେ ଶରେ ଏସେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରେ ପେଯାର ଆଲୀ ବଲଲୋ—ଯାଇ-ବଲୋ ତିନ ଲକ୍ଷର ଏହି ପରିବାରଟାର ମନ କିନ୍ତନ ଭାବୀ ଲବୋମ । ଖୋଦାର କଚମ ବଲଚି ଫରିଛୁନ୍ତି ଛାୟେବ ।

অবিনাশের মৃত্যু

হাস্তাৎ শামুদ

সক্ষেপ বেরিয়েছিল অবিনাশ। এটা তার নিত্য অভ্যেস বলেই নয়, সর্বাগীর কাছে যাবার আবেগ ছিল। তহুপরি পারিপার্শ্বিকে বিগতমহিমা শীতের শেষ সোহাগ ছড়ানো; কফচূড়া, ও রাধাচূড়া কেবলমাত্র ঘূরিত হচ্ছে। শীত সক্ষ্যার পটভূমিকাৰ সর্বাগীর মুখ্যত্বী চিত্রকলা হয়। অবিনাশ সেই শিল্পিত আদল অনেকদিন দেখেনি।

দরোজার বাইরে পা ফেলেই মনে পড়েছিল, লিঙ্গারেট নেই। বিকেলের দিকে ধূমপান তার অপরিহার্য নয়। কিন্তু অবিনাশ সর্বাগীর কাছে যাবে। ধূমনীতে রক্ষ বেগমজ্জিত ছিল এবং চিত্তময় বিলাস পরিব্যাপ্ত। গলির মোড়েই আলৌর দোকান। সে থায়ল। দোকানী ঝুঁকপ নয়, উপরক্ষ রসবোধ আছে, বিষয়ীও বটে। আলৌর দোকানে প্রায়ই কেতা হয়।

অবিনাশ বলল : দেখি এক প্যাকেট ক্যাপস্টান।

: নেই।

'নেই' শব্দের নাস্তি এবং বিক্রেতা যথাজনের বাক্তব্যিমা তাকে উত্ত্বক করল। অবিনাশ লক্ষবার ভেবে ভেবে দেখেছে যে, তার আনন্দমূর্তি শ্রীমান দ্বিতীয় কথনোই নিটোল হতে দেন না। আজকেও তাই ঘটল।

কয়েক পা ধেতেই জনৈক ভঙ্গলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এক রুকম আলাপ আছে; কিন্তু অবিনাশ নাম জানে না। জানে না নয়, এখন ভুলে গেছে। নাম ভুলে যাওয়া তার এক বদ্যাস।

তিনি হাসলেন : এই যে কেমন আছেন ?

: 'ভালো'। অবিনাশ বলল। 'আপনি' ?

: মোটামুটি। তা, বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি ? সক্ষেপ দিকে না বেঙ্গলই ভালো।

আশ্চর্য হলো অবিনাশ : 'সে কি ? এ সময়েই তো লোক বেড়ায়।'

ভঙ্গলোক হাসলেন : 'তা অবশ্য বেড়ায়। এমনি বললাম আর কি। আচ্ছা চলি।' অবিনাশের বুঝতে বাকি রইল না কিছু। ভঙ্গলোক চলে গেলে তারপর সে ভেবেছিল, মুহূর্ত এরই নাম।

পাড়ার খেলার মাঠে যেতে হায়দার পাকড়াও করল। অবিনাশের দোষ
নেই, মাঠের পাশ দিয়েই রাস্তা ; হায়দার রেখে ফেলেছে। আরিফ, রহমান,
সকলেই রয়েছে। একহাত হয়ে যাক। দাবা। সে আর্তনাদ করে উঠল।
হায়দারকে টেলে সরিয়ে, গাছপালা ভেঙে দিয়ে, সমুদয় দিগন্তের উপরে সর্বাণীর
চির ঝোলান রইল।

তার কাছে যাওয়া হল না। ঘরে ফিরতে রাত দশটা বেজেছিল।

তারপর তিনি দিন বাড়ির বাইরে পা ফেলা সত্ত্ব হয় নি। গতকাল
অবশ্য কয়েক ঘণ্টার অন্তে বেঙ্গল যেত, কিন্তু সে বেরয়নি। ঐ কাকে পিয়ন
চিঠি ফেলে গিয়েছিল, ‘দীর্ঘদিন তোমাকে দেখি না। আমাকে মনে পড়ে
না ? শিগগিরই এসো। ভালবাসা। সর্বাণী।’

তিনিনি অবশ্য ধারাপ কাটেনি তার। সর্বশেণ সর্বাণী ছিল। তা ছাড়া,
আলস্থহেতু যে সব কাজ করা হয়ে উঠে নি, যে গোটাকয়েক পুস্তক অপর্যাপ্ত
পড়েছিল এতদিন, অবিনাশ সব সমাপন করেছিল। তহুপরি রাত্রে ছাদে
উঠে ছবি দেখেছে কিছু : কখনও কখনও কোনো কোনো দিগন্ত, অক্ষকার
আকাশ, লাল আভায় অক্ষিত খেকেছে, এবং তারকারা অবলুপ্ত। এ সময়
তার চুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, ঐ বৃক্ষিমার প্রেক্ষাপটে সালভাদোর দালির
“গৃহযুক্তের পূর্ব শুচনা” টাঙ্গিয়ে দেয়। এতস্তীতি, হলৌও মাঝে মাঝে তুমুল
হয়েছে। কেবল মান্দল ছিল না ; দ্রিমি দ্রিমি সেই আদিম ধৈবত অহুপস্থিত
যদিও, তবু অবিনাশ জ্বেছিল, বাংলাদেশ আক্রিকা হয়ে গেল। অগত্যা,
সর্বদিক সিঁয়ে—কি অধ্যয়নে, দুচ্চিন্তায়, বোধে বা স্বপ্নে—সে দিবসজ্বীকে
ব্যবহারে লাগাতে পেরেছে। পারতপক্ষে অবিনাশ এ কদিন ঘুমোয় নি।

কিন্তু গত কালকের দিনপঞ্জী কিছু-বা ভিন্ন ছিল। আলস্থ, নিদ্রা এবং
হপ্ত তাকে অধিকার করেছিল। গত রাত্রে নিদ্রার পূর্বমুহূর্তে তার অহুভবে
চুলের বশ্যা, ওষ্ঠের সপ্রাণতা হানা দিয়েছে।

। ছই ।

সকালে ঘূম ভাউতে অবিনাশ দেখল, প্রায় আটটা বাজে। অবিনাশ
ভাবল, আজকে যেতে হবে। সে যাবে এই বিশাল ও আনন্দ তার সম্মত
প্রাতঃকালীন কর্তব্যসমাপ্তি স্বাধীন করল। সে যাবে, আজ্ঞার এই আনন্দ
চিংকার শারা সকালে এবং তার সকল কর্মে চিত্তিত হল।

পুলের নিচে অবিনাশ দেখল, ঘর নেই। কেন না, অমি সর্বভূক !

জীবনে এই সর্বপ্রথম অবিনাশ শব্দটির সমাপ্তি নির্ণয় করল। এবং তা থেকে অর্থ। অতঃপর মনে মনে অঙ্ক করল, সমুদ্র? সমুদ্রের সঙ্গে মনে এল কঠোর, গর্জন, ঘূর্ণিত তরঙ্গের বেগ; এবং তারপরই অকস্মাৎ—কাসাগ্রাঙ্ক সমুদ্র ও অয়ির অর্ধ আর বাপসা রাইল না, আভিধানিক সংজ্ঞা ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠ শব্দচূড়ি তারের অবস্থাক মেহ নিয়ে তাকে দ্বিরে দাঢ়াল।

সামনে তাকিয়ে সে দেখল, খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি নিয়ে লোকটা পোড়া ঘরের মধ্যে পা রেখে দাঢ়িয়ে আছে। ঘরপোড়া গুরু; অবিনাশ আনে না এই প্রাচনিক উচ্ছৃঙ্খলি এই দৃঃখচিত্রেও কেন হঠকারী হল। কিন্তু, অবিনাশ, ঘরপোড়া গুরু ঘরে থাকে না, পালায়; এমন কি সিঁহরে মেঘও তাকে ঘর ছাঢ়া করে। যাহুষ গুরু নয়, অবিনাশ বুঝল, পোড়া ঘরের জমিনে পা-রেখে যাহুষ পৃথিবী স্থাপনে।

দৃঃঃগৃহের পাশে সিগারেট ও মনোহারীর প্লেকান এখনও অল্পান। করিম মিঞ্জ পান চিবুচে, রোজহই চিবোয় (দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রাবিজ্ঞেতা সম্পর্কে সে মোকানদারের নাম আনে); কিন্তু তার অবিস্মরণীয় টেরাকোটা মুখের রেখে কিঞ্চিৎ ধূমথমে। করিম মিঞ্জ কি পুলক্ষিত প্রতিবেশীর এই সর্বনাশে? অথবা তারও ক্ষময়ে এক খাবলা মাংস নেই? তাহুল চর্বনের সঙ্গে ক্ষময়ের কোনো ক্ষরণ যোগসাঙ্গস সম্বন্ধে আরিত কিনা কে আনে?

সিগারেট কিনল অবিনাশ। যেন কিছু হয়নি, যেন পৃথিবী তেমনি বিচ্ছান্ন, পৃথিবীর যাহুষ চিরায়ত বিশ্বাসে যেন-বা তেমনি নিজ নিজ বিশ্বে দাঢ়ানো, এমনভাবে অনাবেগ কঠে জিজেস করল।

‘কবে পুড়ল? দিনতিনেকের মধ্যে, না?’

মুখ তুলে তাকাল করিম মিঞ্জ, ‘না সাহেব। ঐ হঠগোলে গেলে তো দৃঃখ ছিল না। আজ ভোরের দিকে।’

‘সে কি?’ অবিনাশ অবাক হলো।

‘ভোরের দিকে হয়ত বিমুনি এসেছিল পুলিশের, সেই ফাঁকে।’ একটু খেমে আবার বলল, ‘তাছাড়া শহর কাল থেকে অনেকটা চুপচাপ কিনা, কেউ ভাবে নি।’

অবিনাশ বলল: দেখি, একটু ঘোরী। আছানা, পানই দাও।

সুবাগীর কাছে ধাবার জঙ্গেই কি রঞ্জিত শুষ্ঠের বহির্ব্যঙ্গনা? আসলে, আনন্দ হয়নি তার; নিজের মুখ বিশ্বাস মনে হল, আর ফিরে আনতে অবিনাশ পান কিনল। তাহুল চর্বনের সঙ্গে ক্ষময়ের কোনো যোগসাঙ্গস

আছে কি? হংপিণোর থক থক শব্দে, রক্তবাহী নালীসমূহে কাঁচা ক্ষেত্রগৰ্জন দ্বাত ছেপে চেঁচিয়ে উঠল, অ-বি-না-শ। সেই চিংকার ধিকারে ঝরিত হলোঁ: অবিনাশ। কই তুমি তো আনলে না, কেউ মৃত কিনা। তুমি কি আনতে এরা কাঁচা ছিল, অথবা এখানে সংসার, জীবন ও প্রেম ছিল। তুমি কখনো ভাল ক'বৰে রেখ নি। ছিঃ। করিম খিঞ্চি তোমার কে অবিনাশ? এক প্যাকেট সিগারেটের জগে এত? ছিঃ অবিনাশ।

পান মুখে দিয়ে পাশ ফিরিতেই দেখল, স্বধারণন বাবু। শুলের মাস্টার, পুরোনো দিনের গ্রাজুয়েট। সনাতন বীজিতে সাইকেলে হাত রেখে দাঢ়িয়ে আছেন। কাছেই বাসা। অবিনাশ দেখল, স্বধা বাবু ঘর এবং অরপোড়া ঝাহুয় দেখছেন; দর্শনীয় এই ছবি দেখিতেই তিনি এসেছেন। পোশাক তেমনি পরিচ্ছন্ন এখনো। একবার মনে হল, অবিনাশ কানে কানে বলে: ‘তার, আপনি এখনো আছেন? কি আশৰ্দ্ধ, কি অঙ্গায়! ওরা আপনার খৌজ পেলো না।’ পরমুহুর্তেই চতুর্ণ বিশালে, বিশুণ জোরে ধমক দিল তার বুকের ছুঁপাকে, তার অবিশাসকে; তার ধমনীর ধিকার ডুবে গেল। আমি মৃত্যু যানি না। নাস্তিতে আমার আশ্বা নেই। হে সভ্যতা, হে প্রেম, বিবেক, তুমি আমার পাশে থাকো।

সাইকেলে হাত রেখে পরিচ্ছন্ন স্বধারণন মাস্টারমশায় ভৱ্যগৃহের ঝালচিত্রে স্বাতি দেখছেন। অবিনাশ তার পিছন দিয়ে চলে গেল। তিনি দেখতে পেলেন না। অবিনাশ রিঙ্গায় উঠল। বলল, ভজহরি সাহা স্টুট।

দুরজা শুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি আচেনা। গলা শুনে তা পেল অবিনাশ।

: কাকে চাই?

হত্যাক হয়ে, গেল সে। সর্বাণীর বাসায় এসে অপরিচিত মুখের ধৃষ্ট উজ্জিতে অবাক হল। কী বলবে বুঝতে পারল না।

: ভূপেন বাবুর সঙ্গে দেখা করব।

: আপনার নাম?

পা থেকে যাথা পর্যন্ত সামনে দাঢ়ান লোকটিকে সে চোখ দিয়ে বিধ্বন্ত করল। তকনো গলায় জবাব ছিল: অবিনাশ।

: তাঁরা এখন এখানে নেই।

অময় দিল না অবিনাশকে। মুখের উপর দুরজা বড় হয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ,

নাহিত, বিশু অবিনাশ দিড়িয়ে রইল। তাৰপৱ রিজাৰ কিৰে এল।
ভাগিল রিজা ছেড়ে দেয় নি। হক্ক দিল ধানমণি দাবো।

কিছু ভেবে উঠতে পাৰছিল না সে। সৰ্বাণীৱা কোথায় গেল? এখন
সে কোথায় তাকে খুঁজে বেঢ়াবে। ‘কিষ্ট যেখানেই যাক, অবশ্যই মকলেৱ
জন্তে গেছে অবিনাশ’, মনকে প্ৰৱোধ দিল সে। সৰশেৰে ভাবল, আগামী
কাল পৰঙ্গৰ মধ্যে নিচয়ই সৰ্বাণী বিশদভাৱে লিখবে। এই চিঞ্চা তৃষ্ণি
এনে দিল তাকে। এই দুঃসময়ে সৰ্বাণীৰ কল্যাণ হোক, মকলেৱ কল্যাণ
হোক। মনে মনে তাই চাইল অবিনাশ। এবং মহৎ অৰ্থত সাধাৰণ এবং
আচীন প্ৰাৰ্থনা কেন আনি মুহূৰ্তৰ মধ্যে তাকে তাৰ হৃষপ্ত ও খেন
ভুলিয়ে দিল।

বলল : রিজা তোমাকে বলেছি কোথায় যাব? ধানমণি চলো।

কড়া নাড়তেই বেৱিয়ে এল বহুমত। এসেই অড়িয়ে ধৱল : ‘ধাক্ক,
এসে গেছিস? ‘শুব ভাবনা হচ্ছিল।’ উভয়ে ঘৰেৱ ভিতৰে চলে এল।

: ‘কালকে অবশ্য একবাৰ যেতে পাৰতাঙ্গ।’ কৈফিয়ত দিল বহুমত,
‘ভেবেও ছিলাম; কিষ্ট কি জন্তে যেন যাওয়া হয়ে উঠল না।’

: আৱে তাত্ত্ব কি? তুই যাস নি, আমি ছলে এলাম।

আবাৰ সময় বহুমতেৰ মা জিজেস কৱলেন : ভাল কথা, বাবা, নমিৰ
বিস্তৱে কছুৱ কি কৱলে ?

বোন পপি বলল : সেকি? নমিতাৰ এমন কি বয়েস হল? মা,
কছিল আগে এগেছিল না নমিতা?

বহুমত অবাৰ দিল : বছৰ দেড়েক।

: তা আৱ কি-ই বা বয়েস?

: মা বললেন : কি জানি। তা, অবি সেদিন ঐ বুকম কথাই তো
বলছিল।

: ‘হ্যা, তাই তো।’ অবিনাশ কথা বলল। ‘এখন খেকে খুঁজছি,
পেতে পেতে বছৰ ছই পাব হবে।’

পপি জিজেস কৱল : কেন? ছেলে পেতে আবাৰ দু’বছৰ লাগে নাবি?

: তা জ্ঞান-না, পাছি কই? সবাই তো কলকাতায়, মানে ভাৱতে
চলে গেছে। কচল, ছেলে পাওয়াই ভাৱ। তা খেকে আবাৰ খুঁজে চুঁড়ে
বেৱ কৱলতে হবে। আ, কষ্ট না? আৱ সময়সাপেক্ষও তো।

: মা বললেন : তা বাবা, ছেলে ভাল না মিললে, কলকাতাত্ত্বেই খোজ।

বাবা এ রকম কথা তুলেছিলেন, আমি যাজি হইনি।

এই সময়ে সাংসারিক আলাপের অবিকল সেই ছবি, বাবা এবং মা-ক-আক্তি ও কষ্ট সে অসুভব করল।

কেন?

অবিনাশ উত্তর দিল: কী যে বলেন? অতচুরে বিষে দিলে দেখাশোনা করবে কে? পরে খবরাখবর নেরাই মুশকিল হিয়ে থাবে, যানিয়া।

পপি চিন্তিত হল: তাহলে?

তাহলে আর কি? খুঁজতে খুঁজতে মনের মতো স্বপ্নাত্ম এখানেই মিলে থাবে। ভালো লোক তো এখনও কিছু আছে, যারা বরাবর এখানেই থাকবে। এই ঢাখ না, যেমন আমি। আমার মতো একজন খুঁজে পেলেই তো সমস্তার সমাধান হয়ে গেলো। নয় কি?

পপি বুল: তা বটে।

থাওয়ার ফাকে, কথার ফাকে, রহমত প্রেম করল, ‘বাবাকে’ খবর দিল? না হলে আবার ভাববেন।’ চুপ করে থাকল অবিনাশ। তারপর মুখ ঝুঁজল: এ তিনি দিন তো বেকতে পারিনি। কাল অবশ্য করলে পারতাম, ভুল হয়ে গেল। আগামী কাল একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব’খন।’

আবার শেষ হলে এরা বারান্দায় এসে বসল। শীতের আমেজ বাতাসে এখনও অবশিষ্ট। রাত্রে লেপ এখনও প্রয়োজনীয়। গরমের তাপ কিছ দুপুর হলেই ছোবল দিচ্ছে; ওয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লেকের জলে বাতাসের প্রাণবেগ, যুক্ত্যালিপ্টাসের সক সক আঙুল কম্পমান এবং সামনের বাতাস যানহান ও জনবিবর। দুপুরের হাওয়া আনন্দ দিল তাদের।

রহমত তির্যক দৃষ্টি হানল বকুর দিকে; অবিনাশ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গলার কাছে একটা অস্তি বিঁধে রইল রহমতের, বলল: সর্বাঙ্গীন ওখানে গিয়েছিলি?

অবিনাশ বলল: বাসা থেকে আর কোথাও গিয়ে উঠেছে। বাড়িতে লোক রেখে গেছে, দেখলাম।

তাহলে, কুশলেই আছে সবাই। তাই না?

‘তাই না’ অক্ষরস্থ এবং জিজ্ঞাসার কষ্ট অবিনাশের উত্তরের আশার মুখ তুলে দেয়ে রইল।

সে বলল: তা ছাড়ো আর কি? তবে কোন্ধানে গিয়ে উঠল জানলেন কিন্তু চিন্তামুক্ত হতে পারতাম।

‘: ‘চূপেনবাবু বলছেন কিছু?’ প্রসঙ্গতরে চলে এল রহমত।

: এমনিতে বলছেন না কিছু, তবে গতিক স্মৃতিধে বেধ হচ্ছে না।

: কেন?

: সর্বাণীই সেদিন বলছিল। কলকাতায় কে ওর অ্যাঠামশাই আছেন, বারবার সর্বাণীকে ঘেতে লিখেছে। ওর বাবাও চাপ দিচ্ছেন।

রহমত এর মধ্যে অস্মৃতিধের গতিক নির্ণয় করতে পারল না। বলল : তা এতে ভয়ের কি?

: গেলে আর আসতে দেবে নাকি ভেবেছিস?

এরপর বলায় কিছু থাকল না কোন পক্ষে। কিছু পরে সমস্তার সমাধান বের ক'রে রহমত বলল : তা, তুইও নাহয় যা। ছজনাই তো তোমা শিক্ষিত ; উপার্জনের ভাবনা খুব কি ভাবতে হবে!

অবিনাশ কি বলবে? সব কিছু ফটকের মত দেখতে পেল সে, রহমতের হাতয়ে ও বেদনা। তাই, দীর্ঘ সময় অভীত হলে কেবলমাত্র উচ্চারণ কোরল, ‘না’। বিশিষ্ট ভক্তিমার উক্ত উচ্চারণ তার অনীহা ও নির্বেষ হতাশা ও যত্নণা মূগপৎ প্রচার করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ষেন-বা মঞ্জোচারণ।

: অবিশ্বাসী হয়ে বৈচে থেকে কি হবে, রহমত?

রহমতের ইচ্ছা হল বলে, বৈচে থাকলে বিশ্বাস আবার গঢ়াবে। জীবন ধারণই প্রাথমিক। কিন্তু ইত্যাকার কোনো কিছুই সে বলল না। কুকুক্ষেত্রের সঙ্গয় যেন সে, কেবল বলল : অবি, গৌতম মারা গেছে

সময় বয়ে গেল। বস্তুত্বয়ের চোয়াল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো। বিকেলে হাওয়া দিল। ঘূমফোলা চোখে পপি চা রেখে গেল। দ'বজ্র বলে রইল তেমনি। এক সময় হাওয়ায় ভেসে কথা বলল অবিনাশ : রহমত,-দীপককে মনে আছে! আসার পথে দেখলাম, মীজান বাজার করে নিয়ে থাচ্ছে ওদের অঙ্গে। পরশু রাত্রে মৌজানের বুড়ো বাপ কোরাগ ছুঁয়ে যিথে কৃত্বা থলেছে। ফলে দীপকরা বৈচে আছে।

বেলা পড়ে এল। সক্ষে থেকে আবার কারফিউ। অবিনাশ বলল, ‘এবার তো উঠতে হয়।’ রহমত বলল, ‘থেকে যা না।’ পপি আবার ধুরল, ‘কী দুরকার বাণু যাবার? বৌরি তো আসে নি এখনও।’

কিন্তু থাকা যায় না। অবিনাশ থাকতে পারে না। বাসাতে কেউ নেই, অবশ্য বাসাতে নেইও কিছু; তুরি আর কি করবে? কিছু বইগুলু। আর পোড়ার ধলি, আমি থেকেই কি ঠেকাতে পারব? কিন্তু অবিনাশ, কার

ভয়ে, কেন, কি অঙ্গে, তুমি বাড়ির বাইরে থাকবে আজ? কখনও তো
এমন হয় নি অভীতে।

অবিনাশ বলল : ‘না, চলেই যাই! চলেই যাই, পপি।’ পরে বকুল
দিকে দৃষ্টি ফেলে, ‘আয়, আগিয়ে দে।’

উভয়ে ইটল কিছু পথ। তারপর অবি-কে রিঙ্গাম তুলে বৃহস্পতি পিছন
ফিরল। পিছন থেকে আওয়াজ ভেসে এল : কাল বাসায় ধাক্কিস, সকালেই
আসব।

॥ তিনি ॥

রিঙ্গাম উঠে অবিনাশ অগতভাষণে বলল, কাল বাযাকে সকাল বেঙ্গাম
টেলিগ্রাম করতে হবে। পপিটা বিয়ের পর দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে।
পপি টেনে নিয়ে এল নমিতাকে। নমিতাকে বিদেশ করতে পারলে অবিনাশ
হাত-পা ঝাড়া। কিন্তু আরো কতদিন খুঁজতে হবে? সর্বাণীর মত নমিতাও
তো কাউকে ভালবাসলে পারত, দুচ্ছিন্নার হাত থেকে বেহাই পেত সে।
অথচ, মহসূল শহরে ভালবাস্ত্বার স্বয়েগ স্ববিধে, অস্তত নমিতারের জন্যে,
কমে আসছে। ঢাকায় না হলে সর্বাণীই কি খুঁজে পেত তাকে? কিন্তু অবিনাশ
এ প্রার্থনা করো না। তুমি তো ভান, সর্বাণীর জন্যে তোমার জন্মের দহন।
কেমন করে তবে নমিতা, তোমার সহোদরার জন্যে তা আকাঙ্ক্ষা করো
তুমি? কে জানে অবিনাশ, সর্বাণী এর মধ্যে তার অ্যাঠামশান্তির কবলে
কি না? তুমি কি নিশ্চিত, প্রায়শিত্বের জন্যে তুমি রয়ে গেলে না?

অবিনাশ ভাবল, প্রায়শিত্ব। প্রায়শিত্ব কিসের? না, পাপের, অতঃপর
অবিনাশ পাপকে প্রত্যক্ষ করল। কার পাপ? তোমার পাপ, আমার পাপ।
প্রায়শিত্বের নিমিত্ত সে পড়ে রইল? তুমি এবং আমি।

অবিনাশ প্রার্থনা করল : ‘ঈশ্বর ক্ষমা কর। গোতম বড় ভাল ছিল।
গোতমের তো কোন শক্ত ছিল না। ঈশ্বর ক্ষমা কর।

‘ঈশ্বর ক্ষমা কর’ এই প্রজ্ঞা তার কানে শোনাল : অবিনাশ, তুমি
বীশ। যজ্ঞণা ব্যক্তিত উজ্জ্বার নেই, ঘাতকই আমাদের মৃত্তি। Woman,
behold thy son : কৃশবিক্ষ আজ্ঞার আর্তনাদ উচ্চারিত, ঈশ্বরে ছড়িয়ে
গেল; এবং সম্মিলিত শক্তি ও শিষ্যের প্রতি Behold my mother
প্রার্থনা ও দীর্ঘস্থানে একাকার হয়ে Father, forgive them, for they
know not what they do—এই অমোদ বাণী অবিনাশের বুকে বিঁধে

ରଇଲ । ଗୋତମ ବଡ଼ ଭାଲ ଛିଲ ; ଗୋତମ ଅଜ୍ଞାତଶକ୍ତି । ଅବି, ଗୋତମ ମାରା ଗେଛେ ।

ଅବିନାଶ ଏହିଥାନେ ଭାବଳ ମୃତ୍ୟୁ କ'ରକମେର ହସ ? ମୃତ୍ୟୁର କଥାଯ ଆବାକୁ ସ୍ଵର୍ଗାରଙ୍ଗନ ଭାବ ହାନା ଦିଲେନ ।

ଅବିନାଶ ତୁମି କି ବସାବର ଏଥାନେଇ ଧାକବେ ନାକି, ଏ ତୋ ଭାଲ କଥା ନାହିଁ । ଲେଖପଡ଼ାଓ ତୋ କଲକାତାତେ କରଲେ ପାରତେ । ଦେଖ ନା, ଆମାର କ୍ୟାରିଲିର ସବାଇ କଲକାତାଯ । ଓଥାନେଇ ସବ ଲେଖପଡ଼ା କରଛେ । ଏଥାନେ ଥେବେ କି ହସେ ? ତା ତୁମି ପଡ଼ାନ୍ତା ନା ହସ ଏଥାନେଇ ଶେଷ କରଲେ, ଆର କେନ ? ଆର ନା, ଚଲେ ଯାଓ ।

କେନ ଶାର ?

କେନ ? ଅବାକ କରଲେ । ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ । ଶୀତଳେ ହସେ ତୋ ତୋମାକେ । ଏଥାନେ ଯାହୁସ ଧାକେ ?

ଶାର, ତବେ ଆପଣି ଆହେନ ?

ଶୁଖଦାରଙ୍ଗନ ବଲଲେନ : ଆମି ? ଦୀଡାଓ ନା, ଆମିଓ ଯାବ । ତେମଙ୍କ ସୁବିଧା ଯତୋ ଅଫାର ପେଲେଇ ଯାବ । ତୁମି ଚଲେ ଯାଓ । ଇଂର୍ଯ୍ୟାନ, ଲେଖପଡ଼ା ଶିଥେଛେ ; ତୋମାର ଆବାର ଚିନ୍ତା କି ?

ବଂସରଥାନେକ ପୂର୍ବେର ଘଟନା । ଅବିନାଶ ମୃତ୍ୟୁ କ'ରକମେର ହସ ?

ରିଙ୍ଗା ଥେମେ ଗେଲ । ଆର ଯାବେ ନା । ଅଙ୍ଗକାର ହେଇ ଏଲ ; ଏଥାନ୍ତି ଶାଇବେନ ବାଜବେ, କାରଫିଟ । ରିଙ୍ଗାକେ ଏବ ମଧ୍ୟେ ତାର ଆନନ୍ଦାବନ ଫିରେ ସେତେ ହସେ ।

ଅବିନାଶ ନାମଲ । କରାର କିଛିଇ ନେଇ । ଝୋରେ ପା ଚାଲିଯେ ନିତେ ହସେ । କିଛିନ୍ତା ଇଟଲେଇ ଶୁଖଦାବାବୁର ବାସା । ବିପଦ ଓଁ ପେତେ ଛିଲ । ଦରଜା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଜାନାଲାଯ ଚୋଥ ରେଖେ ଶୁଖଦାରଙ୍ଗନ ରାଷ୍ଟା ଦେଖିଲେନ । ‘ଭାଙ୍ଗିଲେକ କୌ ଅପରିସୀମ ଭୀତୁ’ ଲେ ଧିକାର ଦିଲ । ବାଡ଼ିର କାହେ ସେତେଇ ଚାପା ଗଲାଯ ତିନି ଡାକଲେନ : ଅବିନାଶ । ଶୋନ, ଶୋନ ।

ଉପାୟ ନେଇ । ଅବିନାଶ, ତୋମାର ଉପାୟ ନେଇ । ତୁମି ସୀତ । ତୋମାର ଧାମତେ ହସେ, ବାଲ୍ୟକାଳେର ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟର ଅମୃତବଚନ ଅଭ୍ୟାବନ କରନ୍ତେ ହସେ । God, behold thy son !

‘ଏ ସମୟ ସାଜ୍ଜ କୋଥାଯ ? ଏକନି ତୋ ଶାଇବେନ ପଢ଼ବେ । ଏଥାନେ ଏଲ । ତେବନି ସର୍ପିଳ କଠେ ଶୁକ୍ରମହାଶୟ ତାର ଏକଟା ଛାତ୍ରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୱର ଭାଲବାସା ଆନାଲେନ ।

ঁ : এই তো এসে গেছি স্বার। পুলটা পার হলেই। হশ মিনিটের রাত্তা
চলে থাব।

দীড়াল না অবিনাশ। কয়েক পা ষেতেই সাইরেন বাজল। ধামল না
অবিনাশ। শক্র। মনে মনে বলল, traitor। স্থথাবাবুর মন বড়
নোংরা। কোনো কোনো লোকের হস্তে এত অপ্রেম থাকে কেন? পদক্ষেপ
আরো ক্রত হল। পুলিশের ভয় আছে; কারফিউ অসান্তের শাস্তি ভয়ানক।
কিন্ত, এই তো এসে গেছে। কেবল সেই পোড়ো বাড়ি, তারপর তো আয়
ঘৰেই পৌছান।

গলির মধ্যে সে কোন পুলিশ দেখলো না। অবিনাশ, সামনে কিন্ত
থাকতে পারে। কিন্ত না, আর কোন সঙ্গী সে-পথে ছিল না। অবিনাশ
ভাবল, পুলিশও সহজারী, ক্ষুধা, ত্রুটি ও নিহার শিকার। তার মমতা হল।
স্বত্তি বোধ হল তার। ত্রিপ্তি অবধি রাত্তা থালি।

করিম মিঞ্চার সিগারেটের দোকান বক্ষ হয়ে গেছে। তুমি তো আনতে;
এ সময় দোকান কি খোলা থাকে? আর, সিগারেট নেবার সমষ্টি নয় এটা।
বাহু, এই তো ভস্মীভূত গৃহের সামনে এসে গেছ। তারপর কেবল ত্রিজটা
পেকলো; তারপর আর ভাবনা কিসের?

পুলের গোড়ায় এক বাঁক অক্ষকার ধমকে আছে। অক্ষকার ভাল এবং
আলোও সুন্দর। কিন্ত আবছায়া আলো-জ্বাধারি বীভৎস—সে ভাবল।
মাথার এক মাইল উপরে, ল্যাম্পপোটে বিশ পাঞ্চারের বিজলী আলোয়
পথ চেনা যায় না।

অগ্নিভূক্ত' ঘৰশুলো প্রেতময় হয়ে আছে। টিনগুলো মুখ খোবড়ানো,
ভূমিলাঙ্ঘ, একটা দুটো খুঁটি যেন গ্রীক হাপত্যের তত্ত্বঃ ভয়াবহ নিঃসঙ্গ,
একাকী এবং অতীতময়।

কিন্ত পোড়োজমিতে অর্ধ-জ্বাধারে কে নড়ে? সকালের সেই খোঁচা
খোঁচা দাড়ি—লোকটা কি এখনও এখানে শোকাহত? মুহূর্তের জন্তে
ধমকে দীড়াল অবিনাশ। কে দোড়ে এল? একবার মনে হল, আলী।
অবিনাশ মুখ দেখতে গেল দেখতে পেল না!

অবিনাশ দেখল, সমুদ্র, তার কলোল ও গর্জিত তরঙ্গের বেগ; অবিনাশ
দেখল, সর্বজুক গগনচারী। সমুদ্রের অল লবণ্যাক্ত। এবং অর্জুন পলাতক।
পিতামহ ভৌগঃ অবিনাশ বলল, অল।

অবিনাশ, তোমার ভয় কি? তুমি যৈশু। অবিনাশ, এত বুক কিন্দের?

କୁଣିକିକେଶନ ! woman, behold thy son...ଏବଂ ରହମତ, କାଳ
-ଅକାଲେହି ଆସିବ ; ନଯିତାର ମୁଖେର ଶାମଲିମା ; ବାବାକେ ଟେଲିଗ୍ରାମ : ଭାଲ
-ଆଛି ଏବଂ ସର୍ବଧୀନୀ... ।

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କ୍ଷାତେ ତାରା ଶବାଇ ବନେ ଚଲେ ଗେଲ ॥

সুখের সঞ্চানে হাসান আজিজুল হক

ছায়াটা কী ঠাণ্ডা আমাকে ডাকছে।

কুকুম বুকের নীচে বালিশ দিয়ে কুয়োতলার দিকে চেয়ে ছিল। টিলের কঠে দুপুর তীক্ষ্ণ চিংকার করে উঠল আর তখনি বাতাবি লেবুগাছের সেই ছায়াটুর আশ্রয়ে ছাইমাথা কাকটা গা ধৃতে এলো। কুকুম তার স্বান দেখছে—গলার কাছটা ভিজিয়ে নিয়ে ডানায় আরো ধানিকটা নোংরা পানি মেখে কাকটা কি স্বর্ণে লেবুগাছে বসে পা দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে।

তখনি যদ্দুণ উঠল কুকুমের। ছিঁড়ে বেতে লাগল সে।' টুকরো টুকরো ছঅখান। যেন কে হাহাকার করে উঠল বুকের ভেতরে। যেন নতুন টাকার উপর সুখের নামাঙ্কন দেখে উল্টোতে গিয়ে দৃঢ় সোজা মুখের দিকে চেয়ে।

এই রুক্ম সব অঙ্গুত কথা। মনে হতে কুকুম নিজের অতীতকে ওলোট পালট করে দেখতে চাইল। ঠিক যেন পুরোন চিঠির বাস্তু খোজা। পুরোন কাপড় বা মৃত মাঘের গয়না স্পর্শ করার যত তঙ্গুনি স্বর্থ তার গায়ে নিখাস ফেলতে শুরু করল। ভারী অঙ্গুত তো—হংখের সমুদ্রে যেন ভেসে ধাঁচিলাম। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে আমি কোথাও তাকে পেলাম না।

কুকুম বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে দাঢ়িয়ে দুপুরকে দেখতে পেল হিয়ে হয়ে আছে। এই সময় সক্ষিপ্ত দিকের একটা আমগাছ খেকে ঘূঘূ ঝেকে উঠল। শুতি ফিরে এলে জানালার শিকে থুতনি রেখে সে আর অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। কিন্তু দুপুরটা আকাশ খেকে ঝুলেই রইল এবং এইভাবে নিজেকে দেখে, ফিরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করে ঝান্ত হয়ে বাইশ বছরের কুকুম এখন বিরক্ত হয়েছে। কারণ তার কাছে কিছুই ধরা দের না। স্বর্খ না। অথবা তারা আসে এবং ক্ষত চলে যায়। সে হাত বাঢ়িয়ে দেব তাদের দিকে। কিন্তু একটু সময়ের জন্মেও ধরে রাখতে পারে না। তখন বিজি আগতে থাকে। সেই যত্নাটা উঠে আসে। ফাঁকা ফাঁকা লাগে বুকের কাছে। এমন মাথা ধরে যে অসময়ে বিছানায় উঠে পড়তে হয় এবং এই রুক্ম হতে হতে শেষ পর্যন্ত অকানই হয়ে যেতে হয় তাকে।

উৎপাত্তী প্রথম দেখা দিলে রাজিব করসা করালে চেউ ভুলেছে। কুকুমকে
বুকে নিয়েই সে তাকে আরাম করে দিতে চেয়েছে, শেষ পর্যন্ত তোমার
হিটিংরিয়া দেখা দিল।

কৌণ কঠে কুকুম বলে, কি যে হল আমি বুঝতে পাবিলাম। এমন জো
কোনদিন ছিল না আমার। ছোটবেলায় মাথা ধরতো খুব, চশমা নিতে
হয়েছিল। তারপর যখন কলেজে পড়ি মাথা ধরাটা কিরে এসেছিল আবার।
একবার একটা শুকনো ইন্দারার অক্ষকারে ঢিল কেলেছিলাম। কোথা কোন
অতল থেকে ঢেকে একটা আওয়াজ এলো। সেই থেকে মাঝে মাঝে
মাঝে কেমন অস্তুত ঝাকা লাগে।

এঙ্গো তোমার ম্যানিয়া। বড় ম্যানিয়াক হয় যেমেরা। কিন্তু বিদ্রে
পর এ সব তো সেরে যাওয়া উচিত। এমন জোর দিয়ে রাজিব বলত
কথাঙ্গলো যে টিক সেই মৃহূর্ত থেকে কুকুম অপারাদী বোধ করল নিজেকে
রাজিবের কাছে।

যাক অত চিন্তা করার কারণ নেই। আপনিই টিক হয়ে যাবে।—এই
কথায় রাজিব সাস্তনা দিল বলেই কি পরিবর্তে উগর্জিটা নিয়মিত হয়ে এলো?
কারণ এরপর থেকেই ব্যাপারটা হিসেব মাক্রিক হতে থাকল। যেমন, অফিস
থেকে কিরে এলো রাজিব সক্ষ্যার অনেক আগে। হাতের জ্যাকেট খুলে
যেকুন বং-এর শাড়িটা বের করে কুকুমের নিটোল উজ্জল শরীরটাকে জরীপ
করল চেয়ে চেয়ে। এইসব বুরো, রাজিবের চোখের লোভটুকু খুঁজে পেয়ে
কুকুম এমন ব্যবহার করল যেন আজ দুপুর থেকে তার মাথা ধরেনি—বেব
সে উঁঠাসে ফেঁটে পড়ছে। কিন্তু নতুন শাড়িটা পরে রাজরাজেশ্বরীর মঞ্চে
সেজে অপেক্ষা করতে করতে এমন অসম্ভব যত্নণা হতে শুরু করে যে, তাকে
আন হারিয়ে ফেলতে হব এবং তখন তার দেহটিকে নিয়ন্ত্রিত স্থলরী হিসেবে
গ্রহণ করার কোন উপায়ই থাকে না রাজিবের পক্ষে। ছেলেটাকে অতএব
ভব্যতা, ভজ্ঞতা, শিক্ষা ইত্যাদি বিস্তৃত হয়ে একেবারে বর্বর পশুমালত আচরণ
করতে হয়। অফিস শেষ হলেই সোজা বাসায় চলে আসা যাব অভ্যেস—
অফিসে কাজের লোকের ভিড়ের মধ্যে কুকুমের শরীরের ছায়ায় হঠাৎ বিরুত
অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যে এবং তক্কনি সব কেলে বাসায় কিরে তাকে অভিযো
আহর করে এলোমেলো করে দিতে আবুল হস—সেই মাঝবটা এখন রাত
ঝগাঝোটার আগে কিন্তু না কিছুতেই। এইভাবেই বোল মিহিরে আসছে
বিকেল নেমে আসছে ছান্দের শুগুর এবং কুকুমের ঘরে সে এবং নির্জনজ্ঞ

পাশাপাশি বাস করছে। অথচ এই নিম্নবিলিটা ছজনের মধ্যে ভাগভাগি করে নেবার কথা ছিল।

সহরের মধ্যে বাসা নিনাম না এ জঙ্গেই বুবলে—ঝাঙ্গির হেসেছিল, প্তোমাকে আমার কুরার অবধি স্থযোগ পেতাম না তাহলে।

এরপর চমৎকার খাট, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বই এর ব্যাক ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু কুকুমের প্রায় ছপ ছিল বলা চলে সেইসব এসে দুর সাজিয়ে বাইশ আর সাতাশ বছরের ছাঁটি ঘোবন মূলধন করে স্থখে জীবন কাটানোর আয়োজন হল।

কিন্তু এসব আয়োজনের প্রত্যেকটির মধ্যে—যেমন বাস্ক-পেটরাস জম প্রত্যেক দিনের ধূলো, চালের টিন, বিষ্ণুটের কোটো এই সবের মধ্যে সামা জীবন কাটানোর ঝাঙ্গির বৌজ প্রবেশ করল। পোকার মতো হুরে হুরে গঁষ্ঠ করে চলল অলক্ষ্যে।

তোমার কি রকম অস্ত্রবিধি হচ্ছে? কি ধরনের অস্ত্র ভুগছো তুমি বলবে তো আমাকে—হৃল ঝাঙ্গির বলে। উভয়ে কুকুম ইুদ্ধার সেই অক্ষকারের কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না। তাও বলে ভাসা ভাসা ভাবে। অতএব ঝাঙ্গির এখন রাত এগারোটাৰ আগে ফেরে না।

জানালার কাছে দাঙ্গিয়ে এইসব ভাবল কুকুম। বোধ এখন কাত হয়ে ভাব কপালে এসে পড়েছে। বাঁজে ভাবনা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। নাহলে আমি পাগল হয়ে যাব—কুকুম অফুটে কখাঞ্জো। উচ্চারণ করল এবং শাড়ি সামা ঝাউজ সাবান ইত্যাদি নিয়ে কুয়োতুলার দিকে চলে গেল। যে দিকটা তখন একেবারে চুপ করে গেছে। লেবুগাছের নীচে দাঢ়াল কুকুম। যে দিকে ঘন ভালটা আছে সেখানে কালো ছায়া—বাকি যে হিকটায় গাছটা খাতলা হয়ে একেছে প্রোচের চুলের মতো সেদিকে ঝোলে ছায়াৰ মাথামাথি একটা অস্ত্রিভূতা সিপ সিপ কাপছে। কুকুম বেড়ার গায়ে শাড়ি ইত্যাদি বেধে কুয়োটাৰ উকি দিল। কালোঠাণ্ডি পানিৰ দিকে চেৱে গা শিৰ শিৰ করে উঠল ভাব এবং সমস্ত শৰীৰ মেম তৃষ্ণাঞ্চ হয়ে উঠল। ভাবপর ছোট শৰজাটা বক করে হিতেই আচর্যভাবে একা বোধ কৰল সে। অথচ ঠিক এই অস্ত্রেই যখন সে ঝাউজ ও ভিত্তুৰে জামা খুলে সম্পূর্ণ অস্তমনৰ হয়ে যাব, ঠিক ত্যুনি তার চারপাশে শব্দের অগৎ মুখৰ হয়ে ওঠে। তখন নিঃসন্দেহ কাকটা চিংকার করে, কি যুঘু ভেকে ওঠে অথবা শুকনো পাতা খলে পড়ে বা বাতাস ইস্ত্যাদিৰ শব্দ ওঠে। তবু এই সমস্তের মধ্যে খেকে বড় নির্জন প্রশান্ত বোধ

করতে থাকে মেঝেটি। এবং বহিশ সে বুবতে পারে সমস্ত প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ তার নয় দেহ দেখছে সে লজ্জা অসুস্থি করে না। এখন কুকুম অসংখ্য পা-অলা-কৌটিটিকে হাতের তালুতে এনে রাখছে এবং পানি দিয়ে তার সামনে একটা প্রাথম স্থষ্টি করছে। সামনের পা দিয়ে যে ফড়িটি মাথা দ্বারে সেটাকে সে লক্ষ্য করছে একমনে এবং তুল করে যে গুরুপতিটি উড়ে এসে হঠাতে তার চুলে এসে বসল সেটা যাতে উড়ে না যাও সে অঙ্গে পাথরের মূর্তির মত হিল হয়ে আছে। বলা যায় মুক অগতের কাছে নিজেকে ঘেলে ধরে কুকুম। নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে স্থথ পায়। স্থথের কথা ভাবতে পারে।

আন সেরে স্থথ গায়ে মেথে ঘরে এসে অবাক হয়ে থায় কুকুম। এই অসময়ে রাজিব এসে চোধের উপর হাত ঢাপা দিয়ে বিছানায় শয়ে আছে। তার ফুসা কপাল চোধে পড়ল কুকুমের আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে টিকোল নাকটা। জামা কাঁপড় ছাড়েনি রাজিব—জুতো পর্যন্ত না। ওকে এইভাবে দেখে হঠাতে বিয়ের কথা মনে পড়ল কুকুমের। প্রথম ওকে দেখে সে জেবেছিল রাজপুত্রের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল তার শেষ পর্যন্ত, যা নাকি একমাত্র বইএ পড়া যায়! জীবনের জন্য এই সুন্দর মাঝুষটাকে নিজের হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে মন চায়নি তার।

তোমার শরীর থারাপ নাকি? এমন অসমরে চলে এলো যে অফিস থেকে? উভয়ে রাজিব শুধু একবার চাইল তার দিকে। বোধহস্ত হ্যাস আগে এমন হলে আনন্দে ফেটে বেক্ত কুকুমের চেহারা। আর কোন প্রশ্নের তোমাকা না করেই রাজিব বলল, অফিসে পোষাল না আজ। চলে এলাম। সোজা কথা তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সেসব কিছু না বলে সে এখন চুপ করে আছে। অর্ধাং সত্যি করেই তার মাথা যত্নগাম ছিঁড়ে পড়ছে।

কুকুম স্থথের আবেশ কাটিয়ে উঠল, মাথা ধরেছে না?

ইঃ।

তা এই রোদের মধ্যে আসতে গেলে কেন? দুঃখী চোধে চেহে কুকুম বলল।

রাজিবের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো। তুমি এখনও থাওনি।

এইভো থেতে থাছি।

এতক্ষণ টুক করছিলে? আমি থেঁ পেছি দশটায়। এখন এই বেলা শাড়ে তিস্তে পর্যন্ত বসে আছো? রাজিব এমন করে কথা বলে থেন জান

মাথা ধৰা সেৱে গেছে এবং কুকুমকে ডৎসনা কৰাৰ অঙ্গেই এই অসমৰে
অফিস থেকে এলেছে। কুকুম কথা খুঁজে পাৰ না। যেন এতক্ষণ না দেয়ে
এইভাৱে শয়ে থেকে অন্তমনৰ হয়ে সে যে রাজিবেৰ উপৰ বিভূতি এটাই অমৃৎ
কৰেছে।

আমি কুকুম মেয়েটিকে বুঝতে পাৱলাম না—ৱাজিবকে শোবাৰ ঘৰে রেখে
ৱাঙ্গা ঘৰে আসতে কুকুম ভাবতে শুক কৰলু এবং ঠাণা ভাত তৱকাৰি
গলা দিয়ে নামাতে নামাতে ওৱ ভাবনা গড়িয়ে চলল, যখন ছোট ছিলাম, ক্ৰক
পৰতাম, প্ৰজাপতিৰ পিছনে ছুটতাম, চিংকাৰ কৰে কৰিতা আওড়াতাম,
তখন সুখ কাকে বলে ‘আনতাম না; যদিও তখন সুখে ছিলাম; আহা কি
গভীৰ স্বথে—কি ঘন উত্পন্ন স্বথেৰ সময়ে ডুবে ছিলাম আমি।

কুকুম জানলা দিয়ে দেখল বুনো আতাগাছটায় এইটুকু একটা পাখি
লাফাছে।

যখন কেউ স্বথে থাকে সে থবৰ সে জানে না, কাৱণ সুখ এমন একটা
জিনিস যাৰ সহচে তুমি সচেতন থাকলে সে উবে যায়। এবং সময়—মানে
বৰ্তমান আৱ কি—গৃহ্যেকষ্টি জিনিসেৰ মধ্যে চুকে পড়ে; দীত বসায় ফেড়ে
কেলো। অথচ অতীত তা নয়, অতীত বা স্বতি স্বথেৰ আন্তৰ বিছিয়ে দেৱ সব
কিছুৰ ওপৰ। চিঞ্চাটা এলোমেলো হঁজে যাচ্ছিল বলে কুকুম আৱও উছিয়ে
ভাবাৰ চেষ্টা কৰছিল। যখন বড় হবাৰ স্বপ্ন দেখতে শিখলামঃ কলেজে
পড়াৰ সময়। এবং আশৰ্য যে স্বপ্ন দেখছি সব সত্যি হয়েছে। ৱাজিবকে
পেয়েছি, সচলতা পেয়েছি, শোবাৰ ঘৰে যা যা ভেবে রেখেছিলাম সব
আছে—শুধু আংশ্যাৰীটা টিকেৰ নয় কাঠালেৰ আৱ আলনাটা ভাৱি সত্তা
দামেৰ। তবু বলা চলে যোটামুটি স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন দেখাৰ
সময় যে স্বথ ছিল, কাজে খেটে গেলেও সেই স্বপ্ন আমাকে স্বথ দিতে
পাৱছে না।

কুকুম যখন ঘৰ থেকে বেৱিয়ে এলো তখন ব্ৰোদেৱ তেজ নেই। উঠোনে
দাঢ়িয়ে কুকুম আকাশ দেখছিল। আকাশেৰ বং প্ৰায় শান্ত এবং পাখিৰা
চলাচল কৰছিল। এখন সুন্দৱ বিকেল নেমে আসছে—ভাবল কুকুম, যদি স্বথ
কিছু থাকে; আমি যখন এইভাৱে আকাশেৰ দিকে চেয়ে পৰাকি, আতাগাছে
কাঠবিড়ালী হৃটোকে দেখি এবং—এবং আমি নয় হলো সমস্ত আকাশ এবং
প্ৰকৃতি যখন আমাৰ দিকে চেয়ে থাকে আৱ পৃথিবীৰ বুক থেকে, কনুকুন ভেসে
আলে—তখন আমাৰ খুব ভাল লাগে। আমাৰ মনে হয় আমনি কৰে ভাল

লাগাই স্থখ আৰু এমনি কৰে চিৱকাল—চিৱকাল স্থখে ধোকতে পাৰি আমি।
এইসব ভেবে দুঃখের গহনৰে পা দেয়াৰ জন্য সিঁড়ি বেংৰে বারান্দায় উঠে কুকুম
দেখল দেয়ালে বিকট আকাৰেৰ টিকটিকিটা নিষ্পত্তি চোখে চেয়ে আছে একটা
পোকাৰ দিকে। কুকুম দাঢ়িয়ে পড়ল এবং তাৰ বুকেৰ মধ্যে এমন ধূঁধা
উঠল যে শুভেৰ মত ধাম জমল তাৰ কগালে ঠোঁটে চিবুকে। টিকটিকিটা
নিঃশব্দে এমিয়ে গেল একটু—শ্বেতেৰ মত একটা। কদৰ্য হিলোল তাৰ ঘাড়
থেকে পিঠ, পিঠ থেকে হ'তিনটে বাক নিয়ে লেজেৰ দিকে নেমে এলো।
পোকটাৰ একেবাৰে কাছে এসে হিৱ দাঢ়িয়ে আছে টিকটিকিটা—পেতল
ৱজেৰ ঠাণ্ডা চোখ পেলকহীন ! কুকুম ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্ৰকৃতি বাজুদেৱ মত
অপেক্ষা নিয়ে থেমে আছে। তখন সে কিছুতেই ঝুক কৰতে পাৰল না এবং
টিকটিকিটা লাফ দেবাৰ সঙ্গে সঙ্গে অক্ষুট চিংকাৰ কৰি ঘৰে চুকে পড়ল।

সেখানে রাজিব বিছানাৰ উপৰ উঠে বলে আছে। চেয়ে আছে। কুকুম
চেয়াৰেৰ পিঠে হাত দিয়ে দাঢ়িয়ে, তাৰপৰ মহশ টেবিলে হাত বেংখে, বই-এৰ
ৰ্যাক ছুঁঁয়ে—তাৰ চিৱকালেৰ স্বপ্নেৰ প্ৰত্যেকটি জিনিসেৰ কাছে আঞ্চল চেয়ে
চেয়ে সমন্ব দৱটা পৰিভ্ৰমণ কৰছে। আৱ, এইসব বৰ্ষমানেৰ মস্তাঘাতে আহত
ক্ষতবিক্ষত আসবাৰবণ্ণো; কৈচে ধাকাৰ ক্লান্তিতে আছুৰ বস্ত পিণ্ডেৰ মধ্যে
বখন তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধৰে, রাজিব বিভাস্ত ক্ষেত্ৰ চোখে তাৰ দিকে চেয়ে
আছে—তখন আগন অস্তিত্বেৰ অতল থেকে উঠে-আসা দুঃখেৰ অক্কাৰে
মেঘেটি ডুবে যাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাৰে না।

গোলাপের নির্বাসন জ্যোতিশ্রকাণ্ড দণ্ড

আঞ্চার আঞ্চীয় গোলাপ আমার সহোদরা ।

আমাদের পিতা ছিলো না, মাতা ছিলো না, কেবল সতেজ রৌদ্রকরে
এবং পবনের দাক্ষিণ্যে আমরা স্মসলিলা পৃথিবীতে আঁশেশব স্পন্দিত
হয়েছিলাম ।

পুরস্পরের বাইরে শামরা কাউকে জানতাম না তখন । কল্প, গোলাপকে
আমি দেবীর মতো হস্যে স্থাপন করেছিলাম তার মধ্যে আপনার ছায়া দেখতো
বলে এবং সহস্রে, সঙ্গেগনে লাগন করেছিলাম সে আমার আনন্দ হবে বলে ।

গোলাপ কোনোদিন পিতৃজ্ঞেহ বা জননী-সাঙ্ঘিধ্যের অভাব অঙ্গভব করতে
পারে নি । বরং বলা যাক, একাখারে আমাতেই সে মাতা এবং পিতাকে
প্রত্যক্ষ করেছিলো । আমি তাকে স্মিষ্ট প্রদীপশিখার মতো প্রজলনের ক্ষমতা
দিয়ে অন্যায়ী বায়ুর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ রেখেছিলাম, যেনো সে সহসা কৃতকার্য
না হয় ।

অক্ষকান উচ্চানে সমুজ্জল পুষ্প আমার গোলাপ ।

জানালার থড়থড়ি ভুলে আমি গোলাপকে দেখলাম । দিনের আলোয়
ছায়াচ্ছায় পথে তার দেহ সে কি মোহন দৃঞ্গের অবতারণা করে । তার স্থৰ্থ
দেহ, সুগঠিত ঘোবন, অপূর্ব মুখ্যত্ব, বংকিম চাহনি প্রতি পদক্ষেপে পথচারীকে
সুস্থিত ও উপাসক করে দিয়ে যায় ।

কিছুক্ষণ আগে সে আমার পাশে ছিলো । তার দেহের স্বৰ্বাস এখনও
এই কক্ষের পরিসরকে ছাড়িয়ে যায় নি । দুরজার বাইরে পা দেওয়ার সুহৃত্তে
সে পরম যমতায় আমার ললাট স্পর্শ করলে আমি তার মন্তকে ওষ্ঠ রাখি ।
আলো, ছায়া, পথ, মাঝবের নকশা সমস্ত কিছুর উপরে আমরা তখন শৈশব-
নিহিত সুতির জন্ম । সুহৃত্তে সেই নদী দেখা দেয় যে প্রয়ত্ন নয়, নবদূর্বাসল
যাব প্রাণ স্বরে ধারণ করেছে । আমার চপল হরিণশিখ, আবেগে ঝীড়ামস্ত ।
দূরে, ভাসমান একাকী ঝুঁটুপানার ঝোপ, করেকষ্ট জলপোকা কেবল নদীর
ঘোলাজলের সৌন্দর্য বাঢ়ায় । সুতি ক্রমে আসে, ক্রমে যাব ।

তৃক্ষণভাব সবুজ আমাদের মনোহরণ করলে, কোনো নিষ্ঠক বিপ্রহরে আমরা বনবাসী হতাম। সেখানে কালাচূড়ায়ী কোকিল বা বট-কধা-কও পাথির ঘরের প্রতিধনি অথবা ঝোপের মাঝে হঠাত পরিষ্কার কিছুটা ঝাকা জায়গা পরম রসভোগের কারণ হয়। কোনো বিগত-মধ্যাহ্নকালে ঘরের পিছনের ঝাওড়া ঝোপে, লাউডগা সাপের স্বচ্ছ গতিভঙ্গি আস্তাকুড়ে অক্ষয় গো-সাপের আবর্তাৰ অবশ্যই রহস্যের অবতারণা কৰতো। এবং কোনো আসন্ন সক্ষ্যাত নোড়োৱের মতো শিকড়ওলা ডুমুরগাছ হঠাত আশ্বয়ের মতো বোধ হয়।

এই সমষ্টই আমাদের সঙ্গে নির্বোধ কুমীর, মৰ্কট, ধূত শৃঙ্গাল প্রভৃতিৰ পরিচয়ের পথ উন্মুক্ত কৰে দেয় এবং পরিশেষে স্বৰ্বচনীৰ ইাস, টুলটুনি, অক্ষয়-বৰুণ এদেৱ সঙ্গে যোগ দিলে আমরা চট্টগ্রাম-মেদিনীপুৰ-বাঁশেৱ কেজো স্বরণ কৰে উদ্বীপ্ত হৰে উঠি।

সেই মোহন শৈশব-কৈশোৱে আমাদেৱ কোনো নাম ছিলো না। আমি এবং গোলাপ তখন পৰম্পৰারে যথেষ্ট নিহিত ছিলাম। বৰ্ণাঙ্গ দিগন্তপ্লাবী সম্মে ডিজিনোকাৰ আৱোহী আছিৱ। এখন, কালকৰ্মে পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকাৰ কৰেও কেউ কাউকে পৰিত্যাগ কৰতে পাৰি না। ত্যাগেৱ চিষ্টা বাতুগত প্রতিভাত হলে বক্ষ আনন্দেৱ খাসে পৰিপূৰ্ণ হয়ে উঠে।

গোলাপেৱ কোনো বাসনাই আমি অপূৰ্ব ধাকতে দিতাম না। প্রাক-যৌবনে মিছিলে চিৎকাৰ কৰে স্বৰ ভেড়ে গেলেও ঝোগানেৱ স্বৰে আমাৰ সৰ্বাঙ্গ কশ্পিত হতো। অস্তিকাৰ রাত্ৰিতে প্রাচীৰপত্ৰ লাগাতে গিয়ে প্ৰহৱীকৃ হৃষিকে আমায় বিচলিত কৰতো না, কেননা, আমি জানতাম, গোলাপ এৱ সবই পছন্দ কৰে। সমস্ত শহুৰ ঘূৰে থবয়েৱ কাগজ ঘৰে ঘৰে পৌছে দেওয়াৱ কালে মলিন জামাৰ আস্তিনে ললাটেৱ ষেৱকণা মুছতে আঁশি বিশুম্বাৰ দৃঃখ্যিত হতাম না। কেননা, আমি জানতাম, গোলাপ আছে।

কেবল কথনো প্ৰচণ্ড বৰ্ণ আমায় কিছু সময়েৱ জন্মে কোনো গৃহবাসীৰ বুাৰাদায় বিঞ্চাম নিতে বাধ্য কৰলে এবং সে জুড়ুটি কৰলে, ক্ষণিকেৱ জন্মে গোলাপকে ভুলে ধেতাম এবং হায়ৱে জীৱন হায়ৱে পৃথিবী—এই সব কথা আশপাশে স্বণিত হতো।

অবশ্যে আমি সমস্ত পথ পার হয়ে এলাম। কোথাও ধেমে ধাই নি; হতোগুম্ফ হয়েও ক্ষান্ত হই নি; ভেবেছি অয়মাল্য-অবশ্যই আমাৰ জন্মে অপেক্ষা কৰে আছে। ভাবতাম, তাকে আমি সুখী কৱৰোই।

লেই অঙ্গেই আমার ভবিষ্যৎ প্রায় নির্ধারিতই ছিলো। শরকারী স্কুলসা, ফুলপদের ব্যবসায়ী, হসয়হীন চিকিৎসক, অঙ্গাদী কারিগর কোন ক্লিপেই আমাকে শানায় না। আর তাই বিশ্বিভাসম থেকে সচাগত আইনজীবী আমি গোলাপকে সম্মুখে রেখে অগ্রসরমান।

দেখাম ফুলপদের শোভা। হালকা গোলাপী রং কেমন করে ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয় এ লক্ষণোগ্য। রজনীগঞ্জার আনন্দ বর্ধাও কিন্তু প্রিয়তম যেহেতু সচাগত নন অতএব পার্থবর্তীও হওয়া চলে বৈকি এবং ওথানে ওই শিউলি। কেবল গোলাপের কার্পণ্য।

আমি ফুলবাগানে ঘূরে বেড়াতে থাকলেও তাকে সর্বাই দেখতে পাই। আহার, নিষ্ঠা, অর্ধেপার্জন সব ধরানিয়মে চলে এবং চলে আমার ফুলবাগানে পসরা সাজানো।

আমার হাতে কিছু যন্ত্রপাতি। কিছু মাটি তাতে লীন হয়ে আছে— কিছু আমার বসনেও আছে। ষে-ক'জন ফুলবালাৰ পরিচর্যা করেছিলাম তারা আমার দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি, কেউ-ই অকৃতজ্ঞ নয়।

আমার ছায়া ক্ষুত্রতৰ ইতে থাকলে গোলাপ ঘৰ থেকে বেরিয়ে আসে। তার শাসনের অভিজি পরম বৃষ্টীয় বোধ হলে ঘৃণপৎ আমার মনে বেদনৰ অক্ষয় হয়।

আমি তাকে চিহ্ন-কাহিনীৰ পিতার মতো করে বলাম, গোলাপ, তুই জঙ্গ গেলে আমায় কে দেখবে।

সে তো নায়িকা নয়, অতএব, মনি, তুমি পাগল হয়ো না, আমি আছি, এই কথা বলে না। সে বলে, আমি গেলে তোমার আর কেউ থাকবে না। তাৰ অঙ্গে এখন থেকে ভেবে লাভ কি? বৱং তুমি উঠে এসে তৈরী হয়ে নাও।

আমি লক্ষ কৰলাম, কথাগুলি উচ্চারণকালে তাৰ সমগ্র অবস্থা ত্রুট হয়ে অছে ফুলকুলু তাজীৰ মতো বহতা হতে চাহ।

শ্রদ্ধাঙ্গী গানের মতো তাৰ ব্যবহাৰ আমায় আলো বিশ্বিত কৰে না। আমি কৈবল তাৰ সম্মুখে দ্বৱলিপিৰ পাতা উল্টে সমুক্তি রাগিণীকে প্রকৃট কৰে ফুলতে সাহায্য কৰি।

বাগান থেকে উঠে এলে ঘৰে চুকলাম। সেখানে ক'জন লোক বসেছিলো, তাৰা আমায় ভব-বৈতৰণীতে গৃতীৰ ওই। সিনিয়ৰ তোধুৰী এঁদেহ

পাঠিয়েছেন, কেনো আবালতে বেজনোর আগে নথিগুলো আর একবার দেখে নি।

চৌধুরী হিঁর করেছেন, আমাকে সাকলের কৈর্বে পৌছে দেবেনই। এবং বোগ্য সহকারী এই ধ্যাতিতে আমি শীর্ষনিরে প্রার পৌছেই গেছি, এখন কেবল আরোহণ বাকি। এই অবসরে ফেলে আসা পথ ইত্যাদি জরিপ করে কেলবার চেষ্টা করি।

অধিলবাবুর কথা স্মরণে আনা যাব। মলিন বস্তি, জীর্ণ ছাতা ও উকিলের পোশাক এবং তাঁর সারা মুখে ঘামের গ্রসাধন আমতলায় আনন্দ সঞ্চার করতো, আর নবীনদের জন্তে ভীতি ও সংশয়। অথচ আমরা জানতাম দশ হাজার টাকার বিনিয়ন্দেও তিনি দন্ত এ স্টেটের পিতৃব্যপক্ষকে সংজ্ঞায়িত করতে রাজি হন নি ; নাবালক উত্তরাধিকারীর স্বার্থান্বিত ভয়ে।

যাই হোক, এ-সমস্তই আমার জন্তে খুব সাধারণ কথা। আমি হিঁর করে নিয়েছিলাম বে, অধিলবাবু না হয়েও অধিলবাবুই থাকবো। গোলাপকে আমি বাঁচাবোই, তাকে কখনো উকিয়ে যেতে দেবো না !

রাত্তাম বেরিয়ে এসেছিলাম। গোলাপ আবার বাইরে দীড়ালো, সে আমার ধাওয়া দেখতে ঢাব। দূরে একদল দেখে বুবলাম, গোলাপও এখনি বেরিয়ে থাবে। ওর সহপাঠিনীদের সকলকে আমি চিনি না। তবুও কাউকে কাউকে চেনার চেষ্টা করতে হয়। সবাই গোলাপের সতীর্থ, আমার আমরের।

থানিক দূর হইটে এলাম। আগের রাতের সেই বে মাতালের বল—লক্ষ কোটি কোটি মাতালের দল উড়িখানায় জাহাগা না পেয়ে পথের নীচু জাহাগা-জলোতে পড়ে আছে। সামান্য স্পন্দেই তাদের বেসামাল অবস্থ। কেনো ভারী ধানের চাকা তাদের অক্ষশায়ী হলে তারা এমন ছোটাছুটি করে বে, পথ চলা তার। তাই আমার সাবধানে এক্ষতে হয়।

মোড়ে এলে দেখলাম তারা সবাই দলে দলে দাঙিয়ে আছে। আবার কৈশোরের প্রতিমূর্তি সব। তেমনি কখু চুল হাওয়ার ওড়ে—ওমনিবাস সাহিত্যক-রচিত উপস্থাসের নায়কের মতো। তাদের অবস্থাপোবিত বেশ, বেপরোয়া প্রতিভাব সব আমাকে কিরিয়ে নিয়ে থাব। কিন্তু আমার শান্তনা বে, গোলাপ আছে, সে এদেরই একজন।

ওরা কুহে সংস্থবন্ধ হতে থাকে। অধিক লোকের সমাবেশ ঘটলেই বুঝি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়—জনসমুদ্র। সে সবখানেই—এখানেও জন-

সমুদ্র আৰ বিমানবস্তৱে কোনো গৱিনসীল নেতাৱ অভ্যর্থনাকালে অৰ্থবশ
দৱিদ্র সমাবেশও জন-সমূহে ।

আমি প্ৰতিদিনই কিছুক্ষণ দাঢ়াই এধানে । সিনিয়োৰ চৌধুৰী একটু
ষোৱাপথে হলেও আমাৰ তুলে নিয়ে যান এবং আমি শীৰ্ষে আৱোহণেৰ
আশাৰ মোটে বাক্যব্যৱ কৱি না । যদিও এইসব সময়ে হীনমন্ত্রণা শীড়িত
কৱলে গোলাপেৰ কথা স্মৃত হয় ।

চৌধুৰী ওদেৱ সমাবেশ মেথে পথে আমাৰ কিছু কথা বলেন, যেমন
অমৃত দেশে ছাত্-আন্দোলনেৰ অনিবার্যতা, গ্ৰাজনীতিতে তাদেৱ স্থান এবং
সমগ্ৰ অবস্থাৰ ফলঞ্চতি । তিনি জনসমাজে এই উজ্জ্বল পৰম বিবেচক
দৱাবী দুলালদেৱ দৃঢ়ত্বেৰ অংশতাঙ্গী বলে পৱিচিত এবং আমাৰ সম্বৰ্ধ, তাৰ
শীৰ্ষাৱোহণেৰ জন্মে এৱাই দায়ি ।

আমি সকালবেলাৰ কাগজেৰ খবৱ উলৱেখ কৰে বলি, শাস্তিপ্ৰাপ্ত
সতীৰ্থদেৱ জন্মে এদেৱ ভালোবাসাই তথনকাৰু সমাবেশ । এৱা স্পষ্ট জানে,
মৃত্যুকে সকলে ভাগ কৰে নেবো, অতএব, স্থথ অধুৱা দৃঢ় সকলেৰ ।
বিভাড়িত বস্তুদেৱ জন্মে এদেৱ চক্ৰ সজল ।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত কৰে আমি ঘোগ কৱি, আইনেৰ আশ্রয় এ-ক্ষেত্ৰে
নেয়া চলে । আৰ ওদেৱ তা কৰিব উচিত ।

তিনি অনুমনন্ত দৰে বলেন, ইয়া ।

তাৰ ঔদাসীন্য আমাৰ বিশ্বিত কৱলে বিগত কোনো বৰ্বে অহুক্ষণ
ঘটনাৰ কথা স্মৃত কৱি । তথন কেবল মাত্ৰ এৱই উৎসাহে ওৱা অয়ী হয় ।

আমি বললাম, সম্ভবত ওৱা আমাদেৱই শৱণ নেবে ।

এই উক্তি তাৰে উদ্বিগ্ন কৰেছে দেখী যায়, ওৱা কি তোমাৰ কাছে
এসেছিলো ?

আমাৰ বুকে গভীৰ শব্দ হ'তে থাকে । সকালে গোলাপেৰ কাছে দেওয়া
প্ৰতিষ্ঠিত স্মৃত হয় । তাৰ বস্তুদেৱ জন্মে আমি সব সময় বয়েছি এই বিশ্বাসে
তাৰ বুক এখনো ভৱে আছে স্মৃত রেখে বলি, না ওৱা কেউ আলে নি, তবে
এই সকলেৰ ধাৰণা যে, আপনিই একমাত্ৰ ব্যক্তি ।

তিনি স্বক দৰে কিছুক্ষণ বাইৱে তাকিৱে থাকেন, কিছুক্ষণ আমাৰ দিকে ।
এই বৰলে তাৰে গাড়িৰ চামড়া মোটা আসনেৰ কোথ হেঢ়বাৰ বৃথা চেষ্টাক
নিৰোধিত মেথে আমাৰ প্ৰকৃতই যমতাৰোধ হয়, না হলি, আমৱা এবাকে
এ সবেৱ যথ্যে থাকিব না ।

ତୋ ଶିକ୍ଷାତ୍ ଆମାୟ ହତ୍ସାକ କରେ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ କତୋ ଆଶା, କତୋ ବଡ଼ୋ
ବିପଦ— ।

ନା, ବିପଦ ଏମନ କିଛୁ ନୀୟ, ତିନି ବଲେନ, କିଛୁ କଟ ହବେ ଓହେବେ ।
ଅୟାଭ୍ରୋକେଟ ଆହମେବ ବା ଥାନ ରାଜି ହେଁ ସେତେବେ ପାରେନ ।

କିନ୍ତୁ ଓଦେର ଅର୍ଥବଳ ତୋ—

ଚୂପ କରୋ । ତୁ କଙ୍ଗଣ ଅଞ୍ଚନୟେ ଆମାୟ ଧାରିତେ ହୟ, ତୁମି ତୋ ଆନ୍ଦୋ,
ବଡ ଖୋକା ଛ'ବୁର ପରେ ବାହିରେ ଏସେ କତୋ କଟ କରେ କାଗଜଟାକେ ଦୀଢ଼
କରାଲୋ—ଓରା ତୋ ଭବିଷ୍ୟ ଚାଇ ; ବଲୋ ଏମନ ଅବହାୟ—

ଆମି କିଛୁ ନା ବୁଝେ ତୀର ଚୋଥେ ଚୋଥ ରାଖିଲେ ତିନି ବଲାଲେନ, ତୁମି
ଆନ୍ଦୋ ନା, ଲୋକ ଏସିଛିଲୋ ଏଇ ମଧ୍ୟେ, ଆମାୟ ତୋ କିଛୁ କରିତେ ପାରେ ନା,
ବଲାଲୋ ଶାର, ଆପନାର କାଗଜେର ଜଣେ ଆମରା ଖୁବ ଫୀଲ କରି ଶାର, କିନ୍ତୁ
ଶାର—, ଇତ୍ୟାଦି ।

କିଛୁଇ ଆର ଅବୋଧ୍ୟ ଥାକେ ନା । କିନ୍ତୁ ଏଆମି କି କରେ ମେଳାବୋ ।
ଗୋଲାପକେ ବୋଖାବୋ କି ଦିଯେ ? କୋନାରିନ ତାର କୋନୋ ଇଚ୍ଛା ଆମି
ଅପୂର୍ବ ରାଖିତେ ପାରି ନା । ଯଦି ସେ ଆମାୟ ସ୍ଥଣ୍ଟ କରେ ।

ପ୍ରାୟ ଆଗତ ଶିତ ସକାଳେ ଆମି ମାଙ୍ଗ ଗ୍ରାହେ ସରବ ଉପଶିତ୍ତ ଅହଭବ କରି ।
ତାରା ଆମାୟ କି ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଶୁଣ କରେ । ଆମି ପ୍ରତିବାଦେ ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତ ହତେ ପାରି
ନା । ଆମାର ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୋବନ ଗୋଲାପକେ ପୁରୋଭାଗେ ରେଖେ ମିଛିଲ
କରେ ଏଗିଯେ ଆସିତେ ଥାକେ ।

ପ୍ରତି ମୃହର୍ତ୍ତ ତାଦେର ଆଗମନ ସଂଭାବନାୟ ଆମି ସ୍ଥର୍ଵିତ । ଏହି ଲମ୍ବ
କ୍ଷେତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ କ୍ରୟାଗତିଇ ପ୍ରମାଦ ଘଟା ଆଭାବିକ । ସିନିଯାର ଚୌଧୁରୀ
ଆମାୟ କେନ୍ଦ୍ର୍ୟାତ ଲକ୍ଷ କରେ ସେ-ଦିନେର ଭଜ ବିଶ୍ରାମ ନିତେ ପରାମର୍ଶ ଦେନ ।
କିନ୍ତୁ ଆମି କୋଥାଯ ଯାଇ ? ସର୍ବତ୍ରଇ ତାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧରିତ ହତେ ଥାକେ । ସେ
କୋନୋ ଗୋପନ ସ୍ଥାନ ଥେକେ ତାରା ଆମାୟ ଟୁଁଡେ ଆନିତେ ପାରିବେ । କେନୋ ନା,
ଗୋଲାପେର ମହୋଦର ଆମି କଥିଲୋ ଆର୍ଦ୍ଦବନ୍ଧନ । ବା ପ୍ରତାରନା ଶିଥି ନି ।

ଭୌତିକର୍କ ସେଇ ବିଶାଳ ଭବନେ ବାହିରେ ଏସେ ମେଥିଲାମ, ହୃଦ୍ଦୂଳ ଆର ଛାଯା
ଦିତେ ଚାଯ ନା । ତାଦେର ଛାଯା କେବଳ ତାଦେର ପଦପ୍ରାପ୍ତେ ପଡ଼େ ଥାକେ । ସହିତ ଆନ୍ଦୋ
ଆଛେ, କ୍ରୟାଗତିଇ ତାରା ବିଭୂତ ହତେ ଥାକଲେ ଆମାର କୋନୋ ପ୍ରଯୋଜନେ ଆଗେ ନା ।

ଏଥାନେ-ମେଥାନେ ଇତ୍ତନ୍ତ ଜନମାଗମ କେବଳ ଆମାର ଅହସର୍ବିଦ୍ଵା ବାଡିରେ
ତୋଳେ । ଅହୁତି ଏତୋ ପ୍ରବଳ ହେଁ ଓଠେ ଯେ, ହୃଦ୍ଦଗ୍ର ଗତନେର ଶବ୍ଦର ମନେ
ହୟ, କାନ ଏଡାବେ ନା ।

तूर थेके आमार मेथते पेये ओरा झुक्त एगिरे आसते थाके। अत्येकेम युथे छुचिट्ठा एवं आशा पाशापाशि रयेहे। वर्षमर गोलापके आमि स्पष्ट मेथते पेलाम। से उदेर सजे आसवे आमि जानताम। सेहे युहुर्ते आमार केमन ज्ञोध हय। केन से उदेर सजे आছे। एकि आमाके घुणा करार, आमाके त्याग करार कोशल थाकि।

आमार विर्ष मुख्यगुल तादेर काछे कोन कथाइ गोपन राखे ना। फले आमि यथन उँझुम हওयार चेटाय बलि, मने हয়, अ্যাডভोकेट आহम, तोमादेर आরो बेशि काजे आसबेन, तथन-सेधाने बिन्दुमात्र आनन्देर लक्ष्य हय ना। आमि गोलापके लक्ष्य करते थाकि। से बिश्वित, बिभ्रास्त चोथे आमार दिके चেये थाके। आमि बুঁধি ओর अপरिचित अथবা ए आमार परिहास, सম्भवত से ए-সব কথाइ भাবে।

এমন করে চলে না, উদের যথে কে একজন বললো। আমি রেখি তাদের যুথে গুরুবর্ণ উঁকি মারে। আর সেই অগ্রিম সম্মুখে দণ্ডামান আমি দক্ষ হতে থাকি।

কিছি কেনো এমন হবে, আর একজন বলে।

তাদের প্রত্যেক চোথে অবিদ্যাসীর দৃষ্টি। ঘুণাও বুঁধি আছে। কিছি আমি সে-সব লক্ষ্য করি না, যেহেতু আমা আছে, ওরা কতো সংবেদনশীল অতএব আমি সব বুঁধিয়ে বলতে থাকি।

অসন্তোগ নীৰব হয়, ক্ষোধ বিদ্রিত। কেবল যৌজনব্যাপী হতাশায় তারা আচ্ছাদ হয়। কুকি উপায় !

গোলাপের মুখ্যকৃতিতে তথন আর কোনো বিশ্ব ছিলো না। বিষণ্ণ বদনে সে ধিকারে মানিতে কমে সকলের পিছনে সরে থায়। মনে হয়, আমার অগোৱা, অপমান, অক্ষয়তা সমষ্ট তাকেই বিছু করছে। সে বদি পারভো তাহলে এই যুহুর্তে আপন অবস্থাকে ধূলিশীন করে দিত্তো।

অথচ তার এই ভাব আমাকে কেবলই প্রাণহীন করে দিতে চায়। সে বদি অগ্রিমী দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে ধিকার দিয়ে বলতো, ছিঃ মনি, তুঁমি এই। এই তোমাকে আমি আজীবন জেনেছি, এই তোমাতে আমি আশ্চর্য ধূঁজেছি। তাহলে বৰং আমি তার হাতে হাত রেখে অফনয় করে বলতোম, গোলাপ আমার ক্ষমা কর ভাই।

কিছি সে তেমন কিছুই বলে না, কেবল বোঝা থাক, আমাদের থারে স্মৃতি দিগন্তবিদ্বারী হচ্ছে বা কেবল বিজ্ঞদের ইংগ্রিত বহন করে।

আমি বাইরে রাখে গোলাম। গোলাপকে যতোবাৰ চোখে দেখা যাব
ততো বোনা বাড়ে। সে এখন গমনোচ্ছুধ অতএব তাৰ সঙ্গে এখানেই শেষ
সাক্ষাৎ কৰা যাব। আমিও হিৱ ভাবি যে, এই বিদায়কালে সেও কিছুতেই
নিজেকে সহৃণ কৰতে পাৰবে না। ফলে আমাৰেৱ আবাল্য অক্ষমানেৱ
শৃঙ্খলাকে বিমনা কৰে দিলে আপন অপৰাধবোধ আৱো তীব্ৰ হবে।

আমি হৃদয়ে অহুভব কৰেছিলাম, গোলাপকে আৱ রাখা যাবে না। কেবল
আত্মানিৰ জগ্নে নয়, তাৰ বাসনা পূৰ্ণ কৰতে পাৱা যায় নি বলে নয়, প্রতিদিন
তাৰ সম্মুখে নিজেকে ধিক্কাৰ দিতে পাৱবো না বলেই একটি সহজ বিচ্ছেদ
অধিকতৰ সহনীয়, যদিও জানা আছে গোলাপহীন আমাৰ পৱিত্ৰ জনসমক্ষে
উচ্চারণ কৰা যাবে না।

আমি এ-ও জ্ঞানতাম, যদি ইচ্ছা কৰি গোলাপ আমাৰ ভালোবাসাৰ অঙ্গে
নিজেৰ অবয়ব বদলাবে, বাসনাৰ পৱিত্ৰন ঘটাবে, পৱিত্ৰিত অবস্থাৰ
দাসত্বেও সে আমাৰ মানসপ্রতিমা ধাকতে পাৰে, কিন্তু আমি তা চাই না।
অকৃষ্ণ, অথগু, অপৱিত্ৰিত গোলাপ যেনো অপৱেৱই মনোলীনা হয়, সে
যেনো অন্তেৱ হৃদয়ে বাস কৰে।

লৌকিক অৰ্থে এ-আমাৰ, কৰ্তব্যও ছিলো। যেহেতু সকলেই স্বীকাৰ বৱেন,
গোলাপৰা চিৰকাল ধাকে না, কোনো এককালে অপৱেৱ হত্যগত হয়ই।

সে-জন্মেই আমাৰ এই উচ্ছোগ এবং তখন আমি তাৰ পদধনি শনে
চকিতে কিৱে দীড়ালাম। সখিজনপৱিবেষ্টিতা গোলাপ আমাৰ সম্মুখে আসতে
ধাকে। তাৰ পদক্ষেপ অসমান এবং বিলিহিত। জলন্ত প্ৰদীপশিখা
বাযুতাড়িত হয়ে আপন অক্ষকে অনবৱত অত্যাচাৰীৰ ইচ্ছার অভিযুক্তে ঘূৱিয়ে
ঘূৱিয়ে ধৰলৈ সেখানে ষেমন এই আলো এই ঝাঁধাবেৰ স্থষ্টি হয় আৱ পৱল্পৱেৱ
মুখমণ্ডল বিশৃঙ্খলি ও প্রবণেৰ পাৰে এসে খেলা কৰতে ধাকে, এখন এখানেও
তেমনি ঘটে চলে।

তাকে আমি দেখলাম বিষাদময়ী প্ৰতিমা; যদিও নবসাজে সজ্জিতা তাকে
ৱাজেৰী মনে হয়। সে সাক্ষাৎ, কল্পিতা, নিৱালৰ, আৱ আমাৰ কৰ্ত শেষ
তীক্ষ্ণ আৰ্তনাদ প্ৰস্তুত কৰতে চায়, আৱ আমি পাৰি না, গোলাপ ক্ৰমা কৰু,
গোলাপ দাস না।

সে আমাৰ কাছে এলে আমি তাকে বক্সে ধাৰণ কৰি। শেই ক্লাব,
অভাবীন মুখশীলি আবাবু আমাকে অছিৱ কৰে তোলে। আমি আবেশে,
হৃষ্ণে, মেহে, ভালোবাসাৰ তাৰ মতকে আপন কণোল স্থন্ত কৰি।

কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। সে অপরের মনোবাসিতা। আমি
ধিক্ষৃত। আমি অক্ষুট, অব্যক্ত, কীণকষ্টে উচ্চারণ করি, আর হেঁথা হবে না
গোলাপ।

যাওয়ার মুহূর্তে, আমার বক্ষ ত্যাগ করে সে দীড়ালো, আর আমি
হাতাকারের মতো তন্তে পেলাম, মনি, তুমি কি আমার নির্বাসনে পাঠাচ্ছো?

আমি বললাম, না, গোলাপ, বনবাসী হলাম আমি। এই মঙ্গময় উষ্ণানে
এমটি মাত্র পুঁজি বিকশিত ছিলো। তার অভাবে উষ্ণান এখন অরণ্যে পরিষ্কৃত
হলো; আমি অরণ্যবাসী হলাম। কেবল ভয়াল খাপদ আর স্ববির বৃক্ষের
রাঙ্গুন্ড স্থাপিত হলো এখন।

তবে গোলাপ, যদি কখনো আকস্মিক এক ঝড়ের শেষে মৃক্ষপত্রের অন্তরাল
থেকে স্বনীল আকাশ মুখ বাঢ়ায়, তখন মনে পড়বে, তুমি ছিলে !

ବସବତୀ ଆବହୁ ବନ୍ଦୀ ଓ ଜ୍ଞାନେକପୂରୀ

ସଂସାରେ ଆମରା ଛିର୍ଣ୍ଣମ ଯାଏ ତିନଟ ପ୍ରାଣୀ—ଆଶା, ଆକାଶ ଓ ଆମି । ଦିନ ଏକ ବକମ ଭାଲାଇ ଯାଇତେଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ବିଧି ବାମ । ଗତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଆଶା ଯାରା ଗେଲେନ । ଅଯ୍ୟିକ ଆକାଶ ଦିତୀୟବାର ଆର ପାଣିଶହୁ କରିଲେନ ନା । ଅଥଚ ସଂସାରେ ବାଜାବାଜାର ଓ ଦେଖାଶୋନାରେ କେହ ନାହିଁ । ଅନେକ ଭାବିଯା ଚିନ୍ତିଯା, ଦାନାର ଆମଲେର ସଂପତ୍ତିର କିଛୁଟା ବିକ୍ରି କରିଯା ଆକାଶ ଏକଦିନ ଆମାକେ ବିବାହ କରାଇଲେନ ।

ଶ୍ରୀର ନାମ ବାହାରଉନ-ମେସା । ଆମି ଶୈଶବ କରିଯା ଭାବି ‘ବସବତୀ’ । ବସବତୀର ମୋଳତେ ଆକାଶ ଅଜ୍ଞବ ଗରମ ପାନ୍ତିଟା, ଆମନାମାଜଟା, ସମସ ମତୋ, ଧାଉୟାଟା, ଏମନକି, ଧାଉୟା-ଧାଉୟା ଶେଷେ ହାତ୍ମାନ-ଦିତ୍ତାଟାଓ ମଞ୍ଜୁଦ ଧାକିତ । ଦିନ ଗଡାଇଯା ଚାଲିଲ ।

ଏହି ଗଡାନିର ମଧ୍ୟେଇ ଆକାଶ ଏକଦିନ ତଳାଇଯା ଗେଲେନ । ବହିଲାମ—ଆମି, ବସବତୀ ଓ ଅଭାବ ମିଏଣ୍ଟ । ବଡ଼ ମିଏଣ୍ଟ, ଛୋଟ ମିଏଣ୍ଟ—ମକଳ ମିଏଣ୍ଟର ଅନ୍ତ-ବିନ୍ଦୁ ପରିଚିତ ଏହି ଅଭାବ ମିଏଣ୍ଟ କି କରିଯା ଆମାଦେର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀର କୃତ୍ରମ ସଂସାରେ ଚୁକିଯା ପଡ଼ିଲେନ, ଟେବୁ ପାଇଲାଯ ନା । ଚୁକିଯା ସଥିନ ପଡ଼ିଲେନ, ତଥିନ ଆବ କି କରି ! ଡ୍ରାଙ୍ଗୋକକେ ତୋ ମୂର୍ଖେର ଉପରେ ବଲିଯା ଲିତେ ପାରି ନା—“ଅନୁବ, ଏବାର ପଥ ଦେଖନ !” ଭାବିଲାମ, ଆଉ ନା ହୋକ, ଦୁଇଦିନ ପରେ ହଇଲେଓ ତିନି ଚଲିଯା ଯାଇବେନ । କିନ୍ତୁ ନୀ, ଅଭାବ ମିଏଣ୍ଟ ଗେଲେନ ନା । ଦିନ ଦିନ ଆମରାଇ ଶୁଦ୍ଧ କାହିଲ ହଇଯା ମଉତେର ପଥେ ଆଗାଇଯା ଯାଇତେ ଲାଗିଲାମ । ତିନି ପୁଷ୍ଟ ହଇଯା ଶିକଢ ଗାଡ଼ିତେ ଲାଗିଲେନ । ଏହି ଦିନକେ ବସବତୀରେ ସ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ୟାନ୍ତର ଭାଲ ଲାଗିଗିଛିଲେନ । ଏକଦିନ ବସବତୀ ରାଗିଯାଇ ବଲିଲ : “ଅଭାବ ମିଏଣ୍ଟକେ ତାଡାବାର ମୂରୋମ ନେଇ, ତିନି ଆମାର ମରନ ।”

ବସବତୀର କଥାଯ ରୀତିମତ ଅପମାନ ବୋଧ କରିଗାଲ । ପୌଙ୍କସେ ଲାଗିଲ ଆମାର । ଉଡ଼ିଯା ଆସିଯା ଜୁଡ଼ିଯା ବସା ଅଭାବ ମିଏଣ୍ଟ ବେଟୋଟାକେ ତାଡାଇତେଇ ହଇବେ ; ଏବଂ ବସବତୀକେ ଦେଖାଇଯା ଲିତେ ହଇବେ—ତୋମାର ଦ୍ୱାମୀ-ପୁଷ୍ପବ ସରହମ, ଦିଲାରାଜ ଖାନେର ପୁତ୍ର ହାସାତାରାଜ ଖାନ୍ ଦେଖନ ତେମନ ପୁଷ୍ପ ନାହ, ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭାବ ମିଏଣ୍ଟ ନାହ, ତେବେବେ ବଢ଼ିବୁ ମିଏଣ୍ଟରେ ତାଡାଇତେ ଲକ୍ଷମ ।

অবশেষে অভাবে মিঞ্জকে তাড়াইয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া গীও-গেরাম ছাড়িয়া একদিন সহর্ষে নগরে তাসিয়া উপনীত হইলাম। প্রথম কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া নগরীর শান-শওকত দেখিয়াম, বিস্তৃত ও বিমুক্ত হইলাম। কলনা করিলাম, রসবতীকে লইয়া যদি নগরীতে নীড় ধাঁধা যাইত, কি আনন্দই না হইত!

একদিন ছইদিন করিয়া মাসগুলি টপকাইয়া বছর অতিক্রম করিলাম। আজ এই অফিসে, কাল ঐ অফিসে, আজ এই সাহেবের বাসায়, কাল ঐ সাহেবের বাসায় গিয়া গিয়া ধৰ্ম দিতে আগিলাম। ইতিমধ্যেই পায়জ্ঞামায় তালি পড়িয়াছে, পাঞ্জাবীতে ফাটল ধরিয়াছে, ছুতাইন আজা-প্রদত্ত পাহের পাতা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, চোখে-ছই-একটি শর্ষেকূলও আগিয়াছে। টঁয়াকে পয়সা নাই বলিয়া পেট খালি হইল; কিন্তু এত ঘুরাঘুরি করিয়াও কোথা ও ‘কর্মধালি’ হেথিতে পাইলাম না বা কেহ আমাকে দিয়া কোনো খালি-ই পুরণ করিলেন না। আশায় আশায় বৈরাগীর নাচ শেষ হইল। একদিন চলৎ-শক্তি ও হারাইয়া ফেলিলাম।

এক কালের হৃদয়বরদের আচ্ছ-কেন্দ্রিকতাও লক্ষ্য করিলাম। ছই এক অনের সাথে কালেভত্রে পথে-ঘাটে যদিও বা দেখা হইয়া যায়, কিছু বলিবার পূর্বেই নিজের বাজ্যের অভাব-অভিষ্ঠোগের ক্রিয়তি বর্ণনা করিয়া দেয়। তারপর হাত ঘড়ির দিকে তাকাইয়া “অফিসে লেট হয়ে যাচ্ছে, এখন চলি, বাসায় দেখা করিস” — এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া ব্যস্ততা সহকারে চলিয়া যায়। এমন কি, কোথায় তার বাসা, নম্বরই বা কত, কিছুই বলিয়া যায় না বা টুকিয়া নিবারণ কুরুত দেয় না! বঙ্গ-বাঙ্গবদের এবশ্বিধ ব্যবহার দেখিয়া আমার নীরব হাসিই পাইত; কিন্তু যখন বক্রশ নাড়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিল, তখন অসহ হইয়া প্রায় কানিংহাই ফেলিতাম!

সেইদিন কি ভাবে বে সঙ্গ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বুঝিতেই পারিলাম না। বুনন রেসকোর্সের মাঠের মন্দির বাড়িটার সম্মুখস্থ পুকুরটির পাড়ে বসিয়া আছি। ভৱা জ্যোৎস্না। চান্দের কুপালী আলোয় প্রকৃতি হাসিধা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের কথা, রসবতীর কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আজ পুরা একটি বছর বেচাঁৰী দেশের ধার্ডিতে কি ভাবে, কি ধাইয়াই না আছে! তার কথা প্রবণ হইতেই মন আমার হহ করিয়া কানিয়া উঠিল। বেচাঁৰীর কোনো সাধ-আশাই মিটাইতে পারিলাম না। বড়ই ‘কোমলপ্রাণ। আসিবার দিন আমাকে ধরিয়া লে কি কাজা।’ আমি তার কথা চিহ্ন করিজ্বে

করিতে তরুণ হইয়া গেলাম। হঠাৎ অদ্বৈতে কোন্ এক বিদেশী কোকানীর ম্যানেজার দম্পত্তির আমার তথ্যভাব কাটিয়া গেলো। দেখিলাম, তাদের ছোট ছেলেটি কালো ঝুচুচে 'ক্যাডিলাক' গাড়িটাতে হাত রাখিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ইংরাজিতে ছড়া কাটিতেছে। বোৰা চোখে ছেলেটির পানে তাকাইলাম। মনে পড়িল আমার ছেলেটির কথা। আজ পর্ষস্ত যদি ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিত তা' হইলে ঠিক অত বড় ভাঙ্গর হইত। অশ্রুতে দুইচোখ ঝাপসা হইয়া গেলো। সেই ঝাপসা চোখেই একসময় দেখিতে পাইলাম, ক্যাডিলাকখানা ছুটিয়া চলিয়াছে। কানে শুনিলাম, ক্যাডিলাকের সাথে ফিরে করা রেডিও হইতে—'কাম এও এনজুব দি লাইক' ইংরাজি গানের হ্রস্ব আগিতেছে।

আমার অলঙ্কৃত একটি উষ্ণ দীর্ঘ নির্বাস রাহিল হইয়া আসিল। আমি উঠিয়া দাঢ়াইলাম।

অনেক কোশেশ করিলাম, তবুও চাহুড়ি হইল না। তাকাজী ও প্রবীণ চাহুরেদের কথায় বুঝিলাম, যার মুকুটী নাই, তার চাহুরিও নাই। দুই-একজন বিজ্ঞপ করিয়া বলিয়া কেলিলেন : 'কোনো বড় অক্ষিসারের বা মন্ত্রীর শালা সমুক্ষি হবার চেষ্টা করুন, চাকরির জন্য ভাবতে হবে না।'

বিগত এক বছর ধরিয়া এই প্রশ্ননই দেখিয়া আসিতেছি। স্বতরাং বিজ্ঞপ করিয়া বলিলেও, কথাটা আমার মনে ধরিল। নৃতন করিয়া ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। চিষ্টা করিলাম, কাহাকেও যামা, ঝুকা, চাচা, থালু বা শালা-ছলাভাই বানানো যায় কিনা ! যামা প্রায় সবাইকেই বানানো যায় ; কিন্তু কেহ আমার আকরার শালা হইতে রাঙ্গি হইবেন না। অস্তাৰ করিতে গেলে উলটা যাব থাইয়া কিৰিতে হইবে। তাছাড়া আমা-আৰোও তো বাঁচিয়া নাই। অতএব যামা বানানো সম্ভব নয়। বিবাহ আমি করিয়াছি। ঘৰে তিলোত্তমা রসবৰতীও রহিয়াছে, এমন বউ রাখিয়া বিবাহ করিয়া কাহারো ছলাভাই হইতে ইচ্ছ। হইল না। আৱ ইচ্ছা হইলেও কেহ কি—অতএব, উহা হইতেও বিৱৰ্ত রহিলাম। মনে মনে এই ভাবে কত সমৰক্ষ না পাতাইতে চাইলাম ; কিন্তু কোনটাই আমার অহুক্লে আসিল না ! বুঝিলাম, কেহ হঘতো বড়জোৰ আমার 'ছলাভাই' হইতে পারেন ! চিষ্টা করিয়া দেখিলাম আমার বেনই নাই। স্বতরাং ছলাভাই বানাইব কি প্ৰকাৰে ? চাকরি পাইতে হইলে ছলাভাই বনাইয়া শালা হইতে হইবে। অতএব, শালা হইবার অদ্যম শৃঙ্খলা আমাকে

পাইয়া বসিল। ভাবিলাম, রসবতীকে কিছুদিনের অন্ত বোন বানাইলে একেবারে মন হইত না; কিন্তু রসবতী কি বাজি হইবে? না হইবেই বা কেন? সেতো আর আজীবন বোন হইয়া থাকিতেছে না আমার। সামাজিক কর্যকলিনের অন্ত মাত্র। তারপর—

আর চিঠ্ঠা করিতে পারিলাম না। রসবতীকে বোন বানাইয়া কোনও বড় অভিযান বা মন্ত্রীর কাছে কিছুদিনের অন্ত বিবাহ দিয়া শালা হইবার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিলাম।

বাড়িতে আসিলাম। এক বছর পর্যন্ত বিদেশে থাকিয়া দীনবেশে আসিবার অঙ্গই হোক বা অভিযান করিয়াই হোক রসবতী কোন ক্ষেত্রেই বলিল না। রসবতীর এই-স্বর্ণনে বৌতিমত বিশ্বিত হইয়া গেলাম।। বাড়ির অঙ্গাঙ্গ বড়োরা যেমন তাদের স্বামীকে বাড়িতে আসিতে দেখিলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া দায়, তাদের অষ্ট-অলকারের অকারণ ক্ষমতামূল্য আওয়াজ স্বামীকে খুশি করার কাজে অতি ব্যক্তার পরিচয় দেয়, আমার উপশ্বিতিতে রসবতীর মধ্যে তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শোবার ঘর হইতে এক সময়ে উকি মারিয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের টেকিতে রসবতী বিমর্শ হইয়া বসিয়া আছে। তার পরনের কাপড়খানা শতচাচ্চ, মেহ অস্থিচর্ম সার, হাড়গুলি পরিষ্কার গনা দায়। বুরিলাম, অভিযানে নয়, নিমাঙ্গণ ব্যথায় এবং আমার অক্ষয়তাৰ অঙ্গই রামিয়া, গিয়াছে। তাই হাসিয়া কথা বলা তো দূরের কথা—কুশল সংবাদও জানিতে আসিতেছে না। সামাটি দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

রাত। বিছানা নিলাম। চোখে শুম আসিল না। তবুও শুমের ভান করিয়া চোখ বুঝিয়া পড়িয়া রহিলাম। শুমের মাঝে যেমন আশ-পাশ ক্রিয়ে আমিও বাবু ছই তাই করিলাম। এক সময় রসবতী শইতে আসিল। আমি বৌজা চোখেই ঘিটিমিটি চাহিলাম! দেখিলাম, সে এক দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে। তার দুই চোখে ঝ্লাবণের অজ্ঞ ধারা। রসবতী বিছানায় বসিল, আমাকে শুমস্ত যনে করিয়া বাবু-ছই শ্রীর ধরিয়া ভাকিতেই আড়মোড়া ভাড়িয়া চোখ মেলিলাম। রসবতী আমার একখানা হাত তার ছই হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ধরা গলায় বলিল: “তুমি আমাকে মাফ করে দাও।” বুরিলাম, সামাদিনেও আমার কুশল সংবাদ না আনার এবং এড়াইয়া চলার অন্ত সে অস্তিত্ব। বড় দায় হইল। বলিলাম: “কি সব ছেলে-মাহুবি করছো?” তাবু ছই চোখ মুছিয়া লিলাম।

একথা সে-কথার পর দুইজনই আভাবিক হইয়া গেলাম। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া টাঢ়ের আলো চুকিয়া ঘরখানাকে হাত্তোজ্জল করিয়া তুলিল। সেই টাঢ়ের আলোয় লক্ষ্য করিলাম, রসবতীর দেহে রসের বান ডাকিয়াছে। তার কক্ষালসার দেহে কোথা হইতে এই বান আসিল ভাবিয়া পাইলাম না। বান আসিলই যখন, তখন আশ্রম হইলাম। কারণ, রসের বান ডাকিলে রসবতী সব দৃঢ়-বেদনার কথা ভুলিয়া যায়। যা' বলি, হাসিয়া হাসিয়া তা-ই করে। শুতরাং মনে মনে ভাবিলাম, এইতো স্মরণ। কথার ভিতর—‘ওগো আমি যে তোমার’ ভাব ফুটাইয়া যে উদ্দেশ্যে দেশে আসা, উহা বিবৃত করিলাম।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া রসবতী প্রথমত হাসিয়া কেলিল। বুঝিলাম, সে সম্ভত আছে। বড় খুশি হইলাম। খুশির আবেগ আমাইতে না পারিয়া বলিলাম: ‘তা হলে কাল ষটার ট্রেনেই, কি বলো?’

—‘ষটার ট্রেনে!’

—‘ইয়া, ষটার ট্রেনে।’

রসবতী কথাটি বিশ্বাস করিতে পারিল না। সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বলিল: ‘তুমি সত্য বলছো?’

—‘কেন, অবিশ্বাস হচ্ছে।’

ওর কথার ধরন দেখিয়া আমি ও বিশ্বিত হইয়া গেলাম।

এতক্ষণ ইহাকে একটা নিছক হাসি-মস্কারার ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়াছিল রসবতী। যখন সে বুঝিতে পারিল যে, না, ইহা নিছক হাসি-মস্কারার নয়, তখন তার বান ডাকা দেহ-নদৌতে হঠাত ভাটা পড়িয়া গেলে।। এক ঝটকায় আমাকে ঠেলা দিয়া পাশ ফিরিল এবং কোপাইতে জাগিল। আমি হতবাক।

অতি অভ্যন্তরেই ঘূর্ম ভাঙিয়া গেলো। দেখিলাম, রসবতী বিছানায় নাই। ভাবিলাম, আমার পুরৈই ওর ঘূর্ম ভাঙিয়া গিয়াছে, বাহিরে হয়তো হাত-মুখ পুরৈতে গিয়াছে, এক্ষনি কিরিয়া আসিবে। কিন্তু না, তাকে আর আসিতে দেখা গেলো না। গোঘাল ঘর হইতে গাড়ীটি হাঁসা ঘরে ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির কথা মনে করিয়া কেমন যেন সন্দেহ হইল। তাড়াতাড়ি এ-দিক সে-দিক খুঁজিয়া গোঘাল ঘরের দিকে ছুটিলাম। সেখানে গিয়া যা দেখিলাম, তাতে আমার চঙ্গ হির। দেখিলাম, গুরু বাঁধার একগোছি মড়ি গলায় বীর্যিয়া রসবতী গোঘাল ঘরের ‘স্কুতুরের’ সাথে ঝুলিত্তেছে। তার মুখে

দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম, কিছুটা অস্বাভাবিক রকম বাহির হইয়া
আসিয়াছে। মনে হইল, সে যেন আমাকে ব্যক্তি রিতেছে।

আমি সেখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। রসবতী মরিয়াছে,
তার জগ্নি আমার এতটুক দুঃখও নাই। সে কিছু দিনের জগ্নি বোন হইয়া
আমাকে শালা বানাইয়া গেলো না বলিয়া হৃষ্ণ-মন আমার দশ হইজ্জে
লাগিল ॥

অঙ্ককার ওয়ার্জেন অজ্ঞ

মৌলভী সাব নসিয়ত করলেন : “হবে না আঙ্গার গজব। সারা ছনিয়া
ভৱে গেছে পাপে। ‘আঙ্গার আৰুশি কুপি পাহাৰাদাৰ, আজ্ঞাবাহক, মূৰেৰ
পয়দা ফেৰেন্তাৰ চেয়েও পিয়াৰা ইনসান সব হয়ে গেছে বেইমান।’” তাৰপৰ
তিনি বয়ান কৰলেন, শুগে যুগে ধৰ্মেৰ সোপান বিচ্যুত মাছুৰ কতো কষ্ট পেলো
আঙ্গার কহৱে পড়ে। হুহ নবীৰ আমলেৰ প্ৰাবন কাহিনী বৰ্ণনা কৰলেন তিনি
মৰ্মাণ্ডিক ভাষায়। সভাশুন্দৰ শ্ৰোতাৰা নৌচু মাখা আৱো নৌচু কৰে ‘সোবহান
আঙ্গা,’ ‘সোবহান আঙ্গা’ বলে সমস্তৱে রব তুললো ভীতকষ্টে।

মৌলভী সাব আনালো : কিয়ামত নজুন্দীগ ; ছেন্সিয়াৰ মিয়াৰা। বাকী
বেড়াৰ আড়ালে বলে নায়েবে রচুল গ্ৰামেৰ মৌলভী আফাজউদ্দিন সাহেবেৰ
ওয়াজ শুনে অন্তৱ-মন বিগলিত হলো কৃপজানেৰ।

বাপমা মুৱা আনছুৱ বৌ কৃপজান। চৰু বছৰ আগে শ্ৰীঘৰ হাটে গুৰু
ব্যবসা কৰতে গিয়ে ওখানকাৰ নাম কৱা পাইকাৰ-বাড়ি থেকে বিষে কৰে
এনেছে আনছু কৃপজানকে। আনছুৰ মতোই বাপ-মা হাৱা অনাদা মেঘে
কৃপজান। নামকৱা পাইকাৰ শহৰ আলীৰ ভাইৰি। হুলুৱ আঁট-আঁট ফৰসা
দেহেৱ গঠন। শুধু কপেৰ মোহই কৃপজানেৰ সহিত আনছুৱ বৈবাহিক সন্দেহেৰ
কাৰণ নহ। আনছুৱ ভৱপা ছিলো চাচ-খন্দুৰ তাৰ ওন্দাদ পাইকাৰ, তাৰ
উপৰ শুই এলাকায় পথে-হাটে তাৰ দোহাইও চলে যন্দ নয়। বেশ শক্তিশালী
চাচ-খন্দুৰ তাৰ শহৰ আলী। আদৱ এবং ইচ্ছে কৱেই তাৰ হাতে কৃপজানকে
তুলে দিয়েছিলো। বিষেৰ পৱ প্ৰাণ ঢেলে ভালবাসে আনছু কৃপজানকে। তাই
কৃপজান যা আবদাৰ কৰে তাই মেনে নিতে রাজি হয় আনছু। মৌলভী
সাবেৰ উক্তি মতে অদূৰে ভৱাল কিয়ামতেৰ চিন্তায় ধৰ ধৰ কৰে কাপতে ধাকে
কৃপজানেৰ মন। ভীত মনে ভাৰে কৃপজান, কখনো সে কাজেৰ বাহানা কৰে
নামাজ কাজা কৰবে না। আনছুকেও ৰীতিমতো নামাজ পড়াবে তাগাহা
কৰে।

কৃপজানেৰ তাগিদে বে-নামাজী স্থামী আনছুৱ মনেৰ মোড় দুৱলো।
ৰীতিমতো ৰেনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুক কৰলো আনছু। ছোট-

বেলা পাড়ার কারী সাবের কাছে সকালে হোগলার চাটাইয়ে বলে কোরাণ-তেলাওয়াতের রেওয়াজ্জটা ফিরিয়ে আনলো। এতদিন খরে না পড়ার পরিচিত হৃষকগুলোর অনেককেই তার চোখে যেনো কেমন নতুন মনে হয়। কলনাম ফিরিয়ে আনে আনছ সেই শৈশবের প্রাতঃকাল। আস্তে আস্তে পরিচয় পায় এইদের স্মৃতির ফলকে। কষ্ট হয় না আর পড়তে আনছুৱ। শুনতে সাধ জাগে ঝপঝানের। পড়তে জানে না ঝপঝান। হাসের মহানের চিন্তায় অবশ মনে সে ভাবে কোরাণ-তেলাওয়াত সে শিখবেই।

আনছ শিখালেই সে পারবে শিখতে। পড়া শেষ করে ঝপঝানের মুখের দিকে চেয়ে আনছ হাসে। জিজ্ঞাসা করে : “ভাল লাগে ?” কাপড়ের বাড়িতি আচলটাকে টেনে তার আড়ালে মুখ লুকোয় ঝপঝান। নাকের মোলকটাও ঢাকা পড়ে যায়। বড় বড় কালো চোখ ছটোতে স্ফুটে শুঠে তার সরমের জ্যাঙ্গ ছবি। বুরতে পারে আনছ। কাছে বসিয়ে আদৰ করে। কোরাণ শরীকথানা বক্ষ করে হাত বুলায় ঝপঝানের মাথায়। বলে : “তুমি পড়তে জান না তাই এত দুঃখ করো ? জানো মৌলভী সাবের কাছে হনছি খসমের ছওয়াবের অর্ধেক ভাগ পায় ; আর ইন্দ্রিয় বেলায়ও খসম অর্ধেক ভাগ পায়। তার উপর আবার যদি কেউ কোরাণ পড়ার সময় মন দিয়া হনে তো কোরাণ শরীক পড়ইয়ার মতোই ছওয়াব পায় সে। তুমিতো এমিহি আমার অর্ধেক পাইবা। তার উপর ছইয়া ছইয়াও আবার ছওয়াব লইতেছো !” আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে শুঠে ঝপঝানের মুখ। : “হেছা কথা ? মৌলভীসাব কইছে ? কবে, কোথায় ?” : “হেইদিন কইছে না বুইল্যা ; কতো বড় বড় মফিলে হনলাম কতো কতো আলীমদের মুখে। না হইয়া কি কেউ আলী-তালীর এই গায়বী ব্যাপারে মিছা কয় ? বিশাস না করো তো আরেক দিন মৌলভীসাব আইলেই জিজ্ঞামু হইননো তো !” বিশাসে উৎফুল হয় ঝপঝান।

সারা রাত মূলধারে বৃষ্টি পড়লো তাদের বাবো হাত ঘরের টিনের চালে অনৰন আওয়াজ করে। অল্প শীতের আমেজে একটিমাত্র কোথাকে টানাটানি করে ঘুমোল ওরা ছ'জন। অধোরে ঘূম। ভোরে বৃষ্টির বেগ কিছু কমতেই ভেঙ্গা ভালে কাকের ভাক শবে ঘূম ভাঙলো আনছুৱ। স্বত্বোধিত বাসি চোখ রংগড়াতে রংগড়াতে ঘৃহ একটা ধাক্কা দিলো ঝপঝানকে। টের পেছেও অধোরে ঘূমের ভান করলো ঝপঝান। এক সৃষ্টি চেয়ে হয় ঘূমস্ত ঝপঝানের মুখের দিকে আনছ। মনে তার বিহের পর কেলে আলা দিনঙ্গলোর পঁচাহ ছবি শতবলের স্বাম জেসে উঠতে লাগলো।

হাত পা ধূমে নিঃশব্দে ভাড়াভাড়ি নামাজটা আদায় করে নেয় আনন্দ। অঙ্গদিনের মতো তার কোরাণগড়ার স্থৱ না শুনতে পেয়ে মাথা তুলে চাব ক্লপজান, কই নামাজের চাটাইটা ঝুলছে বেড়ায়। উঠে পড়ে ক্লপজান। আনন্দ হয়তো তার সঙ্গে রাগ করেছে। তাই আজ আর ভাবেনি তারে নামাজ পড়তে। ক্লপজান টিক করলো আনন্দ কিনে আসবার আগেই সে নামাজ শেব করবে, আর হাত ধরে তার কাছ থেকে মাফ লইবে। ওয়াদা করবে কখনো সে অন্তায় করবে না আর।

নামাজ শেব করে ছেট চাটাইয়ের বিছানাটায় বলে নীরবে ভাবতে থাকে ক্লপজান। বেচারা আনন্দ তার স্বামী : একমাত্র সংসারের ভৱসা। সীমাহীন রৌপ্যে তপ্ত ঘৰ-বিয়াবানে একমাত্র ছায়াগুদ স্বেচ্ছ কলণায় পজ্জিত মহীকৃহ। বিষের পর থেকে দেখে আসছে ক্লপজান বেচারা আনন্দের কতোই না খাটতে হয়, অল্প পরিসর পরিবারটিকে রক্ষা করতে।

পিছনে আনন্দের পায়ের শব্দে চমক ভাঙলো ক্লপজানের। শক্তি ভীতা শশকিনীর মতো কিনে চায়। বিমৰ্শ মুখ আনন্দের উঠে কাছে যেতেই একটা দীর্ঘ নিখাস ছাড়লো আনন্দ। বুবতে পারে না কিছুই ক্লপজান। বিশৃঙ্খ বিশ্বের কেবল চেয়েই রইলো। তবুও নির্বিকার আনন্দ। সারাটা বছরের পরিশ্রমের আশা ভৱসা তার মাত্র কতকভাবা ধানের এক বিষেক্ষেত্র। কি স্বন্দরই না হয়েছিলো একেকটা ধীনের গাছ ! পাকতে মাসেক লাগবে। সবে মাত্র শিশ ছেড়েছে। সারা রাতের অরোর বৃষ্টিতে মাঠের যেখানে ছিলো ইটু পানি, সেখানে কোমর ছেড়ে উপরে উঠেছে। ভাবতেও অবাক লাগে একবারের বৃষ্টিতেই...। চৰম নিরাশায় ভরে উঠে আনন্দের মনটা। আষাঢ় মাসের আউশ ধানের জমিটা তার কতো উঁচুতে—একেবারে গাঁয়ের সমতলে। তবে শুধু হয়ে রয় আনন্দ। নিঙ্গায়ের প্রকট মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে উঠে তার ঝাপ্লা দৃষ্টির সম্মুখে।

বারটা মাসই চাল তামের খেতে হয় কিনে কিনে। আকাশ ভেড়ে পড়ে ক্লপজানের মাথায়। ক্লপজান তার গলার কবজ ছড়াটা এবং কানের মাকড়ী জোড়াটা সেধেই দিয়েছিলো আনন্দকে বিজি করে টাকা দিয়ে জমি বাধতে ভক্তি। বিষের সময় ক্লপজানের চাচা শহর আলী মিয়া এই গহনাগুলি দিয়েছিলো অনাধা ভাইবিকে ভবিষ্যতের স্বল্প করে দিতে। চাচাৰ অজ্ঞাতেই স্বামীৰ সংসার বাড়াতে বেচে ফেললো সেই গহনা কঢ়ি। গহনা বিজিৰ টাকাৰ নেওয়া ক্ষেত্ৰে ধান আজ প্রানিতে সুকালো। ক্লপজান তার গহন-

গুলোকে ঘেনো নিজ হাতে পানিতে কেলে দেওয়ার ষতই অপকর্ষ মনে করলো।

চিঠ্যায় অসাড় হয়ে পড়ে কপজান। অষ্টি ষ্টোবনের টুলটুল মূখ তার শুকিয়ে যায় মুছুর্তে। কপজানের ব্যথা ভারাক্রান্ত চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলো আনন্দ। কপজান আনন্দের নির্ণিমেষ দৃষ্টির বায়ে সঙ্গ হয়ে পড়ে। টের পায় আনন্দ কপজানের বিমর্শতার কারণটা, খাস্টা আরো লম্বা করে বলতে ধাকে : “দেশের ছবিন বুবি আর ঘাইবো না।” এয়ি বিপদের উপর বিপদ আইলে আৱ টিকন যায় কতো ?”

একটা চড়া গলার শব্দ শুনে আনন্দ। কি কথা কে কার সঙ্গে আলাপ করছে শুনবাৰ তাৰ ইচ্ছা হলো প্ৰবল। উঠে বাইরের দিকে যেতেই কপজান ডাকলো : “তামুক থাইল না।”

“তুমি জালাও। আইতাছি একুনি। হেৱা ‘আবাৰ কিএৰ কথা কইতাছে। শইয়া আই’—বলে একটু এগিয়ে দেখলো আনন্দ তাৰ তালাতো ভাই উভৰ পাড়াৰ কৱিম এদিকে আইছে। কৱিম আৱ আনন্দ সমান বয়সী। কয় বৎসৰ যাৰই ছইজনেৰ একত্ৰে বেশ মেলা-মেশাৰ ভিতৰ দিয়ে গুৰুৰ ব্যবসা কৰছে। কপজানকে আনন্দৰ সঙ্গে বিয়ে দেওয়াৰ প্ৰস্তাৱটা পয়লা কৰেছিলো এই কৱিমই। আনন্দ থেমে যায়। কৱিম ডেকে উঠে আনন্দৰ দিকে চেয়ে : ‘হনছো ভাই ! ছনিয়াড়া যে শেষ অইয়া গেছে। আৱ বেশি দিন নাই বুবি।’”

কপজান এখনো দৱজায় সাজানো কলিকায় তামাকেৱ উপৰ জলত টিকাটাৰ ফুঁ দিতেছিলো। কৱিমেৰ কথা শুনে পিছিয়ে আসাৰ পথে ধৰে বলে আনন্দ : “আৱে কও না কি অইছে ?”

“কওন লাগবো কৰে ? তুমি বুবনা রাতারাতিৰ মেঘেৰ পানিতে দেশটা কি অইয়া গেছে ?”—বলতে বলতে আসে কৱিম। স্বৰ ধৰে জওয়াব দেয় আনন্দ : “অঁ।”

কৱিম আবাৰ বলতে ধাকে : “শুনলাম কৈবৰ্ত্তৱা মেঘনা থেকে জাল বাইয়া কিমা যাইতে কইয়া গেছে মেঘনাতে নাকি পানিৰ অবস্থা খুবই ধাৱাপ। আগেৰ চাইতে দুই হাত উঁচা অইয়া পানিৰ স্থত বাইতেছে। উজানে আৱ নাও ধৱা যাইতেছে না। দেখলো ভৱ লাগে। পাহাড়ে নাকি বস্তা অইয়া পাহাড় পৰ্যন্ত তুবাইয়া কেলাইছে। হেই পানিৰ ঠেলু পঞ্জলে তো আৱ আমৰা আৰতে পৰ্যন্ত পাৰমু না। ভাইলা ধাৰ না হয়—তুইব্যা মৰমু।” ভৱে যন্টা কাগতে ধাকে কপজানেৰ।

করিয়া আব আনছু কলিকায় সাজানো তামাকটাকে ছাইরে রূপান্তরিত করে পালাক্রমে নারিকেলের খোলে তৈরী হোক্কাটায় একরোখা চুম্ব দিতে দিতে রূপজানকে ডাক দিয়ে করিয়া বলে উঠে : “শুনো ভাবী, এইতো আজ্ঞাতালাৰ কিমামত ; এৰ জন্ত দুঃখ কইৱা কোন ফল অহিত নহ। আজ্ঞা বা কৰেন ভালোৱ অস্তেই।” রূপজানেৰ দুঃখেৰ উৎসটা কৰিয়েৰ ভালো কৰেই জানা আছে। আজ্ঞাৰ দোহাই দেওয়াত্তেই সাময়িক ভাবে আশ্চৰ্য হয় রূপজান। আনছুৰ ইঙ্গিতেই নতুন তামাক দিতে হোক্কাটা নিয়ে যায় রূপজান।

চার দিন আগে ধান ক্ষেতে পানি উঠে সমস্ত ধান তলিয়ে নিলো। এই নিষে দুঃখ কৰছিলো আনছু আৰ রূপজান যিলো। আজ ঘৰে পৰ্যন্ত শোবাৰ বিছানা পাতবাৰ অস্তে একটু জ্বালাও শুনো নেই। এই দেশটাতো এদেৱ একাৰ নয়। দেশভোড়া আজ্ঞাৰ এই গজব নাজেল হয়েছে। ওঁ কি বে হবে ! কোথায় যাবে এতো মাঝুৰ ! সকলেৱই মনে একই প্ৰশ্ন। সারাটা দুনিয়া যেন পানিৰ বাজ্য হয়ে গেছে। সৌমাহীন মাঠ জুড়ে পানি, কেবল শ্বেত—আৱ ঢেউ। বেহুমার কলিবৱে উভূরোতৰ ফুলেই চলছে পানি। দুপুৱেৰ ঠিক আগেই ঘৰটায় চাৰ ইঞ্চি পানি হয়ে গেছে। দেশ কুকু লোকেৱ সকলণ হাহাকাৰ শ্বেতেৰ স্বৰকে আৱো তীক্ষ্ণ কৰে তুলছে। ভয়ে রূপজান আব আনছু দু'জনেই বুক দুক কৰছে।

পাশোৱ বাড়িতে আসবাৰ পত্রেৰ নাড়াচাড়াৰ আওয়াজ শুনে পৱনেৰ লুক্ষিটা শুচিয়ে পুৱা এক ইঁটু উঠানেৰ পানি ঠেলে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে পা টিপে চলে যায় শুনিকে আনছু। ঘৰে থেকে বেড়াৰ ঝাকে স্তৰ নীল আসমানেৰ খণ্ড বিখণ্ড এলোমেলো মেঘেৰ দিকে চেয়ে রঘ রূপজান। বড় অস্তুত লাগে তাৰ কাছে আজকেৱ এই দুনিয়াৰ বিচিত্ৰ পৰিবেশটা। বিশ্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বহিলো রূপজান।

বাইৱ থেকে আনছুৰ ডাকে ধ্যানেৰ খেই হাৰায় রূপজান। : “আৱে হনছনি, হেই বাড়িৰ তাৱা কি কৰতাছে ? এৱা নাকি হইষা আইছে পৰ্তিকাৰ ধৰৱ, মেশে নাকি আৱো পানি অহিব। এৱা লাইগা পোলাপান মাইয়ালোক সব পাঠাইয়া দিতাছে ছোট মিৱাৰ হউৱ বাড়িতে।”

রূপজান দুৰ্বল বোগিমীৰ মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে দৱজাৰ। মুখটা তাৱ বিবৰ্ণ, মলিন, চিঞ্চাঙ্গিষ্ঠি ! : “সারাদুশ পানিৰ তলে পইড়া পেছে আৱ এৱা ঐ পেৱামে গেলেই কি অহিবো ?” ধৰা গলাৰ জওয়াব

দেয় ক্লিপজান। : “আরে তুমি জানো না হৈই কণ। ছোট মিঙ্গুর হউক
বাড়ি বাড়াইল গেৱায় কত উচী দেশ। এক একটা ঘৰেৱ ভিটা কতো
খাড়া। আবাৰ কিনা একটা দালানও আছে দুইভালা।” বলে আনছু।
আৰ্থক্ষত হলো শুনে ক্লিপজান। তাহলে দুনিয়ায় এখনো শুকনো জাগুগা আছে।
ক্লিপজানেৱ বিৰ্বৎ মুখ্যটা একটু ফৰসা হতে দেখে আনছুৰ মুখে একটা অস্তিত্ব
আভা নাইলো।

উঠানেৱ কোণে আধুনিক শিমেৱ লতায় ভৱা মাচায় আশ্রিত মোৱগুলি
হঠাতে একসাথে ‘সোৱগোল’ কৱে উঠে মাচাটাকে ভেঙে কেলাৰ উপকৰণ
কৱলো। আনছু এবং ক্লিপজান সেই দিকে চোখ দেয় একসাথে। মৰ্দা
মোৱগুটা অঞ্চল পৰিসৱ জাগুগাৰ মুৱগীটাকে তাড়া কৱেছে। আচৰক্ষাৰ চেষ্টা
কৱেও শেষ পৰ্যন্ত মুৱগীটা...। লজ্জা পায় ক্লিপজান। প্ৰসৱ মুখে এগিৱে
আসে আনছু। স্বামীৰ মনেৱ গোপন গহন থেকে উঁকি দেওয়া বাসনাৰ
প্ৰতিচ্ছবিটা প্ৰচল হয়ে ওঠে ক্লিপজানেৱ মনে। আনছুৰ কামনাময় ইঙ্গিতেৱ
জওয়াবে ক্লিপজান জানায় তাৰ অক্ষমতা। ঘৰেৱ যেৰে ভৱা পানিতে চোখ
পড়তেই কামনা উত্পন্ন আনছু হয়ে যায় শাস্তি; বৱফে ক্লিপজানেৱ পানিৰ
মত। চিন্তায় ভাগাভাস্ত হয়ে যায় আবাৰ আনছুৰ মনটা। মাচা একটা
তৈৱী কৱতেই হৈব। নইলে ঘৰে আৰ ধাকা যাবে না যে।

হই হাত উচু মাচাৰ উপৱ একপাশে শোৱাৰ বিছানা কৱেছে শৱা
দুইজনে। একপাশে চুলোটা রেখে তাতে কোনমতে বান্ধাৰ ব্যবস্থা কৱে
নিয়েছে। দিনঞ্চলো কোন বকমে আলাপ-আলোচনায় কাটায় দু'জনে শৱা।
পাশেৱ বাড়িৰ মেঘেলোকেৱা সব চলে গেছে। আছে ওই বাড়িতে অনকৰ
পুৰুষ। বাৰিক মুনিষ তাৱা, বাড়ি পাহাৰা দেয়। শক্ত মোটা গজাবী
গাছেৱ তৈৱী উচু মাচাৰ উপৱ বক্ষিত গৰু বান্ধুৰ দেখে। সক্ষ্যা না হতেই
ঘৰেৱ যেৰে ভৱা পানিতে দীঢ়ানো চৌকিৰ উপৱ শুয়ে ঘূম যায়।

বাজিটা এলেই কেমন যেনো মনে হতে থাকে ক্লিপজানেৱ। হালকা বাঁশেৰ
শুঁটি দেওয়া মাচায় শোয় শৱা স্বামী-স্তৰী দু'জনে। পানিতে কোন কিছুৰ শব্দ
হলেই শৎকিত হয়ে ওয়া ভীজু শশকেৱ মতো। বুৰি সাপ—। পানিতে
বাতিৰ আলো বেখলেই নাকি সাপ আসে, দু'মুখো সাপেৱ নাকি এটা অভাৱ।
তাই সক্ষ্যা না হতেই বাতি নিভিয়ে অক্ষকাৰ ঘৰে মাচাৰ উপৱে তৰে আলাপ
কৱে আনছু আৰ ক্লিপজান। আৱো বৰি পানি বেড়ে ওঠে, মাচাটা তল কৱে
দেয়, শুনেৱ গুৰুব্য হবে কোথাৰ? ভয়ে আড়ত হয়ে ওঠে ক্লিপজান। আৱো-

পানি ! ভৌত আলাপের প্রসংগটা চলতে থাকে যশাৱের উপত্রবেৰ সাথে পাৰা দিয়েই। আনন্দুৰ নিখাসগুলি দীৰ্ঘ শোনা যাচ্ছে। বুৰতে, পাৰে কৃপজ্ঞান আনন্দ ঘূমাচ্ছে।

চোখে ঘূম আসে না কৃপজ্ঞানেৰ। কতো চিন্তা এসে ভিড় জমাই তাৰ মনে। সত্যিই তো পানি আৰো বাড়লে কি কৰবে। ওৱা নিঃসহায় যাহুৰ। চীলে বৃষ্টিৰ আওয়াজ শুনে চোখ মেলে কৃপজ্ঞান। অক্ষকাৰটা গাঢ় হয়ে সমস্ত কিছুকে ঘেনো কোথায় নিশিঙ্ক কৰেছে। বাঁশেৰ কূদ্ৰ চাৰায় ঘেৱা নেকড়া-কাপড়ে তৈৱী যশা তাড়ানোৰ এবং ঠাণ্ডা পাওয়াৰ উদ্দেশ্যে ঘূমানো পাথাটা একপাশে রেখে আনন্দকে জড়িয়ে ঘূমবাৰ চেষ্টা কৰে কৃপজ্ঞান। আনন্দ তখনো ঘূমাচ্ছে। অৰোৱে ঘূম ! দিনেৰ পৰিশ্রান্ত দেহ তাৰ ঘূমেৰ আমেজে অবশ্য। সাবাটা দিন পৰিশ্রান্ত কৰেছে আনন্দ। পানি ঠেলে ঠেলে ও পাড়াৰ কৰিমদেৱ বাড়ি ধেকে চাৰটা মোটা কলাগাছ এনে কি খাইনিষ্টাই না খেটেছে বেচাৰা ভেলাটা তৈৱী কৰতে। দিনে ভেলা তৈৱী কৰিবাৰ সময় আনন্দ ভৱসা দিয়েছে কৃপজ্ঞানকে ; পানি যদি এদেৱ যাচাতক উঠে যায় তো নোকাৰ বদলে এই ভেলাই হবে এদেৱ আশ্রয়। কৃপজ্ঞানও জওয়াৰ দিয়েছিলো পানিতে পাওয়া গ্ৰাম ছেড়ে অগ্নত যেখানে শুকনো যাটি আছে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে অগ্নদেৱ মতো। আনন্দ শুনালো কৃপজ্ঞানকে ওঝেৰ পাশেৰ গ্ৰামেৰ কাৰা-না-কি পানি-ওঠা বাড়ি ফেলে দূৰে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। বাড়ি শুন্দি নিৰ্জনতাৰ স্বয়োগ নিয়ে চোৱেৱা রাত্ৰিৰ অক্ষকাৰে ঘৰেৰ চালেৰ টিনগুলি খুলে নিয়ে গৈছে। চোৱদেৱ হীন মনোবৃত্তিৰ কথাটা মনে হতেই কৃপজ্ঞানেৰ ঘূমেৰ কস্তুৰতাৰ পৰ্যবেক্ষিত হলো। ভাবতে থাকে কৃপজ্ঞান। এমন দুৰ্দিনে তবুও চোৱেৱা এ জ্যোত্স্না কাম কৰলো ? এদেৱ প্ৰাণ নেই। চোৱ ডাকাতৰা সব—হাসয়েৰ মাঠে আজ্ঞা এদেৱকে কি-বে সাজা দেবেন ভাবতে গা কাটা লিয়ে উঠে কৃপজ্ঞানেৰ।

ঘৰেৱ কোণে পানিতে কিসেৱ শব্দ শুনে ঘূমস্ত দ্বায়ীকে জড়িয়ে আৰো চেপে ধৰে কৃপজ্ঞান। টেৱ পায় আনন্দ। ধড়মড়িয়ে উঠে বলে মাচায়। কাপতে থাকে। ব্যস্ততাৰ হৰে ক্ৰশ কৰে : “কি অহিছে ঝঝা-ঝঝা ?” ভৌতিপূৰ্ণ কঠে জানায় কৃপজ্ঞান, : “ঘৰেৱ কোনোয় বেড়াটায় কিড়া জানি পানিতে আওয়াজ কৰে।” : “ঝঝা-কও কি ? তাইলে তো হাপ নিচহই। বাতিটা জাইলা কুপিটায় আশুন দাও দেখি।”

কৃপজ্ঞান দেশলাইয়েৰ কাটি খুঁচিয়ে আশুন আলাভেই অক্ষকাৰ ঘৰ হেসে উঠলো আলোতে। যাচার একপাশে রাখা শাঠিটা হাতে নিয়ে আনন্দ তাকাই

ଥରେ ସନ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣ୍ଟାର ଦିକେ । କୁଣିତେ ଆଶମ ଦିଲେହି ଶଳତର ମୁଖେର ଜମା କାଲିର ଗୁଡ଼ିଙ୍ଗୋ କଟୁକଟୁ କରେ ଛିଟିତେ ଥାକେ । ଥତ୍ସତ ଥେରେ ସାଥ ଆନନ୍ଦ । କି ଆନି ଓଦିକ ଥେକେଇ ବୁଝି..... । ମଚ୍‌ମଚ୍ କରେ ମାଚାଟା କୀପତେ ଥାକେ ଆନନ୍ଦର ଶରୀରେ କୌପୁନିର ତାଳ ସାମଲାତେ ନା ପେରେ । ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ବାଶେର ଖୁଟିଟାକେ ଆଶ୍ରଯ କରେ କି ଯେନୋ ଏକଟା ବଜିଲ ଡୋରାକାଟା—ଠିକ ମେଦ-ଭସ୍ତୁର୍ ସାପଟାର ମତୋଇ ଦେଖା ଯାଚେ । ଲାଟିଟା ଦେଲିକେ ବାଢ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ଇଶାରା କରେ : “କୈ ;” ଥଥେ କରେ ଏକଟା ଲାକ ଦିଲେହି ମନ୍ତ୍ରବଡ଼ କୋଳା ବେଙ୍ଟା ଏସେ ପଡ଼େ ମାଚାୟ । ଚିଂକାର କରେ ଉଠେ ଏକଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଆର ରଙ୍ଗଜାନ ହୁଅନେଇ । ଆର ଏକଟା ଲାକ ଦିଲେହି ସରେ ପଢ଼େ ବେଙ୍ଟା - ଦୂରେ ପାନିତେ ଡୁବେ ଯାଯ । ତାଦେର ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ବାଁଧ ବେଢ଼ାର ଓପାଶେ ଯାତିର ଖୋପରୀର ଉପର ବସା ମୋରଗଞ୍ଜିଲିତେ ଲାଡା ପଡ଼େ ଯାଯ । କକ୍କ କକ୍କ କରେ ଡେକେ ଉଠେ ମୋରଗଞ୍ଜିଲି ସବ ଏକ ସାଥେ । ବୁଝିଲୋ ଆନନ୍ଦ ଓଟା ସାଗନ୍ତ ନୟ—ଗୁହିତ ନୟ—ହୃଷ୍ଟ କୋଳା ବେଙ୍ଟା । ହାମତେ ରଙ୍ଗଜାନେର ହାତେ ଧରେ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ : “ଆରେ ଡରାଇଓ ନା, ଛନ୍ଦେ ଏହିଭା ବେଙ୍ଟା ଯ୍ୟାନା ।” ଆଧା ମୂର୍ଛିତ ରଙ୍ଗଜାନ ମୁଖ ତୁଲେ ; : “ଇୟ-ଇୟା ବେଙ୍ଗ ?” “ଆରେ ଦେଖ ନା ହାଲାରଟା କୈତେଲେ ଆଇଯା ଏହି ଡରଟା ନା—ଲାଗାଇଯା ଗେଲୋ । ତୋମାରେଇ ଆର କି କମ୍, ଆମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡରାଇଯା ଗେଛଲାମ ଗ୍ୟା ! ଯାକ ଏକଟା ଟିକା ଦେଓ ତାମ୍ଭ ଥାମ୍ ।”

ମାଚାର କୋଣେ ନାରିକେଲେର ମାଲାଟାତେ ତାମାକ ଏବଂ ଟିକା ବେରେହେ । ରଙ୍ଗଜାନ ହାତ ବାଡାତେ ଟେର ପେଲେ ପାନି ମାଚା ଅବଧି ଉଠିତେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଏକଟୁ ବାକି । : “ପାନି କହିତକ ଉଠିଛେ ଦେଖଛୋ ନି ?” ବଲେ ରଙ୍ଗଜାନ । ଆନନ୍ଦ ମୁଖ୍ଟା ଛଇଯେ ନୌଚେର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେ : “ଅ—ଦେଖଛିତୋ, ଆର ମାଚାଯାଓ ଟିକୋନ ଘାଇବ ନା । ରାଇଟଟାର ମଧ୍ୟେ ଏମନ କାଣ୍ଡା ଅଇଯା ଗେଛେ । ବିଦ୍ୟାନ୍ତ ତୋ ଅହିତେ ଦିବ ନା ଦେଖଛି । ଖୋଦାର ଆଶାମତ ବୁଝବାର କ୍ଷେମତା କେଉଠାଇ ନାହିଁ । ଜାନି ନା ପାନିତେ ଡୁଇବ୍ୟାଇ ମୟତେ ଅଯ ନାକି ? କିମ୍ବାମୁତ ଐ ଅଇଯା ଯାଇବୋ । ଗଜବ ଅହିଛେ । ଗଜବ ଛାଡା ଆର କି କଣ ?” କେଯାମତେର ନାମେ ରଙ୍ଗଜାନ କାଠ ହସେ ଯାଯ । ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକଟା ମୂର୍ତ୍ତିର ମତୋ ମାଚାର ଉପରଟାମ୍ ବସେ ରଇଲୋ । ମାଥା ଗୁଞ୍ଜେ ଏକଟାନା ଦମ ଦିଲେହି ଚଳିଛେ ହୋକ୍କାଯ ଆନନ୍ଦ । ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ବୃକ୍ଷିର ଫୋଟା ପଡ଼ାଟାଓ ଧେମେ ଗେଛେ । ଚାରିଦିକ ନିବିଡ଼ ନିଷ୍ଠକ । ଯାଥେ ଯାଚେ ଆନନ୍ଦର ହୋକ୍କା ଟାନାର ନେଶାଯିତ କାଶିର ଆଶମାଜ ଏହି ହନ୍ତିହୀନଭାବକେ ବିଦ୍ୟନ୍ତ କରିଛେ । ଆକାଶେ ଏକଟି ତାରାଓ ନେଇ । ସୁଜି କରେଇ ବେଳ ଓରା ଲୁକିଲେହେ ଏକ ସାଥେ ।

হঠাত নিষ্ঠক আকাশে যেদের শুরু গর্জনের সাথে কড়া একটা বিহুতের ঝিলিক নিবিড় প্রকৃতিকে একবার ঝলসিয়ে গেলো। জঙ্গিগ দিকে কিসের যেনো আওয়াজ, শব্দটা খুবই পাশবিক মনে হতে লাগলো। বাতাসের সৌ-সৌ রবটা যেনো কোটি কোটি নাগিনীর তপ্তধাম হয়ে আনছে। লোকজনের মর্মাণ্তিক চিংকার শুনা যাচ্ছে। মেষমায় ভাঙনের আগে তারা যে গ্রামের বসতি ছিলো সেই উলুকান্দি গ্রামের লোকদের কামার আওয়াজ। পরনের কাপড়টা শুচিয়ে নেমে পড়ে পানিতে আনছু। বাঁশের খুঁটির সাথে ধীধা বাইরে কলাগাছের তৈরী ভেলাটায় ঘেতে ঘেতে ডাকলো আনছু ঝপজানকে, “আইও তাড়াতাড়ি; এখন ঘরে থাকুন থাইবো না। থাক মাচায় সব কিছু। ফেই তুফান আইভাছে ঘর পুইড়া থাইবারও তর আছে। থাকতো না আজকা আর কিছু। পরনের কাপড় ভিজিয়ে ঝপজান গিয়ে উঠলো ভেলাটাতে স্বামী আনছুর পাশে। ভরে কশিত কঢ়ে কঢ়ে দোয়া দক্ষিণ না পড়তে চাইলো ঝপজান। আনছু শুরু করলো দোয়ায়ে ইউচুন পড়তে। দোয়াটা নাকি বিপদের একমাত্র কথচ। ইউচুন নবী (সঃ) যাছের উদ্দৰ হতে রক্ষা পেয়েছিলেন এই দোয়া একনিষ্ঠ মনে পড়ে।

ঝ্যাত ঝ্যাত করে বৃষ্টি এবং বাতাস শুরু হলো। আনছু ভেলাটা ঠেকিয়ে ধীধলো উঠানের কোণে প্রায় গলা পানিতে দাঢ়ানো নরিকেলের গাছটাতে। অসহ বৃষ্টির কড়া ছাট পর্যন্ত সহু করলো তারা সকাল অবধি বৃষ্টি না ছাড়াতে।

ঘরের মাচার উপরে পানি উঠেছে। এক হাত পানি। কলাগাছ দিয়ে বানানো ভেলায় চাটাইয়ে ছৈ বেঁধে আনছু আর ঝপজান। পানি কিছু কমবে। আনছু বুায় ঝপজানকে : “বস্তাৱ পানি এই বুকমই! বেশিদিন থাকব না। ইনছি সিলেটের লোকেৱা কইছে তা’গোৱ দেশে নাকি একদিনেই বস্তা আইয়া পানি আবাৰ একদিনে ছকাইয়া যায়। আমাগোৱ এইখানে তো তবু বেশি দিন বইলো। যাইবো গা—আৱ কৃতদিন? আঞ্চায় কি মারবো আমাগৱে?” ভৱসা পায় ঝপজান। চোখে তার ভেসে উঠে আবাৰ শুকনো ঘৰে বাস কৱাৰ একটা জীবনের জলস্ত ছবি নতুন ঝপ নিয়ে। ভুলবে না সে এই দুঃখময় দিনের কথাগুলি।

ঘন ঘন কাশে ঝপজান। গলার আওয়াজও তাৰ ঘেন কেঘেন হয়ে গেছে। গায়ে তাৰ জৰ উঠেছে। ভীৰণ জৰ। চূপ কৱে পড়ে বৰু। কেবল ভাৰে ঘনে ঘনে সে ঘৰের পানি শুকাবে কৰে? এতো কঢ়ে পড়ে থাকতে তাৰ আৱ সহ না। তবুও মুখ খুলে বলে না সে। আনছু দুঃখ পাবে ঘনে।

ଶ୍ରୀମତୀ କୃପଜ୍ଞାନ ମାଧୁମିଳୀ ଗଲାରେ ବଲେ ଉଠେ : “ଏତୋ ଜର ?” କୃପଜ୍ଞାନ ମାଧୁମିଳୀ ଗଲାରେ ବଲେ ଉଠେ : “ସରି ଅଛିଛେ । କଥ ବାତ ଭିଜାତେ ଇମ୍ବି ମନ୍ଦି ଅଛିଛେ ।” ମାଧୁମିଳୀ ତାର ଧୂହିଯେ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ । ଜିଜାପା କରେ, କପାଳ ବ୍ୟଥା କରେ କି-ନା । ହାତେ ଇଶାରୀ କରେ ଆନାରେ କୃପଜ୍ଞାନ : “ନା” ।

ମନ୍ଦ୍ୟାର ଶୁଭତେଇ ନାମତେ ଥାକେ କାକେର ପାଥାର ମତୋ କାଳୋ ଅଙ୍ଗକାର । କୃପଜ୍ଞାନ କଥା କଥା ନା । ଏହି କରଲେଓ ଠାହର କରତେ ପାରେ ନା । ଛଂଖେ ବେହିଶ ହସେ ସେତେ ଚାଯ ଆନନ୍ଦ । ‘ନା, ନିଷେ ସାକ ଚୋରେ ଘରେର ଚଲେର ଟିଲ ଖୁଲେ, ସାହୁମ ନା ଆର ଏହି ନିର୍ଜନ ବାଡ଼ିତେ । ଏହି ଘରେର ମାସା କରେଇ ଆଜ କୃପଜ୍ଞାନେର ଏହି...’ ଖେଦ କରତେ ଥାକେ ଆନନ୍ଦ ।

ମିଉମେନିଆ ହସେହେ କୃପଜ୍ଞାନେର, ବୁଝତେ ପାରେ ଆନନ୍ଦ । ଖୋଦାକେ ଡାକତେ ଥାକେ, ବାତଟା ପାର ହସେ ଗେଲେଇ ନିଷେ ସାବେ ସେ କୃପଜ୍ଞାନକେ ଡେଲାଟାଯ କରେ ଛଲିମଗଙ୍ଗେର ବାଜାରେ ସରକାରୀ ଭାକ୍ତାରଖାନୁତେ । କୋନ କଥାଇ ବଲେ ନା କୃପଜ୍ଞାନ । ସୋଜା ହସେ ପଡ଼େ ଆହେ । ମନେ ଭସ ପାୟ ଆନନ୍ଦ । ଘରେର ଆଡ଼ାଲେ ଡେଲାଟା ନିଷେ ହୁପିତେ ଆଶ୍ରମ ଦିଯେ କୃପଜ୍ଞାନେର ମୁଖେର କାହେ ମୁଖ ନିତେଇ କିଂକର୍ତ୍ୟବ୍ୟବିମୁଢ ହସେ ସାଯ ଆନନ୍ଦ । କୃପଜ୍ଞାନେର ଶରୀରଟା ହିମ ଶୀତଳ ହସେ ଗେହେ । ହସତୋ ଅଲକ୍ଷଣ ପରେଇ... ।

କାଥାର ଭାଙ୍ଗେର ନୀତେ କୃପଜ୍ଞାନେର ଶିଯରେ ଛିଲ ଦେଶଲାଇଟା । ଅନେକ ଥୋଚା-ଥୋଚିର ପର ଆଶ୍ରମ ଦିଲୋ ହୁପିତେ ଆନନ୍ଦ । ଓହଁ ହତଭାଗିନୀ ଅଙ୍ଗକାରେର ହସୋଗେ... । ବଜ୍ରାଘାତ ହଲୋ ଆନନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ । କାମତେ ଥାକେ ସେ ନିରପାଯେର ମତୋ । ବୁକ ଫାଟା କାହାର ମର୍ମାଣ୍ଡିକତାୟ ପ୍ରାପ ତାର ବେର ହସେ ସେତେ ଚାଯ ।

ନିଃଶାୟ କର୍ତ୍ୟଜ୍ଞାନହୀନ ଆନନ୍ଦ ଭେବେ କୋନ ପଥ ପାର ନା । କେମାମତେର ଭସ କରତୋ କୃପଜ୍ଞାନ । ଆଜକେତୋ କେଯାମତ । ଏ କେଯାମତ କେନ ଦେଖେ ନା କୃପଜ୍ଞାନ । ଏହି ଚେଯେଓ ଅଟିଲ କେଯାମତ କି ଆବାର ହବେ ? ବିଶାସଟା ନଷ୍ଟ ହତେ ଚାଯ ତାର । ମୁତ୍ତ କୃପଜ୍ଞାନେର ମୁଖ୍ଟୀ ଚେକେ ଦେଇ ସେ କୃପଜ୍ଞାନେରଇ ପରନେର ଶାଢ଼ିର ବାଡ଼ିତି ଝାଚଲଟା ଟେମେ । କୃପଜ୍ଞାନେର ମୁତ୍ତ-ମେହେକେ ଦିନ ଏଲେଇ ବା କି କରବେ ସେ । କବର ଦେଉସାର ଜାମଗା ନେଇ କୋଥାଓ, ତାର ଉପର କାକନେର ଖରଚା । ପରମ କଢ଼ି ତାର ହାତେ ନାହିଁ । ଚିତ୍ତା ଏବଂ ଭସ ଦୁଇ ତାର ମନକେ ଘରେ ଫେଲେହେ । ବାଇରେ କି ବେଳୋ ଏକଟା ହାଗାର ମତୋ ଦେଖିତେ ପେଲୋ ଆନନ୍ଦ । ମୁଖ୍ଟୀ ବେର କରେ ଦେଖେ ନିଲୋ ସେ । କୋଥାଓ ଏକଟା ଶର ପର୍ବତ ନେଇ । ଶର ନୌରିବ ।

ଶିର କରଲେ ଆନନ୍ଦ ଡେଲାଟା ଶହ କୃପଜ୍ଞାନକେ ଛେଡେ ଦିବେ ମେଘନାର ଶ୍ରୋତେ । ପାରାଣ ଆନନ୍ଦ ଥାମୀ ହସେଓ । ଭୁ ଇଚ୍ଛା ହସ ତାର ଶେଷବାରେର ମତୋ ଏକବାର

ক্ষণজানের মুখটা দেখতে। মনে পড়ে তার শরীরতের বিধান—ধর্মের নিয়ম :
মৃত জীৱৰ মুখ মেখা জীবিত স্বামীৰ জগ্ন নিমেধ ।

প্রমত্ত মেঘনা সাই-এই রবে ছুটে চলেছে। এক একবার পাক খাওয়া
পানিগুলি মনে হয় যেনো মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। ভয়হীন মনে আনন্দ নেমে
পড়ে ভেলাটা ছেড়ে মেঘনাৰ পাড়ে। মাটিতে পা ঠেকতেই দেখলো আনন্দ
গলা পানি তাৰ। কলেমা পড়তে পড়তে ঠেলে দিলো ভেলাটাকে সে নদীৰ
দিকে। অলস্কণেই কোথায় যেনো ভেলাটা দূৰে চলে গেলো—আৱ দেখতে
পৰয় না আনন্দ। চোখে তাৰ গাঢ় অঙ্ককাৰ ॥

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମା ହାଲିମା କାନ୍ଦିର

ବାଇରେ ଦରଜାଟା ତଥନେ ଥୋଳା । ଆର ସରେର ମଧ୍ୟେ ତଥନୋ ଏକା ବଙ୍ଗେ ଆଛେ ହାଲିମା । ଶୀର୍ଷ, ସଙ୍କ ସଙ୍କ ହାତ ଛଟେ ଟେବିଲେର ଓପର ରେଖେ ଘାଡ଼ ନିଚୁ କରେ ତାକିଯେ ଆଛେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିତେ । ଏକଟା ନିର୍ବାସ ଲେ ଫେଲିଛେ ନା । ଦୂରେ ବୈ ଦରଜାଟା ଥୋଳା ରହେଛେ—ଏଥାନେ ବସେ ଯେଦିକେ ତାକିଯେ ବାଡ଼ିର ଉଠେନଟା ଦେଖାଯାଉ, ଏକବାର ଦେଇକେ ତାକିଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛେ ନା । ଯାବେ ଯାବେ କାଳୋ ଚଳଞ୍ଜଳୋ ଲେ ସରିଯେ ଦିଲୋ ଯୁଥେର ଓପର ଥେବେ । ଶାଡ଼ିର ପାଡ଼ ଦିଯେ ଘାମ ଯୁଛେ ନିଲୋ କପାଲେର । ତାରପର ଦେଯାଲେର ଏକଦିକେ ରାଖି ହୁଟକେଶଟାକେ ଟେନେ ତୁଳେ ରାଖି ଟେବିଲେର ଓପର । ବୀ ହାତେ ଶାଡ଼ିର ଝାଚଟା ଚେପେ ହୁଟକେଶେର ଓପର ତାର ସ୍ପର୍ଶେର ଦ୍ୱାରା ବୁଲିଯେ ଦିଲୋ ।

ଆଖ ଘଟା କେଟେ ଗେଛେ, ତୁ ଜାମାନେର ଦେଖା ନେଇ । ଏକା ଏତକ୍ଷଣ ବଙ୍ଗେ ଧାକାଯ ଯେନ ଶୁଭତାର ପରିଧି ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ଆରୋ ବେଡ଼େ ଗେଛେ । ଏତକ୍ଷଣ ଏକଟି କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ବଲେ ଲେ ଯେନ ହାପିଯେ ଉଠେଛେ । କିନ୍ତୁ ଯନେର ଭେତର କୋନ ମନ୍ତ୍ରାପ ଲୁକିଯେ ଏଥାନେ ଆସେନି ହାଲିମା । ହାଲିମା ଶୁଦ୍ଧ ଆଜ ରାତ୍ରିର ମତୋ ଏକଟୁ ଆଶ୍ରଯ ଚାୟ । ପୁରନୋ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସ୍ଵୀକାର ନା କରେ ନିକ୍ତ, ଏକ ରାତ୍ରିର ଆଶ୍ରଯ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମତୋର ଅଧିକାର କି ଆଉ ତାର କାହେ ନେଇ ?

ବୀ ହାତେ କୋମରଟା ଚେପେ ଧରେ ଉଠେ ଦୀଡାଲେ । ହାଲିମା । ଛିପଛିପେ ସବୁଜ ଏକଟି ଗାଛେର ପାତାର ମତୋ ନଡ଼ଲୋ ତାର ଶରୀର । ତାରପର ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ଯନେ ଶାହସ ସଂକାର କରେ ଦରଜାର କାହେ ଏସେ ଦୀଡାଲ । ସରେର ଶୁଭତାର ମତୋ ବାଇରେ ଉଠାନେ ଶୁଭତା । କିରେ ଏସେ ଆବାର ଚେହାରଟାଯ ବଙ୍ଗେ ପଡ଼ି ହାଲିମା ।

ଶେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମାନ ଏଲୋ । ହାଲିମାର ଯନେ କୋନ ଇଚ୍ଛାର ସବୁଜ ଆଲୋ ଜେଲେ ଦିତେ ନା କ୍ରୀଗତମ ସଂକାନାର କର୍ତ୍ତରୋଧ କରନ୍ତେ ତା ଲେ ବୁଝଲୋ ନା ।

ଚେହାର ଛେଡ଼େ ଉଠେ ଦୀଡାଲ ହାଲିମା । ସଙ୍କ ସଙ୍କ ଯୋଗେର ମତୋ ଆଙ୍ଗୁଲଞ୍ଜଳୋ ଘଟକାତେ ଘଟକାତେ କିରେ ତାକାଳେ ଜାମାନେର ଯୁଥେର ଦିକେ । ତାର ଲେ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଯେନ କେମନ ଅଶାହୀତା ଝୁଟେ ଉଠିଲେ ଚାୟ । ଯେନ ସମ୍ପର୍କ ତରଳତା ହଲହଳ କରେ ଉଠିଲେ ଚାହେ ହାଲିମାର ଯନେ ଏଥନ ଜାମାନକେ ମେଥେ । କାଳୋ କଠିନ ଯୁଥେ ହାଲିମାର ଦିକେ ତାକିଯେ କୁଳ କୁଞ୍ଚକେ ଜାମାନ ବଲ୍ଲ, ତୁମି ! କଥନ ଏଲେ—

লেই কখন এসে বলে আছি। তোমার চাকর ছোকরাকে দিয়ে খবর দিলাম, সে যে গেলো আর ফিরে এলো না।

জামান কোন কথা বলল না। একটা কঠিন ক্ষক্তাম মুখের বেধাঙ্গলো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার। টেবিলের উপর রাখা স্টকেশটার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেউ দেখলে ভাববে, মেন ছঁজন অপরিচিত যাজ্ঞী হঠাতে কোন ছোট স্টেশনের অপরিসর একটি ওয়েটিং রুমে মুখোমুকি দাঢ়িয়ে আছে। কোন কথা তাদের বলার নেই।

পাথরের মত নিঃশব্দ মুখ ভুলে আবার তাকালো হালিমা। সে মুখের ছলহলে ছায়ায় কঙ্গ বিলাপ যেন অশাস্ত্র হয়ে উঠেছে।

স্টকেশের উপর কাপা কাপা হাত দুটো রেখে বলল, কথা বলছনা যে?

হঠাতে কি মনে করে এলে, আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না—জামানের গলার স্বর হঠাতে গম্ভীর হয়ে উঠে।

আমি এলাম, আসতে হোল বলে, আর শ্বারলাম না, তাই। নিষের মনের সঙ্গে যেন যুক্ত করে আর পারলো না হালিমা। তবল একটা মানিতে তার কঠরোধ হবার উপক্রম হোল। এত ক্ষীণস্বরে তার কথা উচ্চারিত হোল যে জামানও তা ভাল করে শুনতে পেলো না।

কি বললে?

হালিমার মনের বাতিটুকুও যেন এবার নিবে যাবে। একটা দমকা আশঙ্কার প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কাপা কাপা গলায় তবু বলল হালিমা, আমাকে আসতে হোল, না এসে আমি পারলাম না। কিন্তু তোমার কাছে আর কিছু আমি চাই না। চাই শধু আজকের রাত্রির মতো একটু আশ্রয়। তারপর কাল সকালে যেদিকে ছচেখ চাষ সেদিকে চলে থাব। আমার জগ্নে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তার মানে? আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জামান হালিমার মুখের দিকে। ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের পাতার মতো নড়লো আবার হালিমার শরীর। আর বাইরের পৃথিবীতে বিকেল ফুরিয়ে না যেতেই হঠাত-নামা অক্ষকার তাদের ঘরকে পর্যন্ত আচ্ছান্ন করে ফেললো।

নিঃশব্দে কোন কথা না বলে জামানের দিকে পিঠ কিরিয়ে দিলো হালিমা। শাড়ির ঝাঁচলটা সরিয়ে নিলো। তৃষ্ণার শুভ্রতা বিলিক দিয়ে উঠলো সেখানে। কে যেন সেখানে হিংস্রতাৰ ঝাঁচড় কেঠেছে।

লেখেছ ? এই পিঠের উপর আমাৰ মাগজলো লেখেছ। এজলো কিসেৰ
মাগ বুৰতে পাৰ ? অনেক সহ কৰেছি, আৰ আমাৰ শক্তি নেই। যতবাৰ
লে আমাকে চাৰুক মেৰেছে, ততবাৰ আমি আমাৰ মনেৰ সকলে শুক্ৰ কৰেছি।
কিন্তু আমাৰ মনেৰ সকলে আমি হেৱে গেলাম আমান।, তোমাৰ কাছে
অবস্থা আমাৰ কিছু চাওয়াৰ নেই। আজ রাত্রিৰ যত একটু আশ্রম চাই—

মূখ কালো কৰে উঠে দাঢ়িয়ে বলল আমান, কিন্তু এটা কি তুমি ভাল
কৰলে হালিমা। সহেৰ গুণে অসাধ্য সাধন কৰা যায় তা তো তুমি আন।
মাহয় আৱো কিছুদিন দেখতে ? কিন্তু—

কোন চিষ্টা আৰ নয়, আমি এখন অটল আমাৰ হিৱ বিবেচনায়, কেউ
আৰ আমাকে যত খেকে টলাতে পাৰবে না।

বেশ ।

আমান তাকিয়ে দেখলো সেই সন্ধ্যাৰ ক্ষীণ আলোয়, বীকা ছায়ায়, একটা
নিখাস উঠল হালিমাৰ ভেতৰ খেকে ।

নিখাসেৰ ঘৰে সে আবাৰ বলল, আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল
মকালে চলে যাব ।

কোথায় যাবে ?

জানি না ।

তাৰপৰ আৰ কোন কথা হোল না তাদেৱ। ঘৰেৰ বাইৱে এসে অনেকক্ষণ
বাবালায় দাঢ়িয়ে রইল আমান। তাৰপৰ জানালা দিয়ে উকি দিলো
পাশেৰ ঘৰে। ছোট একটি ছেলে উয়ে আছে। নবজাতকেৱ কাঙা খেমে
গেলে যে ভাৰে শিশু শুমিয়ে ধাকে বিছানায় শায়েৰ কোলেৰ পাশে, ছেলেটিও
তেমনি ঘেন ঘৰে আছে বিছানায়। আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পৱেই চোখ শুলে
গেল ছেলেটিৰ। মন্ত বড় হোল তাৰ চোখছটো, উম্মাদেৱ মতো ঘূৰে ঘূৰে
হিৱ হলো আমানেৰ মুখৰ উপৰ ।

গলা দিয়ে আওয়াজ বেঙ্গলো তাৰ, আৰু ?

এই যে আমি, মণি। বিছানাৰ কাছে এসে মাথাৰ উপৰ হাত রেখে
আমান আবাৰ বলল, এই যে এখানে আমি, আৰু ।

আমাৰ ভয় কৰে আৰু ।

ভয়, কিসেৰ ভয় ? আমি তো এখানে আছি, সাজনাৰ ঘৰে বলল
আমান, কোন ভয় নেই আৰু ।

ছেলেটি আবাৰ আস্তে আস্তে চোখ বুজলো । কি রকম ভাষাইন

বিবর্ণতা তার সে চোখে। যেন এইটুকু নান্দনিক আবার সে শুক হয়ে গেলো। জামানের প্রতিটি কথার প্রিফেল ছেলেটির প্রাণে যেন উঞ্জালের বিহুৎ চমক দিয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে হাত ছুটো সরিয়ে নিলো জামান। ধীর মহল পারে সেই দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো। যেখানে চোখছুটো হিঁর হয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে। সে চোখের ভাষা ছিল এককালে তার কাছে কত জানা। এখন আর নিখালের পতন নেই সে শব্দীরে। তার মুখের সেই একটি মাঝ ভঙ্গিই আজ শুধু শৃঙ্খল হয়ে ঝুলে আছে দেয়ালে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিখাস ফেললো জামান। এখন শুধু শৃঙ্খল আর হতাশা। শুধু শৃঙ্খল নিয়ে কি যাহুষ বেঁচে থাকতে পারে? মনে মনে জামান উচ্চারণ করলোঃ পারে। পারে। এ সংসারটাই শৃঙ্খল-মাঝে পরিণত হবে একদিন। যে মাহুষের অতীত নেই, তার বর্তমানও নেই। কিন্তু সে রকম যাহুষ কে আছে এ সংসারে?

রাহেলার ছবির দিকে যতবার তাকাচ্ছে জামান, ততবার যেন তার সেই অতীতটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তাড়া করে আসলো তাকে। একবার অসাবধানেই, নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে বিক্ষ বিড় করে বলল, রাহেলা, তোমাকে ভালবাসবার আগেই আরো একজনকে আমি ভালবেসেছিলাম। তা কি আমার অপরাধ ছিল? ভালবাসার অর্থ কি আমি তা বুঝতে পারিনি তোমাকে ভালবাসবার আগে। তোমাকে দেখার আগে আমার ভালবাসার কোন অস্তিত্বই ছিল না, বিখাস কর। বিখাস কর, তুমি যেরকম যুক্ত করেছিলে যুক্ত্যার সঙ্গে, কিন্তু যুক্ত্য তোমাকে টেনে নিয়ে গেছে ঘুমের মতো, আমাকেও কি আনার কেউ সেরকম—

ছেলেটি আবার আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। মন্ত বড় হোল তার চোখ ছুটো, উঞ্জাদের মতো ঘূরে ঘূরে হিঁর হোল আবার জামানের মুখের ওপর।

গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেঙ্গলো, আবো।

কি মণি।

আমি কবে ভাল হব আরো? কবে আমি ইঠতে পারব?

এই তো আর বেশি দেরি নেই। শিগগিরই তুমি ভাল হয়ে যাবে মণি।

মুহূর্তের অজ্ঞে বোধহীন মণির চোখ উজ্জল হোল। ইচ্ছে হোল তার সে কথা বিখাস করতে। ভাল হয়ে উঠার সেই আশ্চর্য অপার্থিব মুহূর্তের কথা জ্ঞেবে হেসেই ফেলল মণি। মণির ঠোঁটে হাসি দেখে চোখ ছলছল করে

উঠল জামানের। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেতরটা ঘোচড় দিয়ে উঠল তার।
সে মিথ্যে কথা বলেছে। কোনদিন আর ভাল হবে না শপি। আর কোন-
দিন সে ইঁটিতে পারবে না। এই পক্ষ, ভাবাঙ্গাঞ্জ জীবন নিয়ে তাকে
চিরকাল শয়ে খাকতে হবে বিছানায়। শয়ে থেকে তাকে চিরকাল ক্ষীণ
আলো-জ্বলা একটি নোকোয় ভেসে বেড়াতে হবে অঙ্ককারের সম্মুছে।

রাতে অঙ্ককারে বারান্দায় বসে জিজেস করল হালিমা, রাহেলা মারা
গেছে আজ কত বছর হোল ?

চার বছর।

আচ্ছা, মণির চিকিৎসা করেও কিছু হোল না ?
না।

আমার ভীষণ চুখ হচ্ছে। ছেলোটি কত অসহায়, মা-মরা সন্তানের কি
যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা ভূমিও বুঝতে পারবে না। ভূমি আবার কেন বিয়ে
কর না ?

বিয়ে ? কে যেন একটা উভেজনা আবার ফিরিয়ে দিলো তার বুকে।
ফিরিয়ে দিলো আশ্চর্য অপার্ধিব সেই মুহূর্তকে, মনের ভেতর তাকে চলাফেরা
করতে দেওয়ার ফুসলানিতে।

ঠোটের ফাঁকে একটু আলোর ক্ষীণ আভা ফুটিয়ে জামান বলল, বিয়ে,
কাকে বিয়ে করব। বিয়ে করে আবার কি হবে ? বরং এই ভাল আছি।
আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা করে নেই। এই ভাল আছি। মণি আর
আমি। শপিকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি হালিমা।

মেটুকু রঙ আবার হঠাতে লেগেছিলো জামানের মনে, তা মিলিয়ে গেলো।
চোখের পলকে আবার ছায়া এসে পড়লো তার মুখে বিষাদের মেঘের। আস্তে
আস্তে সে ছায়া ছড়িয়ে পড়লো মুখের ওপর। আর হালিমা, যে হালিমাকে
একদিন নাকি ভালবেসেছিল জামান, এখন তার দিকে ফিরে তাকাবার মতো
মনের অবস্থা তার আর নেই। এ যেন নববধূর মতো ঘোমটা টানা ছোট
একটি মধ্যরাত্রির স্টেশনে হঠাত-দেখা তাদের পরিচয়। চোখের সামনে
কাপতে কাপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে যাবে। যাঠে যাঠে গাছপালার
চেহারা ফুটে ওঠার আগেই তাদের কথা শেষ হয়ে যাবে। এ অসহ বাত্রিকে
ধরে রাখতে পারবে না হালিমা।

হাত ছুটে শৃঙ্খে তুলে একটা অন্তত সন্তানকে তাড়ানোর ভঙ্গি করে
সে বলল, বিয়ে না কর আমার কি ! সকাল হোলেই আমার সঙ্গে

শেষবারের মতো দেখা হবে। তারপর হজন হস্তিকে চলে যাব। আর কোনদিন হয়ত দেখা হবে না। হঠাৎ-নামা এক স্টেশনে ক্ষণিকের ধার্জীর মতো তোমার সঙ্গে দেখা হোল, অনেককাল পরে, তারপর আবার ছাড়াছাড়ি—

আমরা কত অসহায় হালিমা। পৃথিবীর কাছে যেন আমরা আর্ত শিশু। আমাদের ভাগ্যে যা আসে তা অমোৰ নিয়মে আসে। তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কার সাধ্য আছে। যে ভাবে তুমি এসেছ সে ভাবেই তোমাকে চলে যেতে হবে, হালিমা।

আমি কোন নিয়ম মানি না, ভাগ্যের আক্ষলনকে আমি স্বীকার করি না। একটা অস্তুচারিত উত্তেজনায় গলা কেঁপে কেঁপে উঠল হালিমার, নিয়ম মেনে চললেই আমার ওপর ঝুলুম-করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি নিয়ম মেনে চললেই আমি অস্থির হয়ে উঠি, আতঙ্ক, ভয়, ঘৃণা অভিয়ে ধরতে চাই আমাকে আঁষ্টেপুঁষ্টে, তা তুমি জান না ?

আমান যেন বসে আছে তার অদৃষ্টের মুখেছুখি। গলা দিয়ে তার আর কথা উচ্চারিত না-হোক, সে যেন কিছু অস্থমান করতে পারে। অস্থমান করতে পারে তার আর এক লগ্ন আসব। রেই অলৌকিক লগ্ন আবার একটি স্থির রাত্রির বুকে এসে ধমকে দাঢ়াতে চায়। হাতছটো দিয়ে একটা খসখস আওয়াজ করল জামান। সামনে বসে থাকা অস্থমনক কাউকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে শোকে যে ভাবে শব্দ করে, তেরেনি হাতছটো দিয়ে চকমকির মতো ঠুকলো। তারপর উঠে দাঢ়িয়ে বলল, তা তো তুমি ভাল করেই জান—

এই হালিমার কথা বলতে গেলে কোন কথাই শেষ হবে না। কি করে এই হালিমাই একদিন তার নিজের আয়ত্তের বাহিরে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল তা জামানই আজ ভূলে গেছে। হয়ত হালকা বংদাৰ তুচ্ছতা নিয়েই তার জীবনে একদিন এসেছিল হালিমা। তখন আমানের বয়স আৱ কত হবে। যে বয়সে একটি পুৰুষ কোন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ থোকাকেই প্ৰেম বলে ভূল করতে চায়, সে বয়সেই তার জীবনে এসেছিল হালিমা। কিন্তু কি আশৰ্দ্ধ, জামান নিজে ভেবেই আশৰ্দ্ধ হয়, হালিমাকে সে কি করে সেদিন ভালবাসতে পেরেছিল। হালিমার জীবনে যা একমাত্র ছিল, তা তার বংদাৰ তুচ্ছতা। হালিমার জীবনে কতবাৰ প্ৰেম এসেছে আবার তা কিন্তু গেছে আধাতেৰ মেঘেৰ মতো। আমানেৰ

জীবনের তটভূমিতে রেখাপাত করতে পারে নিম্নে প্রেম। যখন সে প্রায় হালিমাকে ভুলতে বসেছে, যখন হালিমা প্রায় স্বত্ত্বতে পরিণত হতে চলেছে আর আমান উঠে এসেছে সমাজের সেই ছোট সক চূড়ায়, তখন রাহেলাকে বিয়ে করে বসল সে।

কেউ কেউ সেদিন কঙগার চোখে দেখেছিল হালিমাকে। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করেছিল; কি করে আমান পারল তা, হালিমাকে কাঙাল করে দিতে কি করে সে পারল। কিন্তু জীবনের শুরু যে তাতে শিথিল হয়ে যায় না, বরং প্রেমের উদ্দেশ্য হয় নতুন নতুন, রহস্যপূরীতে, তা জানত হালিমা। শধু কৌতুহল বাড়িয়ে দেয়ার চাবিকাট্টি বের করে নিতে হয় সন্তর্পণে, তারপর সেই কঢ়ি, সেই আশ্চর্য ভঙ্গির কলা-কোশলের অভাবনীয়তা নিয়ে মন্ত্রের মতো কাছে টানতে হয়। কেন না, প্রেম খানিকটা তৃচ্ছ, কিছুটা মহান। তার আকর্ষণ চুম্বকের মতো তাদেরই কাছে টানে বেশি যারা ভীক, অসহায়, বয়স না বাড়তেই যারা আমী-স্তৰীয় সম্পর্ক পাকাপাকি করে ফেলতে চায়। হালিমা সে রকম কাঙাল তাই কোনকালেই ছিল না। বরং আমান সেদিন তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলতে যেন সে নিখাস ছেড়েই বেঁচেছে। অন্তত সেদিন তার মনে হোয়েছিল তা-ই।

তারপর একদিন হালিমা প্রায় নিঃশ্ব হয়ে গেলো। তা সে নিজেই ভাল করে জানত। জানত সবাই শেষ হয়ে যায়, প্রতিদিন বেঁচে থেকে আর প্রতিদিন নতুন অস্থানে করে, সবাই শেষ হয়ে যায়। আর একদিন সে আনল, তার আর কিছু দেয়ার নেই অথচ আস্তা তার তখনো অশাস্ত। আর যখন সে প্রায় ফুরিয়ে গেছে, কেউ আর তাকে নিয়ে কানাধূয়া করছে না, তখনো হালিমা ভেবে আশ্চর্য হয়েছে। স্বত্ত্ব বলতে তার কিছু নেই। জীবনের খাতা তার শুরু। শেষ পর্যন্ত এটাই তার জীবনের বড় সত্য হোল জীবনে যা কিছু করা যায়, যা কিছু ভাবা যায়, তার সবই অর্থহীন। তারপর নিঃসঙ্গত যখন আরো নিবিড় হোয়ে উঠতে লাগল, শেষবারের মতো হালিমা পড়লো প্রেমে। কঢ়িতে শেষবারের মতো কামড় দেয়ার মতো। সে প্রেম তাকে একেবারে আশ্রয়ের সন্তুষ স্বর্ণে পৌঁছে দিলো। কিন্তু এই বারো বছরে যেন হালিমা আরো ঝাল্ল হয়ে পড়েছে। অঙ্গুত ঝীগাস্তরে তার জীবনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে আছে বলে সে ভেবেছে। বারোটি বছরে যেন তার অস্ত্র

সোনালী স্থখ পালিয়ে গেছে একেবারে তার জীবন থেকে। হালিমা প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল, তার জীবনে আর কোন উত্তাপ নেই, আশা নেই, হ্রদপিণ্ড নেই।

আমি প্রায় মরে যাচ্ছিলাম, কিস্ কিস্ আওয়াজে কথাগুলো মনে মনে বিড় বিড় করে, আমার বিতীয়বার মৃত্যু হোক সে-ই আমার ভাল।

দুরজা খুলে পা টিপে অঙ্ককারে পাশের ঘরে গেলো হালিমা।

নিঃশব্দ অঙ্ককার ঘর, আর জানালার ক্যাকাশে নীল আলো। মণি অংশোরে ঘূর্মচ্ছে বিছানায়। এত নরোম, এত স্মৃতি এই রাত্রি যে হালিমাৰ মনে হোতে লাগল সে যেন তা অহুভব করতে পারছে। দিনের আলো যেন তার ভগ্নেই ফেবল অপেক্ষা করে আছে, কখন সকাল হবে, আর শেববারের মতো হবে তার সঙ্গে দেখা। দীর্ঘ রাত্রি যেনে কুকড়ে শুয়ে আছে এই ঘরের অঙ্ককারে। কিন্তু এই অঙ্ককারকে যদি হ্রাসের মুঠোয় ধরে রাখতে পারতো হালিমা। অন্তত কিছুদিনের জন্য তারপর আবার যদি সে তাকে ছেড়ে দিতে পারতো। রাত্রি শিরশিন্দি করছে হোওয়ায়। জানালার আলোতে মণিৰ মূখের দিকে তাকিয়ে দেখলো হালিমা। যেন একটি স্বধে-ডোরা মুহূর্ত, হালিমা একেবারে শুক হয়ে গেলো।

স্বর্ক চেতনামূলক আঙুলগুলো দিয়ে মণিৰ দেহ সম্মেহে অহুভব কয়ে সে দেখতে লাগল। কঙ্কনাস হয়ে গেলো হালিমা স্বর্কে। তারপর মণি যথন ঠোঁট কথা বলতে খুলছে সেই অঙ্ককারে কারো অন্তরঙ্গ স্পর্শে, হালিমা তাকে তার শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে ধরে বলল, মণি আমি তোমার মা, আবার কিরে এসেছি।

বাইরে তারপর ধীরে ধীরে অঙ্ককারের পাতলা ঘোমটা খুলে যেয়ে বের হোয়ে এল আরামের উফতা। এই অসহ রাত্রিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না হালিমা।

ঘরের কেতুর তুকে প্রথমে একটু চমকে উঠলো জামান।

সূক্ষ্ম কুঁচকে বলল, একি, তুমি এখানে ?

হ্রাসে মণিকে জড়িয়ে ধরে হঠাত আনত শরীরে হালিমা বলল, মণিৰ জন্য আমার ভাবি কষ্ট হচ্ছে। আর ধাকতে পারলাম না। ওর কষ্ট আমার বলে মনে হচ্ছে। হালিমাৰ চোখে হঠাত আঘাপনসম্ভ হাসিৰ চমক মনেৰ হঢ়গাকে আরো নিবিড় করে দিলো জামানেৰ।

হাত ছট্টো শৃঙ্গে তুলে রেখা আকার ভাসিতে সে অকুণ্ঠি কৱলো। যেন সে কোন অস্তত স্থচনা দেখে জরু পেঁচছে।

বিছানার কাছে এসে দাঢ়িয়ে বলল, মণি মণি, আৰুৱা।

আস্তে আস্তে মণিও চোখছটো খেলে তাকালো। মন্ত বড় হোল তাৰ চোখছটো, শাস্ত আৰু নীল, গভীৰ সমুদ্ৰেৰ মতো। উন্নাদেৱ মতো নৱ, এবাৰ স্থৰ্থ-মঠতাৰ ঘূৰে ঘূৰে ছিৱ হোল তাৰ চোখছটো জামানেৰ মুখেৰ ওপৱ।

বলল, কি আৰুৱা?

জামান কি বলবে হঠাত ভেবে পেলো না। মণিৰ চোখছটো দেখে সন্দেহেৱ আৰ্তনাদ মনেৱ ভেতৱ শুমৰে মৱতে লাগল তাৰ। কি বলবে জামান সে মুখকে? এ মুখেৱ যেন কোন অভীত নেই, স্মৃতিৰ ভাৱে কোন-কালে পীড়িত ছিল না ছেলেটি। ছেলেমাঝৰ তাই ওদেৱ লোকে বলে।

হাত ছুটো বাড়িয়ে দিয়ে জামান বলল, ঘূৰ ভাঙল আৰুৱা?

ইয়া। এই ঢাখ আৰুৱা; এ কে। আমাকে এ খুব ভালবাসে। বাব্রে আমাকে কত আদৰ কৰেছে এই মা। জান ও কি বলে, আমি নাকি ভাল হয়ে যাৰ, যদি ওকে মা বলে ভাকি। আমাৰও মনে হয়, আমি ভাল হোৱে গেছি, তাই না আৰুৱা?

জামানেৱ কংপিণ যেন আৱো সন্তুচিত হোৱে গেল। বিক্ষারিত হোৱে রঞ্জ যেন ছড়িয়ে পড়লো তাৰ চোখে। প্ৰতিটি মুহূৰ্তেৰ পদধৰনি যেন শুনতে পাচ্ছে জামান। অলস একটা ভজিতে হালিমাৰ দিকে তাকিয়ে বলল, সকাল হোৱে গেলো। এবাৰ তোমাৰ ছুটি হালিমা। সকালেৱ ট্ৰেই তোমাকে ধৰতে হবে বোধহয়। তোমাৰ দেৱি হোৱে থাচ্ছে।

কোথাও় ধাবে বাবা? মৃত নৱোম চোখে তাকালো মণি একবাৰ হালিমা আৱ একবাৰ জামানেৱ দিকে।

জামান শাস্ত গলাও বলতে চেষ্টা কৰল, কোথাও না।

ছেড়ে ধাবাৰ মুহূৰ্তটি নিষ্ঠিৰ! এই অসহ বাতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পাৱলো না হালিমা। তাকে যেতেই হবে, ছেড়ে যেতেই হবে শেষ পৰ্যন্ত তাকে। আৰু তাৰ পৱাজ্বয়েৱ বিভীষিকা দেখতে হবে চোখে। জীবনে জামান আৰু একবাৰ তাকে ঠকালো, এবাৰ চিৱকালেৱ মতো। কঠিন, নিষ্ঠিৰ অস্কাৰেৱ বুকে তাকে ঠেলে দিয়ে জামান এবাৰ তাকে ঠকালো। হালিমাৰ সমস্ত শ্ৰীৱৰ্ষা যেন ঠাণ্ডা হোৱে অমে গেল সে কথা ভাবতেই। একটু সে নড়তে পাৱলো না, উঠে বসতে পাৱলো না, নিঃস্বতাৰ অস্তৱ ভাৱে গেলো তাৰ।

নিঃস্ব, কফণ, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, যেতে আমাকে হবেই।

আৱ হয়ত কিছুক্ষণ, আধ বটা কিংবা এক বটা। তাৱপৰ ছাড়াছাড়ি।
তাৱপৰ দুজন আৰাব দুলিকে। কিন্তু আমাৰ শুধু ভাবনা এই মণিৰ অস্তে।

উঠে শাড়িৰ ভাঁজটা ঠিক কৰে নিতে নিতে মণিৰ দিকে কিৰে তাৰালো
হালিমা। আৱ মণি কিৰে তাৰালো হালিমাৰ দিকে। মণিৰ চোখে যেন
শুশি বিলিক দিয়ে উঠছে। আশৰ্ব উজ্জল চূলেৰ ভাৱ নিয়ে হালিমা ইটু
ভেঙে মণিৰ পাশে বসে পড়লো। দুই দীৰ্ঘ বাহু বাড়িয়ে দিলো মণিৰ দিকে।
মণি জড়িয়ে ধৰলো তাকে। সক বিশ্বে আমান তা তাৰ্কিয়ে দেখলো।

মনে মনে হালিমা ভাবল, কতক্ষণ আৱ, এবাৱই শ্ৰে। এবাৱ বিচ্ছদ
শ্ৰেষ্ঠবাৱেৰ যতো। বাইৱে শীতেৰ হলদে রঢ়ুৱকে মনে হোল যেন কালিৰ
আচড়, কালো। যেন বিশাল অক্ষকাৱেৰ কেজ্জে সে দীড়িয়ে আছে। হঠাৎ
তাৱ মনে হতে লাগল সে মৃছা যাবে। আৱ ঠিক সময়ই আমান এসে
দীড়াল তাৱ পাশে। তাকে প্ৰায় ধৰে ফেললো। তাকে বাঁচালো। সক
সক আড়ুলঙ্গলো নিজেৰ হাতেৰ মুঠোৰ মধ্যে এনে চাপ দিলো। হালিমা
কিৰে পেলো স্বৰ্গেৰ নিশ্চিত আভাস। অল্লভবেৰ পূৰ্ণতা যেন সে কিৰে
পেলো আৰাব।

তোমাৰ যাওয়া হ'বে না, হালিমা। কি জাহ কৱলে তুমি মণিকে।
মণি ভীষণ কানছে। এ অবস্থায় কিছুতেই তোমাৰ যাওয়া হতে পাৱে না।
তুমি জান ওকে আমি প্ৰাণেৰ চেয়ে ভালবাসি। জামানেৰ মুখ ফ্যাকাশে
আন, যোমেৰ যতো। কপালে এসে ছড়িয়ে পড়েছে চুল, চোখ তাৱ হিৱ
যেন একটা ভয়েৰ কিছু দেখে ফেলেছে।

মান হেসে বলল, হালিমা। মণিৰ অস্তে দেখছি তোমাৰ চোখে ঘূম
নেই—

সত্যি আমানেৰ চোখে ঘূম নেই, ঘূম এলো না। একি হোল তাৱ?
যজ্ঞেৰ বীজে আৰাব কোন কামনা উভপু হয়ে উঠতে চাচ্ছে তাৱ? কঠিন
নিষ্ঠুৰ উভপু স্থণা জয় কেন নিতে চাচ্ছে তাৱ মনে? কেন? দৱজা ঠেলে
ভেতৱে গেলো আমান। ঘৰে নিঃশব্দ অক্ষকাৱ, উভাল সম্মুহৰ যতো।
সমস্ত শ্ৰীৰ তাৱ কামনায় কেঁপে কেঁপে উঠল। হালিমাৰ সতা আচছু হয়ে
পড়ে আছে বিছানায়। সমস্ত শ্ৰীৱটা ঠাণ্ডা হয়ে আৰাব অয়ে গেলো
আমানেৰ। হালিমা কি সত্যি তাকে ভালবাসে? যিখ্যে কথা, প্ৰতাৰণা,
চিৰকাল সে প্ৰতাৰণা কৰে এসেছে সকলেৰ সঙ্গে। একটা কঠিন নিষ্ঠুৰ স্থণা
অয় নিলো আমানেৰ মনেৰ ভেতৱে। ভালোবালা কিছুটা তুচ্ছ, কিছুটা মহান

তার কাছে। তার সত্তা সম্পূর্ণভাবে কাউকে ভালবাসে না। নিঃশব্দে হালিমার বিছানার কাছে এসে দাঢ়াল আমান। শুমক্ষ শরীর নিষাদে ওঠা-নামা করছে হালিমার। আমানের মনে হোল হালিমার প্রতিটি নিষাদে ছলনা আর অবিষাস, স্থপা আর নিষ্ঠুরতা। তার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পেলো। একটা ক্ষুধিত যাতনা সে দেখতে পেলো রহস্যময় স্থানের অন্তরে। তার মাথার উপর হাত রাখতেই জেগে গেলো হালিমা।

বিস্ময়ের ঘরে শুধাল, কে ?

আমি। আমাকে তুমি টেনে আনলে, এই রাত্তিরে। আমাকে তুমি না এনে ছাড়লে না।

হালিমা হাসলো, অঙ্ককারেও বোবা গেল তার হাসি।

বলল, সত্যি, আমি জানতাম তুমি আসবে।

চোখের ভুক্ত ছুটো কুঁচকে গেলো জামানের। তবু সে জড়িয়ে ধরলো হালিমাকে, ঠিক যে ভাবে একটি নেকড়ে তার শিকাইকে দাত দিয়ে কামড়ে ধরে। তারপর শাস্তি, প্রিন্স গলায় বলল জামান, তোমার মনে পড়ে হালিমা সেই দিনগুলোর ব্যথা। আর সেই রাত্রিগুলোর—যে রাত্রিগুলো ঠিক আজকের এই মুহূর্তের মতোই নিবিড় ছিল।

সব মনে পড়ে। সব আবার আমার মনে পড়ছে। আমি আবার ক্রিয়ে পেতে চাই হারানো স্বত্তিকে।

জামান জিজ্ঞেস করলো, স্বতি বলতে তোমার কিছু আছে হালিমা ?

ছিল। এখনো আছে। তা তুমি জান না। কোনদিন জানতে না। এখন বললেও আর তা বিবৰণ করবে না। তবু আমি বলছি, আমার স্বতি আছে, বিশ্বাস কর।

হালিমা নিজের হাত ছুটো দিয়ে আরো জোরে চেপে ধরলো জামানকে। যেন একটি অঙ্ক অহস্ত্যক কেবলি যাতনাকে পর্যাপ্ত করতে চাচ্ছে। আচ্ছাদের মতো হাত ছুটো দিয়ে আমানও তাকে স্বরের ভাবে তক্ষণ করে দিলো। হাত দিয়েই সে অহুভব করল হালিমার চোখ, ঠোঁট, চিবুক আর চুলের বিস্তৃতিকে।

আন্তে আন্তে কিন্দফিস আওয়াজে আবার সে বলল, আমার কাছেই আবার কেন এলে হালিমা ?

বিশ্বাস কর আমি ইচ্ছে করে আসিনি। আমাকে যে আসতে হোল, না এসে আমি পাইলাম না—বলতে বলতে যেন আবার চোখের পাতা কেপে উঠল হালিমার। পভীর শব্দস্থায় সে উক্তকা অহুভব করতে লাগল জামানের।

ଆର ଆମାନେର କଠିନ ଆଙ୍ଗୁଳଙ୍ଗୋ ଥୁଁଜେ ବେଡ଼ାତେ ଲାଗଲା ହାଲିମାର ଚିର୍କ,
ଟୌଟ, ତାରପର ହାତ ଛଟୋ ହିର ହସେ ଗେଲ ଏସେ ଗଲାର କାହେ । ନିଃଶ୍ଵର,
ଶାନ୍ତ ମୁହର୍ତ୍ତର ଉଦ୍‌ବରତା ଦିଯେ ତାର ସେଇ ହାତ ଛଟୋ ହିର କରେ ଦିଲୋ ହାଲିମାର
ହୃଦ୍‌ପିଣ୍ଡକେ ।

ଆର ଏକବାରରେ ହାଲିମା ନଡିଲୋ ନା, ହେଲିଲୋ ନା । ନିଧାସ ଓଠା-ନାମା
କରଲ ନା ତାର । ବିଶ୍ଵାରିତ ହାଲିମାର ଚୋଥ ଛଟୋ କୀ ବିକ୍ରତ ଏଥନ ।

ଇପାତେ ଇପାତେ ଉଠେ ଦୀଢ଼ାଳ ଜାମାନ । ସେନ ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ସେ
ଜିତେହେ । ଦେଇଲେର କାହେ ଛବିଟାର ଦିକେ ମରେ ଦୀଢ଼ାଳ ସେ । ତାର ମୁଖେର
ସେଇ ଏକଟି ମାତ୍ର ଭକ୍ଷିତ ଆଜ ଶୁଭ୍ୟ ଶୁଭ୍ୟ ହସେ ଝୁଲେ ଆହେ ଦେଇଲେ । ସେ ରାହେଲା
ଯୁଦ୍ଧ କରେଛିଲ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଯାକେ ଟେନେ ନିମେ ଗେହେ ଘୂରେ ମତୋ ।
ଅର୍ଥଚ ଲେ ଆଶ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିମାର ଆକର୍ଷଣ ଏଥନେ କି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ? ପ୍ରମେର ଦୃଷ୍ଟିତେ
ଅଞ୍ଚକାରେଇ ଛବିଟାର ଦିକେ ତାକାଲୋ ଜାମାନ ।

ହାଲିମାର ସମସ୍ତ କୌଣ୍ଶଳକେ ଜାମାନ ଆଜ ଶ୍ୟାର୍ଥ କରେ ଦିଯେହେ । ମଣି ଆଜ
ତାକେ ମା ବଲେ ଡାକତେ ପାରବେ ନା ॥

ନୟର ଶ୍ରୋତ ହାୟନ ଚୌଥୁରୀ

୧

କୋଥାଓ ସେନୋ ଏକଟା ସଡ଼୍ୟଙ୍କ ହୁଏ । ଆର ତାର ଧନିଶ୍ଲୋ ଦୂର ଥେକେ କାନେ ଆସେ । ଭାସମାନ କଥନଓ ବା ସମୁଦ୍ରେ, ଉଡ଼ୀନ କଥନଓ ବା ଗଗନେ, କର୍ତ୍ତା ବା ନକ୍ଷତ୍ରେ ଚୋରେ ଧିକି ଧିକି ଅଜ୍ଞାରେ ସମ୍ଭଳ । ମାରେ ମାରେ ହାୟା ଏସେ ବେସାମାଳ କରେ, ଧଣ୍ଡିତ ଅଷ୍ଟିତାଯ ମାର ନିଶୀଥର କୁଯାଶୀ ସେନୋ ବା, ଧନି ତଥନ ଆଡ଼ାଳ ହସେ ବହତା ନଦୀର ଗାନ ହସେ ଯାଏ । ସମସ୍ତ ଚେତନା ଜୁଡ଼େ ପାକ ଥାଇଁ ସୋଲା ଜଳ । ତେଣୀଯ ଛୁଟୁ ମଗଦିଗେ ଏକଟା ହୃଦୟର ଶୁର୍ଦ୍ଧ ଗଲା ନିଯେ ଏକବାର ନାମଛେ ବୁକେର କାହଟାଯ, ଉଠିଛେ, ଆର ପଚା ବାସି କାଳଚେ ହସେ ସାଗ୍ରହୀ ବଜେର ଛୋପମାରା ହାଡିକାଠେର ମତୋନ ଭର ମଙ୍ଗ୍ୟେର ବୀକାନୋ ପର୍ଦଟାର ଓପର ଛୁରି ଶାନାବାର ଶବ୍ଦ ଉଠିଛେ କ୍ରମାଗତ । ଏକଟା ରେଲ ଚଲେ ଗେଲେ ପର ଲାଇନେର ଓପର ଥେକେ କାଟାମୁଣ୍ଡ ଛାଗଲ ଛାନାର ଆର୍ତ୍ତନାମ, ଧୋଯା ଓଟ୍ଟା ଉଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ସାବଳା ଥାନେକ ମାଂସ ଗଡ଼ିଯେ ସାମେର ଚାତାଲେ ପଡ଼େ ଲାଲେ ଏବଂ ସବୁଜେ ଏକଟା ଜୀବନେର ଛବି ଆକେ । ମଡ଼କେର ମତୋନ ଶୁର୍କତା ଝୁଲାଛିଲେ ଏତୋକ୍ଷଣ ଏବଂ ଲାଲ ସବୁଜେର ସଂକେତ ଓଧାରେ ଟ୍ରୋଫିକେର ମାର୍ଖାଯ ରଦବଦଳ ହଲେ ପର କାହିନୀର ନାୟକ ପଥ ପେଯେ ଯାଏ । ଅଗଗନ ଜନଶ୍ରୋତେ ଏକଟା ହାହାକାର ପ୍ରବାହିତ, ବିପନ୍ନ ସାଧିର ଅକ୍ଷକାର ପରମ୍ପରକେ ଆହତ କରେ ଜିଜ୍ଞା ଏଭେଦ୍ୟର ଦେଯାଲେ ମାର୍ଖା ଭାଙ୍ଗେ । ଏହିଭାବେ ଏକଟା କୋଳାହଳ ଅସ୍ଥ ନେଇ ।

୨

ଚରିଶ ବର୍ଷରେ ପରଚାରଣାର ଧୂଳି ମାର୍କାରୀର ଆଲୋର ଫୁଟପାତ ଛେଡେ ପ୍ରସାଧନ ବିପନ୍ନିର ପ୍ରାଜଣେ ଛୁଟୁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭୂର୍ଜପତ୍ରେର ମତୋନ ଯୁବକେର ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଇଁ । ଭୂର୍ଜପତ୍ରେ ଯୋଡ଼କ ଖୁଲେ ଅତିପର ପ୍ରତିଧବନିତ ହୁଏ ହାଦଶ ଶତକେର ବାକାଳା ଦେଶ—ତୋ ବିହୁ ତରଣୀ ନିରନ୍ତର ନେଇଁ । ବୋହି କି ଲତ୍ତଇ ଏଣ ବି ଦେଇଁ । ହେ ତରଣୀ ତୋମାର ନିରନ୍ତର ମେହ ବିନା କି ଏହି ମେହେ ବୋଧି ଲାଭ ହୁଏ । ବୋଧି ଥେକେ ବୋଧିମର ଏବଂ ଶର୍ଦ୍ଦୋଧନ କପିଳାବନ ଗୋପା ଇତ୍ୟାଦିର ଚତୁର୍ବାର୍ତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ମନପବନେର ନାମେ ଜେଲେ ଏଲେ ପର ମାର୍ଖାର ଓପର ଥେକେ ନକ୍ଷତ୍ରେର ଆକାଶ

প্রদোষ বিপ্রহর এবং অপরাহ্ন কালের তাৎপর্য পাপ নির্মুক্ত হয়ে একটুকরে
ধ্যানের অমল স্তুতা হয়ে নেমে আসে পদতলে। একটা শেতল পাটি বিছিন্নে
যার এবং এতোক্ষণে ষড়যন্ত্রের দূরাগত ফিসফাস খনি পা টিপে টিপে হৈটে এসে
ক্রমশ প্রথর হয়।

৩

হে শহর! হে মা! তুমি আমায় ধারণ করো—সোচার চিৎকারের
কর্থাঙ্গলো তখন অভিজ্ঞান ছানিশ বছরের শোকের আড়ালে চাপা পড়ে
যাচ্ছিলো, যে বেদনা জন্ম নেয় ক্রমাগত শৈশবের অর্ধশাস্ত্রিত স্থানিকে ছাড়িয়ে
কৈশোরের টিফিন পুরিয়জ্জেব ঘণ্টার বিলীয়মান কারায় এবং কপালকুণ্ডলীর
বনমধ্যে তাঙ্গণ্য পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ এই অকলুক কৌমার্যের গান
এবং গান থেকে লাফিয়ে উঠা প্রেমের তুরঙ্গে। পঁচিশতম জন্মনিন্দি রোববার
ছিলো বলে রেসকোর্সের ঘাঠে বাজীর ঘোড়া ‘পা’ ফস্কে রক্তবমন করে এবং
কঙ্কিকার জুয়োড়ী দ্বিতীয়কে রক্ষিতার মতোন গাঢ়াগাল দেয়।

৪

নগরীতে প্রলিপি রাত ক্রমশ দ্রোপদীর শাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমার
বৃক্ষাভ সুনয়ের বিচ্ছুরিত আভা একটি রোমশ হাতের মূদ্রায় লম্বান আর তাতে
হত্যাজনিত রক্ত আস স্বেদ ইত্যাদির বিভিন্ন নথর বঁড়শির মতন ক্রমাগত
টানছে, নিশীথের বন্ধনকে কেবলি হৃষণ করছে, আর উম্মোচিত চিৎকারে এক
একটি আকস্মিক ফেটে পড়ছে পথচারী কুকুরের সিক্ত লালায়। গোলাকার
চৰু ঝাকচে কালো রাস্তার বধ্যভূমিতে আর তা মুহূর্তে ক্ষপাস্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে
মোহিনী-বজ্জ্বল ফাসে—এই মতে আকা হচ্ছে হত্যার নিপুণ চিত্ত। ভয়
নামক একটা শক্তকে নাম ধরে ভাকচত গিয়ে যুবার তৃকার্ত কষ্ট শৃঙ্খ গেলাসের
মতোন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কয়েকটি নিঃশব্দ উপর্যা অতঃপর প্রিয়নাম
ফোটাতে চাইলে সেই সব শক্ত নগরীর শীর্ষে শীর্ষে প্রেক্ষাগার থেকে বিপর্ণিতে
বহুবর্ণে জলে নিবে নীলকান্ত স্বপ্নের স্তম্ভে রক্তপাত ঘটিয়ে শেষতক কোকা-
কোলার বিজ্ঞাপন হয়ে ঝুলে রঘ সারারাত।

৫

আমার পঁচিশ বছরের শোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে অবৈধ শিকুর
স্থূল ঘোঁথে। সমস্ত সম্ভ্যার প্রান্তরে শেষাহীন শক্তির ভৱে ভীত যুবক পায়ে

ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁଦ୍ଧର ବେଦେ ଝାଲ୍ଟ ନଟରାଜେର ମତୋନ ହାହା ଖାସ ତୁଳେ ଧାବମାନ ହତେ
ଚେଯେଛେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଧନିର ଆଡ଼ାଳେ, ଅକ୍ଷ ଥେକେ ବରାତେ ପାରେନି ଭୂର୍ଜପତ୍ରେର
ଖୋଲୁସ ଆର ନିଷ୍ଠାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଗଲାର ପା ଚେପେ ହତ୍ୟା କରେଛେ ତୋମାକେ, ହେ ସନ୍ତାନ
ତୋମାକେ । ନିରପରାଧ ଶୈଶବ ଅର୍ଥନିମୀଲିତ ଘୁମଘୁଲିକେ ସଞ୍ଚେ ବଜ୍ଜ କରେ
ଦେଇ, ଶିତ ଭୋଲାନାଥ କେନେ ଓଠେନ ମା ଗୋ ବଲେ । ଦିଗନ୍ତ ଥେକେ ଦିଗନ୍ତେ,
ଧନିପୁଣେ, ସ୍ପନ୍ଦନେ ଏକି ଆକୁଳତା ଭୁବନେ ଭୁବନେ, ବେତ ବୋପେର ମାଛବାଙ୍ଗୀ ଥେକେ
କରମଚାର ଡାଳ ବେଯେ କେଯା ବନତୁଳସୀର ସମ୍ମତ ଆଶ ମବୁଜେ ହରିତେ ଲାଲେ ଲୋପାଟ
ହୟେ ଯାଏ ଅଞ୍ଚିତେ । ନରୀଟା ଆଡ଼ାଳ ହୟେ ମୁହଁ ଯାଏ ହୁଯାଶାୟ । ଆମାର କୁଳ
ବାଡ଼ିଟା କାକା ମାଠେର ମଧ୍ୟଧାନେ ଭାଙ୍ଗ ଧିଳାନ ବଡ଼େ ଓଡ଼ା ଦୂରମାର ବେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି
ନିଯେ ମାଧ୍ୟଧାନାପ ବାଂଲାର ମାଟୀର କାନାଇବାରୁ ହଞ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗ ଦୀତ ନିଯେ ହି ହି
କରେ ହାମେ । ହାଓୟାୟ ହିକା ତୁଳେ ବନ ବନ ଶର୍ବେ ବେଜେ ଓଠେ ରବିଠାକୁରେର
ଛବିଟା, ବୁକେ ତୋକୋନୋ କାଚେର ଛୁରି ବସିଯେ ମରଣ ରେ ତୁହଁ ମମ ଶାମ ମମାନ
ଗାୟ । ପତ ପତ କରେ ଉଡ଼େ ଯାଏ ରାଶି ରାଶି ପୋକାୟ କାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣା । ବାଢ଼ାଳା
ଦେଶେର ବିଶାଳପୁଣି ଯୁବକକେ ଉଭ୍ୟରିତ କରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଥେକେ ଜ୍ଞାନମର୍ଗେ ।
ଅତଃପର ଚରାଚର ବିବନ୍ଦ୍ର ହୟେ ତାକେ ବକ୍ଷ ନୌରି ନାଭିମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋପନ ପ୍ରକୋଷ୍ଟ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଉନିଶ ଶୋ ଏକଷଟି ମାଇନାମ କ୍ରତ୍ତିବାସ କାଶୀଦାସ ଚଣ୍ଡୀଦାସ
ଅତଃପର ଥଙ୍ଗନୀ ବାଜିଯେ ନାମ ଶୋନାୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ।

୬

ଧରୁକେର ଛିଲାୟ ଏଇବାର ଟକାର ଉଠିଛେ । କୁଳ ବାଡ଼ିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧାନ ଧାନ
ହୟେ ଯାଏ ସାଜାନୋ ଦୃଶ୍ୟର ମତୋନ । ଦାମାଳ ଦୂରସ୍ତ କମେକଟି ନଷ୍ଟିଛା ରକ୍ତେର
କୋଷ ଥେକେ ଅନ୍ଧ ନେଥା—ମଳ ବେଦେ ଲାକିଯେ ପଡ଼େ ଅମଜମାଟ ସିନେର ମାରଖାନଟାର
ଛାରଥାର ହୟେ ଯାଏ ପଲାଶୀର ଆକାନନ, ଦାଉ ଦାଉ କରେ ଆଖନ ଜଲେ ଓଠେ
ଅଶୋକବନେ । ଝୁର ଝୁର ସମ୍ମ ମୁକ୍ତୋ ବରେ ଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥେକେ, ଭୟ ପେଯେ ପ୍ରାଗପଣେ
ଦୌଡ଼ାନ ହୃତରିଙ୍କ ବାଂଲାର ଶେଷ ଶାଖୀନ ନୟାବ, ଛିନ୍ତରଣେ ରଙ୍ଗ ବରେ, ହାଥରେ
ଶୃଙ୍ଗ ହୟେ ଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ତୃଣ । ପଲକେ ଛଥିନୀ ସୀତା ମୋହିନୀ ହୟେ ଆଡ଼ାଳ
ଥେକେ ତାକେ । ଜି. ପି. ଓ-ର ପେଟା ଘଡ଼ିର ଆଓୟାଜ ଶ୍ରତିତେ ଦମକ ତୁଳତେଇ
ନୟାନପୁର ସଂକାନ୍ତିର ମେଲାର ସମ୍ମତ ବେଲୁନ ଏକସାଥେ ଫେଟେ ଯାଏ । ଆର ସତ୍ୟଜିତର
ଦୂରାଗତ ଧନି, ହାଓୟାୟ ହାଓୟାୟ ଏକ ସହ୍ୟ ତାତାର ଘୋଡ଼ସନ୍ଧାର, ଏଇବାର ଶର୍ମ
ତୋଳେ ତ୍ରିମିକ ତ୍ରିମିକ । ଚକ୍ରାକାରେ ଏକଟା ଉତ୍ୟାମ ବେଗାକୁ ନୃତ୍ୟ ସଭାଶୈରେ
ଝାଲ୍ଟ ବକ୍ତାକେ ଘରେ । ଚକ୍ରାକରେ ଶୁଲେ ଯାଏ, ସର୍ବୀ ବନନିକେ ! ବସସ୍ତନୋ କହି
ହେ ! ପ୍ରାଣ କାରେ ରେ ।

এ বাবৎ অক্ষকারের লালাসিক আকাশে পিছিল খেয়ে ছিটকে পড়া
ঠান ধানিকটা জ্যোৎস্না বর্মি করে। অথচ এ রকম কথা ছিলো না, চহিমা
গলার মাহুলী এবং জ্যোৎস্না শরীরের জাত, পৃথিবী ধরণী হয়ে যায়, ফুল কুসুম।
মেঘেয়ামুষ রম্যী। তবু যেহেতু চারিগ্রাম হৃরোধ্য উপমা এবং একটি অভিজ্ঞান
সড়ক অকস্মাত আচ্ছাদিত তৃণঙ্গে, পরিব্যাপ্ত স্থিতির সংসার অভাবনীয়ের
জটাজালে ডাঙায় উঠে আসে পিতার ছিপ করোটির মতোন, সাগর শুকিয়ে
জলকঢ়ার মেহগিনি-পালক উ কি দেয়, স্বৰ্ণ অঙ্গুরী মোলে থেকে থেকে, আর
যাঘের নাম লেখা বৃক্ষাঙ্ক শুশুকটা চড়ায় আটকে দিনভর শুকোয়। দুটো
চোখ কেবল তাকিয়ে দেখে 'তলদেশে একটা বিরাট ঝড়জ, নৌলাভ অঞ্চিৎ হ হ
করে আহতির স্বরে ডাকছে, ইডা স্মৃত্যু পিঙ্গলামা অমে যাওয়া হাত গা
শৈঁকছে চুল শুকোছে, তার আঁচে! চৰাচৰে পানি নেই এক ফোটা, ফকির
লালন মইল জল পিপাসায় ধাকতে নদী মেঘকা। ঠাঠা ডাঙায় নবকুমারের
নৌকা ঝড়ে টালমাটাল যায়।

এই মতে ক'জি ঘড়িতে রাত ন'টা বাজার সৰুয় সংকেত ধরা দেয়।

একটা টাউন-সার্ভিস শুল্ক মোট সাড়ে ক্ষেত্রেটা স্টেট বাস কালশ্বাতে
ভেসে যায়। আমার ধন নেই, প্রাণ নেই, জীবন নেই, এমন কি ঘোবন।
হ'চোধের ঘুমের মতোন নেবে আসছে পরম লগ্ন।

বুড়ো দারোয়ানের হাতেব পাঞ্জাব শাশনাল ব্যাকটা বিমোয়। শাস্তিনগর
ভাঁটিধানা ক্রেতত ছাই মহাপ্রাণ পরম্পর পিতৃ-সন্দোধনে জনগতিত এবং প্রেস
ক্রাবের ফুটপাথে আম্যমান বেসরকারী বেঙ্গ।

আহুপ্রতারণার বশংবদ পালায় অতঃপর সময় বুকে হেঁটে আহত
নৈনিকের মতোন এগিয়ে আসে বৃক্ষাঙ্ক। এ দিকে ধারে অহংকী তুর্যনাম
তোলে।

দুঃখপট হির। আহুমানিক কয়েক হাজার দর্শক কন্দুমাস প্রতীক্ষায় ফুলে
কেঁপে সম্মতকে ডাকছে। আলোকিত নাট্যশালা বিদীর্ঘ উৎকর্ণার পূর্ব-মুহূর্তে
অবোধ্য নির্জনতায় মহা কালের মন্দির হয়ে যায় হির মিশুণ স্বত্তিনীনতায়
হির অক্ষকারে। এককালি ঝঁপ আলো ধম্নী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা বির্বর
মুক্তের কিন্তুকিতে ছান থেকে নাটমঞ্চের উপর আড়াআড়ি আছড়ে পড়ে

একটা লেজকাটা টিকটিকির মতোন গড়াগড়ি যায়, একটি অপগত বিকলেক্ষ
হুটো মাঝ সম্বল করে ঐ একবুক অক্ষকার থেকে অস্ত নেয়া বিনষ্ট আলোক
রশ্মিতে জিরাফের মতোন গলা বাড়িয়ে সীতার কাটে স্তুত্যার। নিখাল
ভাঙ্গী হয়ে আসছে, অমে আসছে হাত পা, শ্রেণী ভয়াল অনিকেত অল্পষ্ট
তলদেশ তাকে টানছে শ্রেতে পাকে আবর্তে। আর শেবহীন পাড়ির
সর্বশেষ ভরা কটাল-কে চন্দ্ৰ সুর্য মিলে বিপুল বিশ্বাসে সমবেত টান দেবাঙ্গ
আগেই লোকটাৰ স্বগত কঠ জানানি দিয়ে উঠে, যেনো অনেক দূৰ থেকে
পুধি পড়াৰ শব্দ আসে মধ্যবাতে, লক্ষণ সেনেৱ পৰিত্যক্ত পথটাৱ স্বামৃৎ
শতকেৱ বজদেশ পুনৰায় স্ব-কঠে আবিৰ্ভূত হয়। অতঃপৰ থীৱে সংহত
মঙ্গোচ্চারণে নান্দীগাঠ চলে।

১

সমবেত স্বধীবৃন্দ ! এ নাটকেৱ কাহিনী আপনাদেৱ জানা। অতএক
বাক্যক্ষেপ নিষ্পয়োজন।

কাল অধূনাতম। মূল চরিত্র একজন, চতুর্বিংশ বৰ্ষেৱ নিৰ্জন যুবা,
নায়িকা অমৃপহিত এবং সে কপুরণেই নাটকীয় সংঘাত যথাসন্তুব বজাঞ্চ
ৱেখে বিভিন্ন পৰ্বে এসে একমার্গ থেকে অন্তমার্গে উত্তৱণ বৰ্তমান নায়িকেৱ
পক্ষে স্বাভাৱিক না হলেও সন্তুব হয়েছে। আমি নাটকেৱ স্তুত্যার, আমাৰ
তিনকাল ডুবেছে, অবস্থা আপনারাই দেখছেন। অতএব শিক্ষা ফোকাৰ
আগে শেববাৱেৱ মতোন আমি পালাটা করে যেতে চাই। আগেই
বলেছি কাহিনী আপনাৰ জানা, স্তুত্যাৎ গল্লেৱ নিৰ্দিষ্ট পথ ধৰে এতে কোন
ডেভেলপমেন্ট নেই। তবে ইঁ, অ্যাকশন যাকে বলে, তা আছে বই কি,
আৰ এই একটিমাত্ৰ পৰম অ্যাকশনেৱ অগ্রেই তো এতো পীঁয়তাড়া।
আপনাৰা আঁজ এখানে অনেক মাহৰ জড়ো হয়েছেন, হুটবল জিকেটেৱ
সিজনে সচৱাচৰ এতো মাহৰ স্টেডিয়ামেও ধৰে না। আৱ এ-ও আমাৰ
বিশ্বাস, অস্তুত ঈশ্বৱেৱ একজন নষ্ট সন্তান হলেও এখানে আছেন যিনি
ছুৱি শান্তাৰ শব্দ শনেছেন, রক্ষেৱ লোহিত ঝাণ যাৰ নাকে এসেছে,
বধ্যভূমিতে নিয়ে যাৰাৰ আগে ফাসিৰ আসামীৰ চোখে যিনি শেৰ রাতিৰ
লণ্ঠনেৱ নিষ্পত্তি শিখা কৌপতে দেখেছেন। তেমন একজনও কি নেই ? জ্বাৰ
দিন—নেই ?

(অগ্রণ জনতাৰ ভিড় থেকে উঠে দীড়াৰে একজন।)

ଆର କେଟ ? ଶୀତ-ସନ୍ଧ୍ୟାର ପାତଳା ହୁମାଶାଯ ରେସକୋର୍ସ୍‌ର ମାଠେ ବାଜୀର ଘୋଡ଼ାକେ ବର୍କ୍‌ବମନ କରିଲେ ଦେଖେ ଯିନି ଟେର ପେଣେଛେ ଏବାର ଅକ୍ଷକାର ତଳଦେଶେର ଦାର ଉଗ୍ରୋଚିତ ହେଁ, ଯଧ୍ୟରାତର ଆକାଶ ଥିଲେ ଏକଟା ନକ୍ଷତ୍ରକେ ପାଲାତେ ଦେଖେ ଯିନି ମେଲଟ୍ରେନେର ଚାକାର ତଳାଯ ନୃମୁଣ୍ଡ ଝାଚ କରେଛେ, ନେଇ ତେମନ କେଟ ? ଏକଙ୍ଗ ମାନୁଷଙ୍କ କି ଅନ୍ତତ ବାଜାଲାଦେଶେର ଶିରାଯ ଶିରାଯ ଏକାକୀ ଏକଟି ସ୍ଵରେ ନିଃସଂଭାବିତ ଆବିକ୍ଷାର କରେ ଅଞ୍ଚିତ ଚିଂକାରେର ଭ୍ୟାବହ ସଂକେତେ ଶିହରିତ ହନ ନି ? ଏକତନ୍ତ୍ର ?

(ପାତଳା ବୈଟେର୍ଟାଟୋ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟା ଅନେକ ମାନୁଷେର ଅବଶ୍ୟକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଦେଖେ ଦେବେ ।)

ବ୍ୟାସ, ଏହି ଶେଷ ? ଆମାର ସମୟ ହୟେ ଏସେଛେ, ଏହିବାର ଆୟି ପୂରୋପୁରି ଡୁବସ୍‌ତାର କାଟିଲେ ଶୁଭ କରେ ଦେବ, ଶାଶ୍ଵତ ହୟେ ଜମେ ସମ୍ମତ ବର୍କ୍, କାହିନୀର ମାର୍ଜିନେ ସେ ଖରଶ୍ରୋତ ଅଳ୍ପଟ ପ୍ରବାହିତ ତାର ଆଢ଼ାଲେ ଶୁଭ୍ରାବେରେ ଦେହଟା ଶେକଳେ ବୀଧା ମନ୍ତ୍ର ଏକଟା ପେତଳେର ଘୋଡ଼ାର ମତୋନ ବକି ଜୀବନ ଧରେ ଥେକେ ଥେକେ ବାଜବେ ଆର କେବଳି ଶୁଭତା ହିଡାବେ ! କିନ୍ତୁ ତାର ଆମେ ଅନ୍ତତ ଆର ଏକଙ୍ଗ ସେ ଚାହିଁ, ନିର୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଉପମା ଫୁଟିଲେ ଦେଖେ ଯିନି ହାୟ ହାୟ କରେ ଉଠେ ଟେଟ୍‌ବାସେର ଲାଇନ ଧରେ ଶୈଳିକାମ୍ଭେ ପୌଛୁତେ ଚେଷେଛେ ବସନ୍ତ ଆଚ୍ଛିଯେର କାହିଁ ଥେକେ ନୀତିକଥା ଧାର ଏନେ ଯିନି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଯ ଲାକ ଦେଯା ଫଢ଼ିଂଟାକେ ଶାସାତେ ଚେଷେଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେ ବେକାର ଦେଖେ ଅନ୍ତଃପର୍ମ ଆବିକ୍ଷାର କରେଛେ ବସନ୍ତା ଯତିବିଲ ଆର ଶାନ୍ତିନଗରେର ମାଠେ ମାଠେ କରେବ ମହା ଗୋର ଥୋଡ଼ା ହୟେ ଗେଛେ, ଚାପା ପଡ଼େଛେ ବାଜାଲୀ ବିଦେଶୀ ମିଳେ ହାଜାର ଖାନେକ କବି । ସେଇ ତିନି କି ନେଇ ? ଏଙ୍ଗେଗରୁ କେନାର ଆମେ ତାତ ବୋନା ତାତୀର ଗଲ୍ଲ ଶୁନିଯେ ଶୁନିଯେ ଯିନି ଗାଲବ୍ୟଥା କରେ ବ୍ୟର୍ଷ ହୟେଛେ ?

(ଯୋଟା ମାନୁଷଟା ଇଂର୍କାନ୍ କରେ କମାଲ ଦିଯେ କପାଳେର ଘାମ ମୁହଁ ସମ୍ବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପା ସାଥନେ ଏସେ ଦୀଢ଼ାବେ ।)

ଶାଧୁ ! ଏକ, ହୁଇ, ତିନ, ସ୍ଵଧୀ ହେ—ଜିନିଜନ ମାନୁଷକେ ଶାକୀ ଦେଖେ ଏହିବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ଚରମକ୍ଷଣ—ଏତୋକ୍ଷଣ ସେ ଅୟାକଶନେର କଥା ଆପନାମେହୁ ବଲଛିଲାମ, ଅଚ୍ଛାତମ ଏକଟି ହତ୍ୟାକାଣ । କାହିନୀଟା ଆପନି ତୋତାଗାରି ମତୋନ ଆଉଡ଼େ ଯେତେ ପାରେନ, ଆର ଏହି ତାର ନୃଶଂଖ ଲୀଲା ଅକ୍ଷକାର ନାଟମଙ୍କେ । ମୁଣ୍ଡ ଧରେ ପଡ଼େଛେ ଦେଖେଛେ, ହୃପିଣ୍ଡେର ସ୍ପନ୍ଦନେ ଅଭିଗୋଚର ଏକଟି ଏକଟି ପ୍ରିସ୍, ନାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରେ ଆସିଛେ, ମୁମ୍ଭ ବର୍କ୍ ଆର ଅଞ୍ଚ ଏକାକୀର୍ବାଦିତ ନାଟମଙ୍କେ ।

হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কাহিনীর উপক্ষিত মার্জিনে—আর তাতে এইবাব ভেসে
বাজে সোনার লবিমুর, যাইবে ভেসে থায়।

১০

কল্প আলোর ফালিটা স্তুত্যারকে শুন্দ ভূবে ঘেড়েই যুবক দেখলো তার
ধড়টাকে বঁড়শিতে গাঁথা টোপের মতোন প্রবল নিয়গামী আকর্ষণে উকাম
আবর্ত কেবলই টানছে—পরিচয়পত্রবিহীন তার কক্ষকাটা মেহটা ভেসে
যায়, অস্তিত্বের আড়াল থেকে কেবলই প্রহত হয় শেকলে বাঁধা শৃঙ্খ একটা
কলস।

১১

মাসের পঞ্চলা হপ্তা ছিলো বলে স্বভাবতই গান্দা গান্দা মাঝুমের ভিড়ে
জিয়া এভেজ্য শুলিষ্ঠানের পরিচিত এলাকা শুলোয় বাড়া তিনি ঘটা তিনি বকু
মিলে তাকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়েছে। অবশ্যে স্টেডিয়ামের যেখানটাৰ
একজন বেকার মিলে চিনেবাদামের খেসায় সময়ের পরিমাপ নিছিলো
তার কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঙিৰে ধাকা, পাঞ্জাবীৰ ধালি পাকেটে দু'হাত
এবং স্ট্যাপ হেঁড়া স্থানেলোৱ সাথে যুক্ত্যমান অবস্থায় চতুর্থ জনকে খুঁজে পেয়ে
মহাউজাসে ঘাড়ে হাত রাখতেই চমকে কিৰে সে বললে, ‘আমি নেই রে !’

অবাব না দিয়ে তৃতীয়জন বললো, ‘উঃ চ’ বাবা, খুঁজে খুঁজে একসা,
যতো জালা কি শালা আমাদের ধালি’—যুবক চিংকার করে বলতে চাইলো
—‘হুহুং, তীব্রে দাঙিৰে ধাকা তোমার নাগাল আমি পাইনে, হাতটাকে
অনেকখানি বাঁধিয়ে ধুলেও না, নবকুমার সাগৰ সক্ষমে যায়—’

কান না দিয়ে বিতীয়জন বললে, ‘আপিসে টেলিফোন করে পাতা নেই,
যেজোৱার খুপরিতে বলে বলে মেঝেটা এতোক্ষণে রোস্ট হচ্ছে—এমন কৰে
কি লাভৰে বাবা—’

মৰ্মভেদী চিংকার এতোক্ষণে দুর্বোধ্য অগতোভিতে ক্ষপাঞ্চারিত,—ভেসে
ধাকতে ধাকতে জীবনে সবাই কমবেশি ধনিটা শুনেও জুলে ধাকতে চায়,
অস্তিত্বের আড়াল থেকে শৰ্কটা এখন অভিতে বজ্জৰে মতোন নাম ধৰে
আমায় ডাকছে—।

তৃতীয়জন ঘৈনতা ভাঙলো, গলাটা তাৰ থামে—‘বিবাসইতো ভালোবাসা,
যাটি কি সোনা কি, আমলে এক, ভাবনা নিয়ে কথা। শা চাঁইছি তা সব

সময় কাম্য নয়, কিংবা 'বা চাই নি তার সবটুকু যদ্বন্দ্ব। অতএব ফিরি
চারজনা শোভাযাত্রা করে ! তোর স্থথের কৃকপাধি সঙ্গে থেকে দীড়ে বসে
আছে, চ'—'

১২

একটি রোক্তিমান প্রতীক্ষিতা নারীর অভিযন্তে চারবছুর যিলিত আকর্ষণ
তাকে ধাবমান করলেও সেই নিক্ষতাপ সন্দ্যার প্রহরী বাজালা দেশের
পথে-প্রাঞ্চের ঘূরে বেড়ানো ঝাল্ট যুবা অহুভব করলো তার স্বরূপের কৃক
আর অমোৰ অন্তর্গালের শৃঙ্খলার কলসিটা এক শেকলে বাঁধা, তার উক্তার
নেই আৰ কেবলই তা' প্ৰয়াণেৰ পথ ধৰে ভেসে থাচ্ছে। মুদিত নেতৃত্বে পল্লব
ধাৰণ কৰে আছে একটুকৰো অস্তিম নিঃসন্দতা, প্রতীক্ষমাণ মহিলারা থাকে
সন্তুষ্ট প্ৰেম বলে সন্তুষ্ট কৰে ॥

আঞ্চলিক ব্যবসায়ী অবস্থা মাস্তুল সৈন্ধব

সক্ষেপেন্দো, ফেরেশতারা ষথন চার্বিক খেকে আলো খেয়ে ফেলছেন, আমি সেজেন্টে প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সাক্ষ্যত্বমণ্ডের জন্য বের হ'লাম; যদিও আমি কাপড়-চোপড় পরেছিলাম, আমার সম্মুখে মুহূর্ত কয়েক দীড়িয়েছিলাম, এবং আমার চেহারা দেখে আমার হতাশা বিশ্বগ বাড়লো, মে-হতাশা কিছুক্ষণ আগে আমাকে পাগল ক'রে দিছিলো। কিছুক্ষণ আগে ঘরের ভিতর জানলার সম্মুখে ব'সে আমি সুর্দের শেষ আলোয় ভদ্র-হ'য়ে-ওঠা লোকদের দাওয়া-আসা, মান যোটরের ট্যাঙ্গির রিকশাৰ দাওয়া আসাৰ ছবি দেখতে-দেখতে অঙ্গ কথা ভাবছিলুম; অর্থাৎ এসব দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে থাকলেও ভিতরে-ভিতরে একজন দাহন লকলকে ঝিঁড়ে ছুটিলো; আমি সমস্ত পৃথিবীৰ উপর চ'টেছিলাম, আমার সমস্ত বন্ধুবাক্ষব আঞ্চলিকসভান পারিবারিক সমস্ত সবাইকে আমার বিকল্পে বড়বন্ধুকারী মনে হচ্ছিলো, বাইরে তারা শার্ট-প্যান্ট পৰা দিবি ভদ্রলোক, ভিতরে-ভিতরে হাজাৰ বছৰ আগেকাৰ আদিম যাহুৰ। বক্স-বাক্সবেৱা একে অঙ্গেৰ ছিঞ্চাহেষণে রত, আঞ্চলিকসভান সহাহৃতি দিয়ে আঘাত কৰতে চায়, এমনকি পারিবারিক সদস্যৱা—যারা আকস্মিকভাবে আমার ভাই-বোন-আৰো-আশা, যারা আমার শেষ নির্ভৰ—তাৰাও মনে হচ্ছিলো বিকল্পে, তাদেৱ সকলে আমার সমস্ত যেন ময়তাৰ জাফগায় টাকায় বসলেন্তে : হৃপুৱেলোৱা ছোটো একটি ঘটনা অমন অহুত্বিৰ জন্যে দায়ী, কেননা পৰিবারেৰ উপৰ বিশ্বাস পূৰ্ণভাবে আমি এখনো হারাইনি। আমার মাথায় বিষ-মডি-ছুরি স্বপ্ন-ঘূৰ্ম-যোহেৰ মতো ঘূৰছিলো। আমি আঞ্চলিক কথা ভাবছিলুম সামাজিক; আমি চেয়েছিলুম জানলা দিয়ে বাইরেৰ দিকে কিছি কিছুই দেখছিলুম না। ‘কেন আমি আঞ্চলিক কৰবো’, নিজেকে আমি প্ৰথ কৰলুম আৱেকজন হ'য়ে। ‘কেননা আমি কষ্ট পাছি?’ ‘া! ক্ষি কষ্ট তোমাৰ। তোমাৰ আৰো সৱকাৰেৰ উচ্চপদে অধিক্ষিত, তুমি সারিয়্য কাকে বলে আনো না, তোমাৰ পৰিবারেৰ সবাই তোমাকে ভালোবাসেন, তোমাৰ মতো স্বত্বে ক'জন আছে আমাদেৱ দেশে, তুমি তোমাকে নিৰে সামাজিক ব্যক্ত, কেউ তোমাকে বাধা দিছে না। পৃথিবীতে কজনই বা এমন হ'থ পায়?’ ‘তবু আমি কষ্ট পাছি, এটা সত্য।’

‘কি কষ্ট তোমার, স্পষ্ট ক’রে বলো।’ এটা খুব জতি আমি কষ্ট পাচ্ছি, সারাক্ষণ দিলে কি ঘূমের ভিতরে, সারাক্ষণ ঠাণ্ডা এক টুকরো। বরফের অসহত্যা যেন কেউ আমাকে জোর ক’রে দীড় করিয়ে রেখেছে; অথচ কি সেই কষ্ট আমি কিছুতেই স্পষ্ট ভেবে পেলাম না এক মুহূর্ত—না স্পর্শপ্রবণতা, না ঘোনতা, না দারিদ্র্য, না আদর্শ অথচ সবকিছুই যিলে এই কষ্ট। কিন্তু এটা কোনো উত্তর হয় না, এই নাস্তিময়তা, উত্তর তাই যা আঙুল তুলে বিশেষভাবে চিনিয়ে দিয়ে যায়, যা সবিশেষ। ইঠতে ইঠতে ভাবা যাবে ঠিক উত্তরাটি কি,— এই ভেবে অগ্রমনস্থভাবে আমি সেজেগুজে বের হ’লাম রাস্তায়—‘কেন আমি আঘাত্যা করবো’, ‘কাকে আমি কষ্ট ভাবছি।’

রাস্তা আমাকে বলের মতো লুফে নিলো; রাস্তার দু’ধার দিয়ে শ্রোতের মতো যে-জনতা চলেছে মুহূর্তের ভিতরে আমি আর অগ্রতম হ’য়ে গেলুম; শ্রোতের মতো লোকজন, দৃশ্যাশের উচাটিন দোকানগুলো, ঠোটে ঠোট বুজে বুজে মজবুত মহিলা, ট্যাঙ্কি-মোটর-রিকশার হেয়াও টুঁটাং; অথচ কিছুই আমার চোখে পড়ছিলো না, সম্পূর্ণ অগ্রমনস্থ থেকে আচর্যভাবে কহুই চালিয়ে ইঠু বাড়িয়ে জুতো গলিয়ে হাজার লোকের ভিতর দিয়ে পথ তৈরী করতে-করতে চলে যাচ্ছিলুম আমি। এবং সমস্ত শব্দকে পরাজিত ক’রে বুমোন চলছিলো প্রাক্তন ভাবনার, ‘আমার কষ্ট স্পর্শপ্রবণতার ঘোনতার আদর্শভঙ্গের; সবচেয়ে কষ্ট বুঝি খাপ ধাওয়ানোর, “অ্যাভজাস্ট” করবার; যে-কোনো অবস্থা বা মাঝুমের সঙ্গে খাপ ধাওয়ানো বা মিলিয়ে নেয়া এটাই আমার আসে না, আমি আমার বন্ধুদের মতো আঘীরস্বজনের মতো চোখের আঢ়াল হ’তেই কারো নিন্দে স্তুক করে দিতে পারি না এবং মাঝুমকে সরাসরি আঘাত দিলে আমি নিজে কষ্ট পাই অধিকতর; আমার কি উপায় হবে আঘাত্যা ছাড়া, কেননা ঐ ভাবে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সহবাস করা যায় না। এবং কেউ আমাকে আঘাত দিলে আমি আধুনিক মাঝুমের মতো স্ক্রুতার সহায়তা গ্রহণ করি না, বোকার মতো, একটি গেঁয়োর মতো তাকে খুন করতে চাই, যদিও শেষ পর্যন্ত পারি না; কথার চাবুকের বদলে সড়িকার আহত বা নিহত করতে পারলেই আমি বেশি খুশি হই।’ আমার ভাবনা ধখন এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে, কালো একটা চাদর ক্রমশ ধৰণে মিহিয়ে আনছিলো সঙ্গে ও তার অঙ্গুত রকমে নমনীয় মাঝুমগুলোকে, একটি চিকাব উঠলো হঠাৎ, অবল ব্রেক করে থেমে গেলো কোনো যান, মুহূর্ত মনে হলো বুঝি আমিই টেচিয়ে উঠেছি, পরক্ষণেই তুল ভাঙলো, আভ্যন্তরীণ চিত্রমালা মুহূর্তে ধৰে

গেলো কিসের তাড়নাৰ, সমুখেই কৌতুহলেৰ মৌচাক গ'ড়ে উঠতে দেখে
আমি ছুটি দিলাম সেদিকে ।

যখন সেই ভিড়ে পৌছেছি, চাৰদিক ভেড়ে যাহৰ আসছে কেবলি, ঘান
চলাচল বৃক্ষ ; গোড়ালি উচু ক'ৰে পায়েৰ পাতায় ভৱ দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে যাহুদেৰ
বৃহ ভেদ ক'ৰে দেখবাৰ চেষ্টা কৱলাম বটে ভিতৰে, কিন্তু কিছুই বোঝা
গেলো না । ‘কি হয়েছে ?’ সমুখেৰ লোকটিকে জিগ্যেস কৱলাম, সে কোনো
জবাৰ দিলোনা ; পাশেৰ লোকটি ধমক দিয়ে বললে, ‘কি আবাৰ হৈবে :
অ্যাকসিডেট : যা হয় সব সহয় ! কিন্তু কি বকম লাগলো, লোকটি বেঁচে
আুছে না যাৰা গেছে বুৰছিনা কিছু !’ আমি আৱেকবাৰ দেখবাৰ চেষ্টা
কৱলাম : স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না ; একটি মোটৰ সাইকেল কাত কৱা,
মোটৰ সাইকেলেৰ গায়ে হাত দিয়ে একজন দীড়িয়ে আছে, তাৰ চূল থেকে পা
অবধি ধনেৰ সাক্ষ্য, ভয়ে তাৰ প্ৰসাধন-কৱা মুখ ভিতৰ থেকে বেৱিয়ে পড়েছে,
ভিমেৰ মত ভৱাট মুখমণ্ডল নীলচে হ'য়ে গেছে, অকিগোলক ঘৰ্ণায়মান,
দু'ভিন্নজন মছুৱ শ্ৰেণীৰ ভদ্ৰলোক কথে উঠেছেন তাৰ বিকল্পে, আমাৰ
কৌতুহল, বেশবাস, গন্ধীৰ অভিজ্ঞত মুখ ভিতৰে একটি অংশকে সৱিয়ে দিলো,
আমি ভিতৰে চুকলুম, মোটৰ সাইকেল চালককে দেখেছিলুম এতোক্ষণ, তাৰ
কাছেই যে আৱেকজন ছোটো ছেলে দীড়িয়ে আছে ভৰ-ব্যাকুল দিশেহাৱা মুখে
এবাৰ সেটা নজৰে পড়লো ; বুৰলাম, এই ছেলেটিৱ অ্যাকসিডেট হয়েছে মানে
হ'তে যাচ্ছিলো, ভাগ্য ভালো, লাগেনি বোধহয়, যা দেখেছি । আমাৰ মুখ
খুলতে হ'লো না ; মছুৱ শ্ৰেণীৰ একজন ভদ্ৰলোক আমাৰ দিকে তাকিয়ে
বললেন, ‘আমৱা দেখেছি, সব মোৰ এই মোটৰসাইকেলওলাৰ । একটুৱ অস্ত
বাইচ্যা গ্যাছে ছোকৱাটা !’ মোটৰ সাইকেল চালকৰ মুখ বিৰ্বতন ; তখন
জিগ্যেস কৱলুম, ‘কি দেখেছেন আপনাৰা ?’ ‘আমৱা এই’ রাস্তা দিয়া যাইতে
ছিলাম, ছোকৱাটা রাস্তাৰ ওপাৰ থেইক্যা এপাৰে আইতেছিলো, উনি যে
স্পীডে আইতেছিলেন অ্যাকসিডেট তাতে হইতোই, এই ছোকৱাৰ না-হইলে
আৱেকজনেৰ হইতো ; সোজা রাস্তা, উনি তো বহু দূৰ থেইক্যাই দেখতে
পাইছেন, কেন ধারান নাই আগেই । আমৱা দেখেছি সব মোৰ এই
ভদ্ৰলোকেৰ । যিয়াৰ শুব টাকাৰ গৱন হইছে ! তোমাগোই জান আছে,
আমাগো আৱ জানেৰ দাম আৰু কে !’ ‘পুলিশ আছে না ক্যান ! পুলিশেৰ
হাঁতে দিলে…… !’ ‘আৱে পুলিশ কি কৱবো, ছুটা ট্যাহো দিলেই রাস্তাৰ
ওখাৰে নিয়া কইবো যাওগা ; আমৱা ধোলাই দিয়ু !’ দেখলুম এই লোকগুলো

কখে উঠেছে অবলুকম, মারমুখো তারা; আমি মোটরসাইকেল চালকের
 মুখের দিকে তাকালুম, লোকটা পাতার মতো কাপছে, ‘আরে তাই কিছুই
 লাগে নাই তো এ ছেলেটির, আমারে সব দোষ দিছেন আপনারা। রাস্তার
 এদিক-ওদিক না চেয়েই পার হচ্ছিলো সে, দূর থেকে দেখেই আমি ব্রেক
 করেছি, এই ওথানে’, লোকটা আঙুল তুলে দূরে দেখাতে চেষ্টা করলো ভিত্তের
 মাথার উপর দিয়ে, ‘একটা যন্ত্র তো মশাই, আমিই জ্ঞেন্টে যেতে পারতাম, ও-ও
 বৈচে গেছে আমিও বৈচে গেছি এই বলেন আলাহুর দয়া।’ নিজেকে ঐরকম
 হেঢ়া শার্ট পরা, হাফপ্যান্ট-পরা ধানি পা এই উশকো-খুশকো চুলের ছেলের
 সমোত্তে ফেলতে কিছুমাত্র দিখি করলো না লোকটি—ধারে পড়লে সব
 মাঝবেরই এই অবস্থা হয়। ‘আচ্ছা, ছেলেটির তো শাগেনি কিছু’, আমি
 এবার একপাশে মাথা নিচু ক’রে দাঁড়িয়ে-ধাকা ছেলেটির দিকে তাকালুম,
 ‘কি, কোথাও লেগেছে নাকি তোর?’ প্রথম ক্ষেত্রে জ্বাব এলোনা, আরো
 অনেকে তখন ছেলেটিকে জিগেস করলো, ছেলেটি মাথা নিচু ক’রে বললে
 ‘পায়।’ আমি ছেলেটির পায়ের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলুম, ‘কই কিছুই
 তো লেগেছে বলে মনে হচ্ছে না, ইটতো, ইটে তাখ?’ ছেলেটা ইটতে চেষ্টা
 করলো, খেঁড়াচ্ছে, একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ইটিছে, পায়ের ভিতরে হাড়ে
 লেগেছে হয়তো। ‘ওদিকে একটি ডাঙ্কাৰখানা আছে, ছেলেটিকে ওথানে
 নিয়ে যেতে হবে, বেশি লাগেনি, সামান্য লেগেছে’, কারো খুব আগ্রহ দেখা
 গেলো না, তু-একটি কথাই শোনা গেলো কখু, ‘পয়সাটা কে দিচ্ছে?’
 ‘মোটরসাইকেলওলা! সে ছাড়া আবার দেবে কে!’ ‘পকেটে পয়সা আছে
 তো! এন্দের তো বাইরে বাহাহুরি, ভিতরে ছুঁচোৱ কৈৰণ! ’ ‘তা বলেছেন,
 তা শহরে ইটা যায়না মশাই, এই স্টোর যটিৰ সাইকেলের মৌৰায়েঘোঁ’
 ‘নতুন পয়সার মুখ দেখছে এৱা উঠতি বড়লোক, ধৰাকে সৱা জ্বান কৰছে।’
 এই যারা কথা বলছেন, এৱা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের লোক হয়তো। আমি
 একটু দিশেহারা বোধ কৰছি; চারিদিক থেকে সবাই মোটর সাইকেলওলাৰ
 বিকলে চ’টে গিয়েছে, লোকটা হয়তো মার ধাবে সমবেত জনতাৰ কাছে, আৰু
 তাহ’লে এই ধনীৰ দুলালেৰ নৰম চামড়াৰ নতুন একটি অভিজ্ঞতা হবে।
 এইবাব সেই মজুৰ ভজলোকেৱা এগিয়ে এলোছেন লোকটিৰ কাছে, ‘ওকে
 আপনি চাপা দিতে চাইছিলেন।’ ‘বা, তাহ’লে আমাৰ জ্বেল হবেনা, ওকে
 চাপা দিয়ে আমাৰ কি সাত?’ অনেকগুলো উঁচে-পড়া ঠাণ্টাৰ-মুখ: ‘চাপা
 দেয়াই সাত তোমাদেৱ।’ ‘জ্বেলৰ ভৱ ধাকলে আৰ এতো স্পীতে কেউ

‘ঢালাৰ না।’ আৱে মাৰ লাগা শালাকে, আমাৰেৰ মাছুবই মনে কৰেনা আৰা। কয়েকজন তাড়া ক’ৰে এলো মোটৱসাইকেলওলাকে; সে হ’টো গেলে একটিকে, তাৰ মুখ নৌল, চোখ বিক্ষাৰিত, মোটৱসাইকেলটি ঠেলতে-ঠেলতে ঢ’লে সে অশুদ্ধিকে, ভিড় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ঐদিকে। আমি লোকটিকে বাঁচাতে চেষ্টা কৰেছি, কিন্তু ভিড় বখন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আমি থেতে পাৰিনি, পেছিয়ে গেছি; লোকটিকে বাঁচানোৰ বেশি চেষ্টাও আমি কৰতে পাৰিনি, আমাৰ চোখেৰ সম্মথে ব্যাপারটি ঘটেনি, কাৰ মোৰ আমি জানিনা, লোকটিকে বাঁচাতে গেলে আমাকেও মাৰ থেতে হ’তো হয়তো। আমি কিছু ভাবতে পাৱছি না, এখন আমি থেখানে দাড়িয়ে আছি সেখানে ভিড় ফাকা হ’য়ে গেছে, একটু দূৰে সেই ভিড়, চিংকাৰ, লোকটি হয়তো মৰে থাক্ষে, তাৰ নৱম চামড়া, দামি শার্ট, ডিমেৰ মতো মুখ হয়তো লাল হ’য়ে উঠেছে।

কয়েকজন উদ্ভ্রান্ত যুবককে ভিড়েৰ দিকে ছুটতে দেখলাম, ‘একটি নিৰীহ লোক পাবলিকেৰ হাতে মাৰ থাক্ষে ভাই।’ লোকটাকে বাঁচাতে তাৰা ছুটে গেলো। আমি একবাৰ ভাবলাম চ’লে যাই, এই ভিড় লোকজন চিংকাৰ-বিজ্ঞপ বেগামাল ক’ৰে দিকে আমাকে; তখনো লোক আসছে ভিড় লক্ষ্য ক’ৰে, ‘কি হয়েছে?’ আমাকে জিগেস কৰছে, আমি কোনো জবাব দিচ্ছিনা, তাৰা ভিড়েৰ দিকে ছুটে যাক্ষে। লোকটিৰ কি হ’লো, আমাৰ কোভুহলও থাক্ষে, পায়ে-পায়ে আবাৰ আমি ভিড়েৰ দিকে এগিয়ে গেলাম উত্তেজিতভাৱে।

বিশাল একটি ভিড় গ’ড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে; আমি অনেক কষ্টে ভিড়েৰ মাৰাৰ উপৰ দিয়ে ভিতৱ্বে দৃষ্টিপাত কৱলাম: মোটৱ সাইকেলটি একপাশে কাত হ’য়ে রয়েছে, আৱ সেই মোটৱ সাইকেল চালক খাড়া দাড়িয়ে তাৰ পাশে: তাৰ চুল এলোমেলো, শার্টেৰ বোতাম খোলা, প্যান্টেৰ ভাঁজ নষ্ট, শথেৰ জুতোয় কাদা। মুখ-চোখ সক্ষেৰ এই অক্ষকাৰে লণ্ঠনেৰ মতো লালচে হ’য়ে উঠেছে—দেখলেই বোৰা থায় তাৰ উপৰ দিয়ে একজজন বড় ব’য়ে গেছে। উৎসাহী সেই যুবকেৰ দলকে দেখলুম কি ক’ৰে ভিড় ভেদ ক’ৰে একেবাৰে থাৰখানে গিৰে উপহিত। থাৱ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে গিৰিব সেই কুকুল ছেলেটিও একপাশে দাড়িয়ে—কি ক’ৰে এলো ও ওখানে? লোকটিকে বখন থাৰতে-থাৱতে এসেছে থালে? আমি ভেবে পেলাম না কিছু; কেন্দৰা আমাৰ শলোৰোপ কেড়ে নিয়ে থাকিলো আমাৰ পাশ কেটে বেৱিবে থাওয়া উচ্ছা-

‘অতী সেই মুকের মূল এবং একজন প্রোট মাহুষ তারা বাগড়া করছিলো দাড়িয়েথাকা। অনতার বিকলে, প্রোট লোকটির পৌজারের হাড় উঁচিয়ে আছে, শার্ট ঠেলে লোমে ভর্তি তার মুখটা কিসের অসংখ্য মাগে চিন্তিত, তার শার্টের মূল ইটু পর্যন্ত ঠেকেছে—দেখেই বোরা ঘাছিলো শার্টটি অঞ্চ কারো; সেই প্রোট লোকটা টেচিয়ে টেচিয়ে বলছিলো, ‘ধূ চিনি ওরে। এই ছোকরারে আমি এর আগেও দেখেছি পথে।’ ডিডের ভিতর থেকে কে একজন বললে, ‘আমিও দেখেছি মনে হচ্ছে সদরবাটে কোনো একদিন।’ তার দিকে চেয়ে সোৎসাহে মাথা নেড়ে প্রোট বললে, ‘দেখবেনই তো, বলছিলা যে ব্যবসাই এদের এই। শহরে এই একটি নতুন ব্যবসা বার হচ্ছে গাড়ির সামনে পইড়া দু দশ টাকা আয় ক’রে মের—একেকজন করে। জনসন বোঝে এই ছোকরা একবার ধরা পইড়া গিছিলো।’ আমার খুব আশ্চর্ষ লাগছিলো, আমি এ ধরনের কোনো ব্যবসার কথা স্মরণেও ভাবিনি, আমি ছোকরাটির দিকে তাকালাম: এককোণে কঙ্গভাবে দাড়িয়ে, হাতে দুটো টাকা যে রয়েছে তা আমার এতোক্ষণে চোখে পড়লো, এতো শোরগোল চতুর্দিকে তবু ছেলেটা কারো দিকে তাকাচ্ছেন, তার ঘাড় নিচু, চোখ হাতে-ধরা টাকার উপরে, যেন চোখ লিয়ে সে টাকা থাকছে। প্রোটটি তখন তার বক্তৃতার উপসংহার টানছে ‘তবে সচরাচর ওরা নির্জন জায়গায়ই আঢ়াকিসিঙ্গেলেটের চেষ্টা করে, মানে জর্থের ভান করে, তাতে ভৱ পেয়ে দুচার টাকা দিয়ে ঢায় চাপা যে দিয়েছিলো, তাবে অল্পের উপর লিয়ে গেলো। কী বদমাশ দেখছেন ওরা; স্বরোগ-হৃবিধি পেয়ে এখন প্রকাণ্ড রাজপথে হানা দেয়া গুরু করেছে।’ ছেলেটির অবস্থা বুঝতে অস্বিধি হয় না: একটু আগেই অনতা হয়তো কোনো মীমাংসায় পৌছেছিলো, লোকটা দুটো টাকা দিয়ে নিস্তার পেয়েছে ছোকরাটাকে, ছেলেটা যাবে এমন সময় মৃত্যুন দৃঃস্থপ্তের মতো প্রোট ঐ লোকটা ও সেবার্তী যুক্ত সম্প্রদামের আবির্জন।

তখন হাওয়া সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ব’য়ে গেলো: সবার লক্ষ্য হ’য়ে উঠলো সেই ছেলেটি, মনব্যের বান ডাকলো আবার, ‘এক নহরের বদমাশ হবে, তা নাহ’লে কথা বলে না একটাও।’ ‘ঠকবাজ! ’ ‘পঞ্চার অভাবে কতো চালাকি হ’বে বেরোয় এদের মাথা থেকে।’ ‘তাই তো; বাইরে থেকে ওর পায়ে তো একটু আচড়ও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ইটতে গিয়ে ঝোড়াচ্ছে। খোকা দিয়ে টাকা আদায় করার তালে ছিলো।’ ‘এক সক্ষেষ বিনা খাটনিতে দুটো আয় কর কথা না।’ ‘না না অভোটা রমিকভা করতে হবে না।

ଆମ ବିପରୀ କ'ରେ ଛୁଟାକା ଆୟ କରେଛେ ସହି ସତିଇ ହୁଯା ।’ ‘କେନ ? ତାଇଁ
ବା କରବେ କେନ ? ଖେଟେ ଖେତେ ପାରେ ନା ? ବାଡିତେ ବଲେ ଏକଟା ଚାକରେଇ
ଉଠେ ଦିନରାତ୍ ପାଗଳ କ'ରେ ଲିଙ୍ଗେ ବୋ ।’ ‘ହୁମ୍ତେ ଅଭାବେ ପଡ଼େ ଆୟହତ୍ୟା
କରତେ ଗେଛିଲୋ’ ଗଢ଼ୀରେ ନୟ ଏକଜନେର ସରସ ହାସିବ ଝରି ଛିଟକେ ବେରୋଲୋ
ଚୌମିକେ; ଆମି ତଥା ବଲାୟ, ‘ଓରା ଆୟହତ୍ୟା କରତେ ପାରେ ନା ;
ଆୟହତ୍ୟା କରତେ ପାରେ ଶେଇ, ଧାର କୋନୋ ଜାନ ଆଛେ । ପଞ୍ଚକେ କୋନୋଦିନ
କେଉଁ ଆୟହତ୍ୟା କରତେ ଦେଖେଛେ ! ଶାଖେନି, କେନନା ପଞ୍ଚର ଲେ ବୋଧ ନେଇ ।
ଏଇ ସହି କଟିର ବୋଧ ଧାକତୋ, ତାହିଁଲେ ଓ ଆୟହତ୍ୟା କରତୋ ; କିନ୍ତୁ କେବେ
ଆୟହତ୍ୟା କରାର ଆଗେଓ ଏ କଟିର ତାଡନାୟ ଖେଟେ ଧାବାର ଚଟ୍ଟା କରତୋ ।
କିନ୍ତୁ ଓ କିଛୁଇ କରଛେ ନା ।’ ଅନେକେର ନଜର ପଡ଼ିଲୋ ଓ ହାତେ-ଧ୍ୟା ଛୁଟୋ
ଟାକାର ଦିକେ : ଛେଲେଟା ମାଥା ନିଚୁ କ'ରେ ଆଛେ । କରେକଜନ ତାକେ ଧ'ରେ
ପଡ଼ିଲୋ, କୋଥାଯେ ଧାକେ, କି କରେ, ବାପ-ମା ଆଛେ କିନା, ତାରା କି କରେ ।
ଆର ଶେଇ ଶୁବ୍ରା ସଞ୍ଚାଦାର ନିରୀହ ଏହି ଭଜିଲୋକଟିକେ ଧାରା ମେରେଛିଲ ତାର ତଳାଶ
ନିତେ ନାମଲୋ : ଆର ଚାଲକ, ତାର ଲାଲଚେ ମୁଖ କ୍ରମଶ ଆବାର ଫରସା ହ'ରେ
ଗେଲୋ । ‘ଛେଡ଼େ ଦିଛି ଆମରା ଭୋକେ, ପୁଣିଶେ ଦିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଫେର ଯେବେଳେ
ଏବ କରବି ନା ; ଯା—ଟାକାଟା ଲିଯେ ଯା ଭଜିଲୋକକେ ।’ କରେକଜନ ବଲଲେ
‘ଭାଙ୍ଗାରେର କାହେ ନିଷେ ଗେଲେଇ ତୋ ଓ କି ରକମ୍ ଲେଗେଇ କୋଟି ଧରା ପଡ଼ିବେ ।
ହୁମ୍ତେ ସତି ଅୟକିନିଦେଟ ହୁଯେଛେ ; କାଜେଇ ଟାକା ଓ ପ୍ରାପ୍ୟ ।’ ‘ନା,
ଫାକିବାଜି କ'ରେ କେନ ଟାକା ନେବେ ?’ ‘ସାହେବ, ଫାକିବାଜି ନା । ସହି
ସତି ଓ ହୁ ପ୍ରାଣ ବିପରୀ କରେ ତୋ ଛୁଟାକା ଆୟ କରେଛେ । ଏକଟା ମାଛୁଧେର
ପ୍ରାଣ ଆର ଛୁଟା ଟାକା କୋନଟିର ଦ୍ୟା ବେଶି । ମୋଟର ସାଇକେଳ ଚାଲକ
ଉପସଂହାରେର ଭଜିତେ ବଲଲେ, ‘ଅନର୍ଥକ ଏ ନିଷେ ଆର ଗୋଲମାଳ ବାଧାବେନ ନା ।
ଟାକା ଆମାର ଲାଗବେ ନା । ଯା ତୁଇ ଚ'ଲେ ଶା ; ହଠାତେ ବ୍ରେକ କବାଯ ଦେଖେଇ
ଏଟା ଚଲବେ ନା, ଏକଶୋଟି ଟାକା ଚାଲତେ ହବେ ଏଇ ପିଛିଲେ ।’ ତଥା ଲୋକଟା
ମୋଟର ସାଇକେଳଟା ଟେଲିତେ-ଟେଲିତେ ଟାଟା ନେବାର ଅଣ୍ଟ ମୌଡ଼େ ଗେଲେ ; ପିଛୁ-ପିଛୁ
କିଛୁ ଲୋକ । ଆମି କରେକ କରମ ଏଗିଯେ ଏସେ ନତମାଣୀ ଛେଲେଟାର ଘାଡ଼େ
ଏକଟା ହାତ ରାଖିଲୁମ, ତାରପର ତାର ଗାଲେ ଏକଟା ଚଢ଼ ବସିଲେ ଦିଲୁମ, ‘ବେଶ
ବ୍ୟବସା ପେରେଛୋ, ନା ? ଆୟହତ୍ୟାର ଭାନ କ'ରେ ଅଖମେର ଭାନ କ'ରେ ଖୁବ୍
ମୌଜେ ଆହେ ତୁମି—ସତ୍ସବ ଭଣ, ବଦମାଶ । ସତି-ସତି ଆୟହତ୍ୟା କରତେ
ପାରବି ତୁଇ ? ଖୁବ ହ'ରେ ମେତିଜ ବରି ଆଜ—ଯା—ବେରୋ ଏଥାନ ଥେକେ ।’ କେ
ଏକଜନ ସୁନ୍ଦର କରଲେ ନା ଗଢ଼ୀର ନା କୌତୁକେର ଗଲାୟ, ‘ତା ହ'ଲେଣ କ୍ଷତି ଛିଲୋ ।

না ; বাপ-মা কিছু টাকা পেত অস্তত ।' ছেলেটার মুখটা বেঁকে গেলো, কোনো কথা বললেনা, টাকাটা মুঠোর পুরে হৃদয়ের মতো বেরিয়ে গেলো কোথায় । ভিড় ভেঙে আস্তে-আস্তে লোকরাও ছড়িয়ে পড়ছিলো নিজ-নিজ গন্ধব্যের দিকে ।

ভারপুর আমি বিজয়ীর মতোন ইঁটতে শুল্ক করলাম : একটা সমস্তার স্বন্দর সমাধান হ'য়ে গিয়ে আমার ভিতরে ইখৰের আলো এসে পড়েছে । আমার ভিতরটা ভারি খুশি হ'য়ে হ'য়ে উঠচে , অথচ কিছুক্ষণ আগে ছিলুম ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ, ঝাল্লু । আমি তখন আঘাত্যার ভাবনায় অধীর ও অহুধী, একরোধা ; ভিতরটা এখন স্বন্দর ঠেকছে অথচ জনতার ভিতর দিয়ে আনন্দে পথ তৈরী করতে করতে নিজেকে আমি গাল দিচ্ছি, 'আসলে তুমি অঙ্গ লোকের কষ্ট দেখতে চাও, কষ্ট দেখে হৃথী হ'তে চাও, কষ্ট দেখার যে আনন্দ সেই আনন্দের স্বাদ পেতে চাও—তাই না ? তা না হ'লে কেন তুমি আঘাত্যার ভাবনায় এতোক্ষণ ভারাক্রান্ত ছিলো ; অথচ এখন ছেলেটাকে দেখে—ও যে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে আঘাত্যা করে টাকা আঘু করতে চায় তাই দেখে—তুমি ভাবলে "যাক আমার চেমে আরো অনেক দুঃখী মাঝুষ আছে পৃথিবীতে ।" আর সেজগেই তোমার মতো আনন্দ । কিন্তু শাথে মাঝুষ যে কোনো অবস্থায়ই আনন্দ নিন্দে নিজেছ, হয়তো তাকে দুঃখে বলা যায় ; যেমন ঐ ছেলেটা : ও প্রত্যেক গাড়ির সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ভাবে, "যদি বেঁচে যাই তবে কিছু টাকা রোজগার করতে পারি হয়তো, যদি চাপা পড়ে মরেই যাই তাহলে তো ভালোই, কষ্ট করে এইসব করতে হবে না আর," এ একরূপ অস্তুত আনন্দ ; যে কোনো অবস্থায়ই পড়ুক ছেলেটা আনন্দ পাচ্ছে ; কিন্তু তুমি ভাবছো কষ্ট । হয়তো বা কষ্টই, যে-কষ্ট অনুস্তু সেইতো সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, ছেলেটির সবচেয়ে অশান্তি কি জানো ?—অশ্বিরতা, অজ্ঞানা, ছেলেটি যে জানেনা তার মৃত্যু হবে কিংবা জীবন ধাককে ঢাঁই সবচেয়ে বড়ো কষ্ট ; যদি সে কোনো রকমে জেনে ফেলতে পারতো যে তার মৃত্যু হবে কিংবা কিছু টাকা নিশ্চিত রোজগার হবে তাহলে সে গাড়ির সম্মুখে ঝাঁপ দিতে পারতো না । আজ্ঞা, ছেলেটি যদি আঘাত্যা না-ই করতে যায়, যদি তার টাকা রোজগারের উপায় হয় ঐ প্রাণ বিপন্ন করা—যে কথা বলে তুমি ধরকে কিছুকাল তাকে ধরকিয়েছো—তা'হলে নিজের জীবন মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ সহজে ঐ ভীষণরূপ "অজ্ঞানা"ই কি আঘাত্যার শামিল নয় ? তুমি যে আঘাত্যার কথা ভাবো রোজ—যখনই প্রতারিত হও বকুবাক্সে

আঞ্চলিক বাসুন্ধাৰা কাহোৱা কাছে—তাৰ চেয়ে কি মাৰাঅক যন্ত্ৰণাদায়ক নয় এটি ?—
 কেননা সেখানে ষেছায়ত্তু, আঞ্চলিক কুকুলেই চুকে থাক্কে সব ; কিন্তু এই,
 এটি, হোকুরাই এই ভৌষণ ব্যবসা, এটাকে ষেছায়ত্তু বলা যাব না, কেননা
 শৰীৰেৰ আয়ু সহজে নিশ্চিত সিঙ্গান্ত গ্ৰহণ কৰা যাব না এখানে, এটা ঠিক
 ষেছায়ত্তু নয় আবাৰ আঞ্চলিক যাই বটে, আঞ্চলিক চেয়ে ভৌষণ !’ আমাৰ
 ভাবনা প্ৰথম যখন এইভাৱে আৰ্বত তুলছিলো তখন নিজেকে আলাদা
 একটি মাছুষে বললে দিয়ে গাল দিলুম যেন, ‘এ কী বিলাস তোমাৰ ?
 কোথায় আঞ্চলিক কুকুলত থাকিলো, অগ্নি একটি ছেলেৰ দৃষ্টান্তে তা খেকে
 রক্ষা পেলে, অনেকদিন পৰ একটু খুশি হয়েছো, হাঙ্গা হ'য়ে ধোকবে, তা না
 আবাৰ জিজ্ঞাসাৰ শিঙে-শিঙে উচ্চ পাকিয়ে তুলছো । শখ ! তুমি একজন
 দুঃখবিলাসী ছাড়া আৰ কিছুই নও ; এবং এৱকম গাধা যে আজকেৰ দিনটি
 সেলিব্ৰেট কৰতে ভুলে থাক্কে ; আজ কি তোমাৰ অস্তমুক্তিৰ দিন না,
 একজন—সে যেই হোক, যেভাবেই কালাতিগাত কফুক, টাকা উপাৰ্জন
 কফুক, জীৱন বিপন্ন কফুক ; তুমি সেসব ভোৰোনা, অতো ভাবলৈ বেঁচে থাকুক।
 যাব না—তোমাৰ চোখ খুলে দিয়েছে স্বত্বেৰ দিকে, একজন আমাৰ চেয়ে
 দুঃখী এই স্বত্বটাও আছে যখন, তখন সেটা, মুৰ্দ্দেৰ মতো বৱবাদ ক'ৰে দিতে
 পাৰো না—মেই আনন্দেৰ প্ৰকাশেৰ চেষ্টা কৰো ।’

বাত তখন নটা, গ্ৰীষ্মেৰ বাত, বায়ুমণ্ডল দ্যাতিমান, আকাশ স্বচ্ছ।
 কোথায় আমাৰ সে পুৰোনো বকুৰা, যাদেৰ ছদ্মবেশ খ'লে পড়তে একেকজন
 কৰে আমি সহ হেডেছিলুম, একই শহুৰে থেকেও যাদেৰ সহে আমাৰ
 দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, দেখা হ'লে এড়িয়ে গেছি, কিম্বা দায়শাৱাৰা গোছেৰ ‘ভালো
 আছো-ভালো আছি’ বলে পালিয়েছি, আজ বিকাল অবধি যাদেৰ আমি
 ঘৃণা কৰেছি ; তাদেৰ সহে দেখা কৰবাৰ অস্ত, পুৰোনো আড়াৰ সংস্কৰণ
 পাৰাৰ জন্ত আমাৰ এক মূহূৰ্ত যেন স্বত্বপুণ্যে নেৰা গেলো, যে-নেৰাকে
 আমি ভিতৰে ভিতৰে দমন কৰে রেখেছি এতোকাল। চোখ থেকে কুৱাশাৰ
 পৰদা সৱিয়ে আমি অচলনুষ্ঠিতে তাৰালাম চাৰিদিকে ; আমাৰ স্বমুখ লিয়ে
 এক পাজৰী তৰণ ও তৰণী থাকিলো, কাটা বাদ দিয়ে মাছেৰ মতো
 পাৰ্বতীকে বাদ দিয়ে পাজৰী তৰণীটকে আমি চোখ দিয়ে বাদ নিতে
 লাগলাম ।

মনটা বড়ো ধাৰাপ হ'বে গেলো, যখন নিউয়াৰ্কেটে, পুৰোনো আড়াৰ,
 বকুলেৰ কাউকে পাওয়া গেলো না । ওৱা কি আজ্ঞা বললেছে ? কী আনি,

কতোদিন তো ওদের সব বর্জন করেছি। কিন্তু আমার ভিতরে একটা জেন
প্রবল অভিযাতে বেড়ে উঠছিলো : এতোদিন পর বস্তুদের সঙ্গে দেখা করতে
এসেছি, না দেখা পেলে কিছুতেই সোয়াতি পাবো না। ভিতরকার চিরকালের
বাখালটিকে আমি গাল হিছিলাম ভয়ানক : কেন সে আমাকে এম্বি ক'রে
খেপিয়ে তোলে, নাজেহার্ল করে, বেসামাল করে। কিন্তু বস্তুদের বাড়ি-বাড়ি
গিয়ে কি শাত হবে কোনো ? কাউকে পাওয়া যাবেনা এখন একলা ; সবাই
মিলে জমিয়ে তুলেছে কোথাও। আবার ঝাস্ট, বিষঝ, ভারাক্ষাস্ট মনে বাড়ি
কিরিছি ; নীল হাওয়া চারদিকে আঁচল ছড়িয়েছে, রাস্তা নির্জন, কেজোর মতো
পশ্চিমে উঁচিয়ে আছে টান ; দূরে-দূরে দাঢ়িয়ে থাকা ল্যাঙ্গোস্টগুলো মনোযোগ
দিয়ে নিজের-নিজের পায়ে প'ড়ে থাকা আরো খবরের কাগজ পড়ে
যাচ্ছে।

সবস্ত রাস্তা যাতিয়ে তুলে হট্টগোল করতে-করতে কয়েকজন এগিয়ে
আসছে, দেখেছি। 'কাছে আসতেই আমার বস্তুদের চিনতে পেরে আমি
সোজাসে চিংকার করে উঠলুম, 'আরে ! কি ব্যাপার ! তোমরা কোথেকে
আসছো !' 'এই তো এদিকে গিছিলাম আমরা বেড়াতে ; আসতে-আসতে
বাত হ'য়ে গেছে। তা তোমার ব্যাপার কি ?' 'তোমাদের খুঁজছিলুম।'
'আমাদের !' ওরা একটু আশ্চর্য হলো ; কতোকিন ওদের খোজ খবর নিইনি,
ভালো করে কথা বলিনি মন খুলে, আমার একটু জজা লাগলো। 'চো, ও
দিকে একটা ছোটো রেষ্টুরেন্ট আছে শুধানে !' এই বলে আমরা কাছের
রেষ্টুরেন্টটায় গিয়ে বসলাম।

চায়ের কথা ব'লে আমি তাকালুম সবার দিকে : হাবিব, স্বশাস্ত, রহমান
ও করিমের দিকে ; প্রত্যেকেই কেমন যেন বদলেছে, বদলেছে, বেন
বিমূর্ত শিল্পে তৈরী সবাই, কিংবা হয়তো গরিব রেষ্টুরেন্টের টিমটিমে আলোয়
অমন না চেনা না অচেনা মনে হচ্ছিলো তাদের ; ওরা ছাড়া আরেকজন ছিলো
ব'সে, তার দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্বশাস্ত ছেলেটার
সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে, 'আমাদের নতুন বস্তু, এর নাম
কায়সার'। কায়সার আমার দিকে চেয়ে হাসলো একটু, আমিও ; কথা
বললেনা সে।

আমরা চা খেতে-খেতে একথা শেকথা অনেক গল্প করেছিলাম ; ছোটো
গেই রেষ্টুরেন্টে বাত দশটায় আর লোক ছিলোনা ; ওদিকের টেবিল খেকে
ফুজন খিকশাওয়ালা ভাত খেরে উঠে চ'লে গেলো। এ-ও-তা গল্প করতে-করতে

কোথা থেকে সময় উড়ে যাচ্ছে খেয়াল ছিলোনা। হাবিব তার ঘড়ি দেখে
 শুধু বললে, ‘রাত দশটা কিন্তু বেঞ্জেছে’ সে কথা ভেসে গেলো। কিছুক্ষণ
 পরই অগ্রকথার তোড়ে: শুশান্ত বললে, ‘কেমন আছে হে তোমার
 প্রেমিক? অনেকদিন তো কথা-বার্তা বলেনা তের্মন—কিছুই আনন্দাম না।’
 বললাম, ‘ওর সঙ্গে আমার আর এখন সঙ্গাব নেই।’ ‘আহা! বড়ো
 হৃৎজনক ব্যাপার!’ সহাহত্যচক অর্ধাং আঘাতোস্থুধ কঠিন আর
 সেই মুখগুলোকে চাপা দিতেই বললুম, কেননা আবার আমি প্রাক্তন ভয়ংকরে
 ডুবে শহীদ; বললুম, ‘একদিন ওর শরীর আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলো’,
 টেচিয়ে উঠলো ওরা, ‘তাই নাকি? সত্যি। যাক ভাই বল একপেরিমেল্টা
 বল।’ অনেকগুলো উৎসুক মুখ চার দিকে ঝ'লে উঠলো; কেবল নতুন বন্ধু
 কায়সার ঠোটে একবকম অঙ্গুত হাসি মেখে, হয়তোবা আলোর প্রভাবে অমন
 মনে হচ্ছিলো আমার, ব’সে বইলো; তাকে আমি একটিও কথা বলতে শুনিনি
 এখনো, লোকটি সারাক্ষণ একটু দূরের চেয়ারে আমার ঠিক উন্টোদিকে ব’সে
 ছিলো; কথা বলছিলোনা, কিন্তু গঞ্জীর নয় তাই ব’লে, মুখে তার একটি হাসি
 লেগেই ছিল; যাতে ঘুমের বিষ হ’তে পারে—এই কথা বলে চা-ও খাইনি;
 কোনো আলোচনায় ঘোগ শাইনি, অথচ যে-কোনো আলোচনায় তার সম্ভতি
 আছে চেহারা দেখে সেটা বোরা যেতো। আমি কাঙ্গারের দিকে তাকিয়ে
 আছি দেখে শুশান্ত বললে, ‘আরে বলেনা। ও আছে তাতে কি। এরকম
 আলোচনা তো আমরা সব সময়ই করছি। এসবে ও কিছুই মনে করেনা।’
 লোকটার চেহারায় সম্ভতি ধাকনেও তার গান্ধীর আমার ভালো লাগছিলো
 না; আমি ভাবিছিলুম, যে-আনন্দ আজ পাছি, যে-চিন্তাহীন মুখ তাকে
 প্রত্যেকই অংশ নিক, যে-কোনো কথাই বলছি সেটাই আমাকে আঘাত
 দিচ্ছিলো, আমি ভিতরে-ভিতরে অথষ্টি বোধ করছিলুম হয়তো লোকটা
 অমি। অগ্রান্ত বন্ধুর অবিরাম আমার অভিজ্ঞতা জানবার জন্য করাবাত
 ক’রে চলেছে, ‘বলো না। আহ, বলতে কি। আমরা তো আর ভাগ বসাতে
 চাচ্ছিনা।’ ওদের একটু অত্থিক, আমার সৌভাগ্যের শান্তি দেয়া দরকার,
 এই ভেবে আমি বললাম আন্তে আন্তে, ‘ঢাখো, কি আর বলবো, এখন তো
 ওর সঙ্গে আমার তেমন সঙ্গাব নেই। কিন্তু একদিন মানে একঘাজি, বেদিন
 ও নিজেকে সমর্পণ করেছিলো, ঈ একটা গাজি আমি কখনো ভুলতে পারবোনা,
 কোনোহিন ন্না।’ তাৰপৰ একটু হেসে বললাম, ‘বেন ওৱ শৱীৰে একখণ্ড
 হাতু মেই, এ কথৰ ও নিজেকে দাকিয়ে মুচড়িৰে গোলাতে পারে, ও এন্নন

শুন্দর পাছা মোলাতে পারে না-দেখলে বিশ্বাস হয়না।' জীবনের উপভোগ, কালগত একবাতি, বেন শত আলো জেলে কিরে আসছে আবার; আমি খুবি হ'য়ে-হ'য়ে উঠছি, যে-আমি আস্থাত্যা করতে চাচ্ছি, চেয়েছি বহুদিন, একটা মিথ্যে দিয়ে সেই আমাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টার আছি যেন। ওরা অনেকক্ষণ ধ'রে হাসলো, দু-একটা মন্তব্যও করলো।

যে-আমি কয়েকদিন ধ'রে আস্থাত্যার পরিকল্পনা করছি, এবং আগেও যে করছি অলৌক একটি রাত্রির উপর ভর ক'রে আমি জীবনের সর্গের লোভে শ্রীরা রেখেছি বাড়িয়ে। ওদের হসির বান থামলো; আমি আজক্ষের সর্বের অ্যাঞ্জিলেটের ঘটনাটি বললাম পুরুষপুরু, না-ব'লে পারলাম না। ঘটনাটি ছবির মতো ওদের চোখের সম্মুখে বর্ণনা ক'রে আমি চেয়ার একটু পেছন দিকে কাত করলাম। ওরা একে একে ঐ ঘটনার ওপর মন্তব্য করলো; আমি ঐ ঘটনাটিতে হে-অমুসৃতি পেয়েছি তা যেন ওদের ভিতরেও সংশ্ারিত করতে পেরেছি, এমনি মনোময় কঠোর ছিলো ওদের।

'টাকা আয়ের জন্য মাহুশ কী না করছে!' শ্রীবিব বললো। 'ছেলেটি শনিজের জীবন বিগম 'ক'রে এভাবে টাকা আয় করেছে আশৰ্দ্ধ। এরকম অত্যুত্ত ব্যবসা আমি শনিনি। তোমরা কেউ শনেছো নাকি?'

'না,' স্মৃতি বললে, 'কিন্তু আস্থাত্যাও হ'তে পারে। ছেলেটা আস্থাত্যা করতে চাচ্ছিলো হয়তো এভাবে। ছেলেটা কিন্তু চমৎকার একটি প্রতীক মনে হচ্ছে আমার কাছে; কিসের বলো তো?'

'আরে প্রতীক-ট্রিতিক বাজে কথা।' রহমান বললে, 'আসলে ব্যবসাই শৰ্ট।'

'হ'তে পারে।' পরিবেশ হাঙ্কা করার ভঙ্গিতে বললে, 'হচ্ছে টাকা তো পেয়েছে ছোকরাটা। কিন্তু তুমি হঠাতে এ-গল্পটা বললে কেন? একটু আগেই তোমার প্রেমিকার কথা বলছিলে? তাৰপৰেই হঠাতে বয়ান করতে উক্ত কৱলে গঢ়ীর এই ঘটনাটা। তোমার প্রেমিকার সঙ্গে ঐ ছোকরা মানে ঐ ঘটনার ঘোগ কোথায়?'

আমি মাথার উপরে বালবের দিকে চেয়ে একটু ফ্যাকাশে হাসলাম; কোনো কথা বললাম না। কায়সার কোনো যন্ত্রব্য করেনি, সে আমার ঝট্টেদিকের চেয়ার থেকে উঠলো; উঠে উধান থেকে ঘুরে পা খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এসে হঠাতে অবিরাম চড় যেৱে ঘেতে লাগলো আমার গালে, চড় আৱত্তে-মারতে বললে, 'কোন ব্যাধি পেয়েছো, না? আস্থাহৃতভাব ক'রে

ଖୁବ ବୋଜେ ଆହେ ତୃପ୍ତି—ଯତୋମର ଡଳ, ସମୟ ! ସଂଭି-ବାତି ଆଉହତ୍ୟା
କରାନ୍ତେ ପାଇବେ ତୁ ମୁଁ ?' ଆମାର ମୁଖଟା ବେଳେ ଗେଲେ, ଆମି ବୋଲୋ କଥା
ବଲାମ ନା, ବଲାନ୍ତେ ପାଇଲାମ ନା । ପାଇଲାମ ନା ସାଙ୍ଗକ କରେ ତାର ସାଙ୍ଗେର ଉପର
କାମକ ବଣିଯେ ଲିତେ, ହରୁରେ ଯତୋ କୁକଡ଼େ ଚିଲେ ଏଲାମ ।